যুক্তধারা

পশুপতি ভট্টাচার্য

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—মহালয়া, ১৩৫১
দাম ৪॥০ টাকা

প্রিন্টার—শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক
বাণী প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট কলিকাতা

আমার কল্পনারানীকে

—গ্রন্থকারের অন্যান্য বই—

ডাকের চিঠি

অবশ্যম্ভাবী

দুই নৌকা

কৃষ্ণদ্বীপের রানী

সানফ্রান্‌সিসকোর যাত্রী

অমরনাথের কথা

প্রত্যেকেরই জীবনের বোধ হয় একটা কৈফিয়ৎ আছে, সেটা গোড়ায় বোঝা যায় না। উপন্যাসের কৈফিয়ৎ যেমন বোঝা যায় তার শেষের কয়েক অধ্যায়ে, মানুষের জীবন সম্বন্ধেও কতকটা তেমনি। যেটা তার ফুটিয়ে তোলার কথা সেটা অত্যন্ত ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে শেষের দিকে। সকলের জীবনেই যে একটা কিছু ফুটে উঠতে দেখা যাবে তা হয়তো নয়, কিন্তু আমাদের দেখবার শক্তিই বা কতটুকু।

আমি গোবিন্দপুরের চৌধুরী বংশের সন্তান, জন্ম সুদূর পশ্চিমদেশে শাহাবাদ জিলায়। সেখান থেকে আমার জীবনের যাত্রা শুরু ক'রে কত দেশ ঘুরলাম, কোথা থেকে কোথায় এসে পৌছলাম, এই টুকুই এক সুদীর্ঘ কাহিনী। এর পরে কৈফিয়ৎ জানবার জন্যে হয়তো আরো অনেক অধ্যায় বাকি আছে।

খুব ছেলেবেলার কথা সামান্যই মনে পড়ে, অস্পষ্ট একটা সুখস্বপ্নের স্মৃতির মতো। আরা শহরের উপকণ্ঠে সোন নদীর খালের ধারে সাদা রংএর মস্ত এক বাংলো-বাড়ি। বাবা সেখানকার নামজাদা উকিল, শামলা মাথায় দিয়ে জুড়িগাড়িতে চড়ে আদালতে যান। চারিদিকে বিস্তৃত ধানের ক্ষেত, হলুদ রংএর সরিষা ক্ষেত, সবুজ রংএর ছোলার ক্ষেত। আকাশের দিকে চেয়ে প্রত্যহ দেখি সোনার-বর্ণ সকাল আর সিঁদুরবর্ণ সন্ধ্যা। শীতের দিনে প্রচণ্ড শীত, সারা দুপুর রোদে রোদে ঘুরে বেড়াতে খুব আনন্দ, নীল আকাশে চিল উড়ে যায় মন্থর গতিতে,

ঝাউগাছের উঁচু ডালে বসে নীলকণ্ঠ পাখী, আমি ঘাড় উঁচু ক'রে চেয়ে চেয়ে অবাক হ'য়ে তাই দেখি। গরমের সময় প্রচণ্ড গরম, খালের জলে ঝাঁপ কাটতে খুব আনন্দ; জলের মধ্যে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গা ডুবিয়ে খেলা করি, সাঁতার দিতে শিখি। বর্ষার সময় প্রচণ্ড বৃষ্টি, সে বৃষ্টিতে ভিজতে খুব আনন্দ; ঘন মেঘ হয়েছে দেখলেই আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি, বৃষ্টি পড়ছে দেখলেই আনন্দে হাততালি দিয়ে নাচতে থাকি। সারাদিন লাফালাফি ক'রে বেড়াই, সকলেই আমার সকল রকমের আবদার সহ্য করে। গরিব চাষীদের ছেলেরা গরু চরাতে যায় মাঠে, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে খেলা করি। তারা কেউ বা দুসাদ, কেউ বা দুল্‌হা, গলা ছেড়ে দিয়ে তারা দেহাতি গান করে। তারা মাঠ থেকে আখ ভেঙে খায়, কাঁচা ছোলা আর কচি মূলো তুলে খায়, কখনো বা ইঁদুর মেরে তাই আগুনে পুড়িয়ে তেল নুন মেখে চিবিয়ে খায়। আমিও তাদের সঙ্গে মিশে কখনো কখনো এই সকল উপাদেয় খাদ্যের ভাগ পাই, অবশ্য অত্যন্ত গোপনে, বাড়ির লোকে এ সংবাদ কেউ জানেনা। বাড়িতে খাই ঘন দুধ আর মা'র হাতের তৈরি ছানাবড়া। যখন যা খুশি তাই খাই, সন্ধ্যা হ'লেই মা'র গায়ে হাতটি রেখে ঘুমিয়ে পড়ি।

বর্ণে গন্ধে পরিপূর্ণ, ঋতুতে ঋতুতে নিত্যনবীন, এই পৃথিবীর যে পরিচয় প্রথম জীবনে আমি পেয়েছিলাম সে কেবল আনন্দের। তখন মনে হয়েছিল পৃথিবীর সব কিছুই ভালো।

ক্রমে বাস্তব অভিজ্ঞতার শুরু হোলো। প্রথম যেদিন কানমলা খেলাম বাবার কাছে, সেটা এখনও মনে আছে। তাঁর অফিস ঘরের টেবিলের ওপর ছিল একটা শৌখীন কলমদানি। সেখানে কেন যে হাত দিতে গিয়েছিলাম তা জানিনা, কিন্তু দৈবাৎ আমার হাত লেগে দোয়াতটা উল্টে সমস্ত কালি পড়ে গেল মেঝের ওপর। বাবা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কে কালি ফেলেছে? আমি নির্ভয়ে বললাম, আমি। কথাটা যে অপরাধীর মতো ভয়ে ভয়ে বলতে হবে তা আমি ভাবিনি। বাবা বললেন—দোষ করেছিস তবু একটুও ভয় নেই তোর?

বলতে বলতে সজোরে আমার কান মলে দিলেন। কানটা বড় জ্বালা করতে লাগলো, মাকে গিয়ে দেখালাম। মা বললেন,—আহাহা কানটা একেবারে ছিঁড়ে দিয়েছে, রক্ত বেরুচ্ছে।

আবার একদিন ঐ রকম কি একটা দোষ করেছিলাম। বাবা রেগে উঠে আমাকে দুচার ঘা প্রহার দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে মা এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। মারতে দেখেই বলে উঠলেন,—আবার তুমি ছেলেটাকে মারছো? ওকে তুমি বাঁচতে দিতে চাওনা বুঝি? বেশ, আমিই ওকে মেরে ফেলছি। বাবার প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বেদম প্রহার করতে শুরু করলেন। আমি তো হতভম্ব। খানিকটা সহ্য করবার পর বেগতিক দেখে ছুটে পালালাম। রাত্রে মা পিঠে হাত বুলিয়ে আদর ক'রে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ভোরবেলা হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে দেখি, মা'র সঙ্গে বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, এখন আর দুজনের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। আমি ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছি দেখে দুজনেই যেন বিরক্ত হ'য়ে বললেন—পাজী ছেলে, এরই মধ্যেই তোর ঘুম ভেঙে গেল? আমি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। গত দিনের প্রহারের চেয়ে এইটুকু ভৎ‍র্সনায় আমার অনেক বেশি ব্যথা লাগলো।

মৃত্যু কাকে বলে সেটা জানলাম আমার ছোটো বোনের আকস্মিক মৃত্যুতে। ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটি হরিণের মতো চঞ্চল হ'য়ে ছুটে বেড়ায়, কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের রাশি চোখের উপর লুটিয়ে পড়ে, ছুটতে ছুটতে দাঁড়িয়ে দু হাত দিয়ে চুলগুলো সরিয়ে ফেলতে হয়। জল তার অত্যন্ত প্রিয়, যেখানে জল আছে সেখানে সে যাবেই। জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে তার খেলা, কেউ তাকে নিবৃত্ত করতে পারেনা। আমার সঙ্গে সে সর্বদা থাকতে চায়, মাঠে মাঠে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবার সাধ, কিন্তু বেশি দূর হাঁটতে পারবে না ব'লে আমি তাকে সব দিন সঙ্গে নিই না, ফাঁকি দিয়ে পালাই। একদিন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। বাড়ির পাশেই গভীর ইঁদারা, অনেকে বললে তার মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে দেখা হোক। মেয়েটা জল ভালোবাসে,

কিছু বলা যায় না। ইঁদাবার মধ্যে ঝুড়িঝাণ্ডা নামিয়ে দেখতে দেখতে জল থেকে উঠে এলো আমাদের খুকী। কিন্তু তখন তার মুখটা দেখতে ঠিক তেমনটি নেই, কি যেন একটা পবিবর্তন হয়েছে। অন্যান্য সকলের দিকে চেয়ে দেখি, তার মুখের সঙ্গে অনেক তফাং। তাকে শ্বাস গ্রহণ কবাবাব জন্যে অনেক চেষ্টা করা হোলো, কিন্তু সে একবাবও নিশ্বাস গ্রহণ করলে না, শক্ত অসাড হ'য়ে রইল। তখন এলো ক্রন্দনেব পালা। সকলেই কাঁদতে লাগলো, আমিও কাঁদলাম। কেন কাঁদলাম তা জানিনা। ক্রমশ একটু একটু ক'বে বুঝতে পাবলাম।

বোগেব কষ্টেব পবিচয় পেলাম যখন আমার টাইফয়েড হোলো। তাব আগেও কয়েকবাব নানা বকম অসুখ হয়েছিল, সে আমি গ্রাহ্যই কবিনি। কিন্তু এ স্বতন্ত্র জিনিস। প্রায অচৈতন্যেব মতো পড়ে থাকতাম। একজন ডাক্তাব এসে প্রায়ই আমার কাছে বসতেন, অত্যন্ত কটু কি সব ওষুধ খাওয়াতেন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাব দিকে চেয়ে থাকতেন, শুনতে পেতাম কাকে যেন বলচেন,—বাঁচানো বড়ো কঠিন। সকলে অত্যন্ত আগ্রহেব সঙ্গে তাঁব মুখের দিকে চাইতো, তিনি যা করতে বলতেন তৎক্ষণাৎ সকলে তাই করবাব জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠতো। বোগেব ঘোবেই আশ্চর্য হ'য়ে মনে মনে ভাবতাম, ডাক্তাব বুঝি সব মানুষেব চেয়েই বড়ো। বাবার মতো উকিলেব চেয়েও কি বড়ো? ডাক্তাব সকলকেই যেমন খুশি হুকুম করতে পাবে, বাবাকে পর্যন্ত তা মেনে চলতে হয়। তা যদি হয় তো আমিও হবো ডাক্তাব, কাবণ বাবাব চেয়েও আমি বড়ো হ'তে চাই। আব কাবো কথা আমাব কানে প্রবেশ কবতো না, কিন্তু ডাক্তাব কিছু বললেই শুনতে পেতাম। গুরুগম্ভীব স্বরে তিনি বলতেন,—জিব দেখি-ই, তৎক্ষণাৎ জিবটা বেব ক'রে দেখাতাম, আবাব অজ্ঞান হ'য়ে যেতাম। কতকাল এবকম জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলাম জানিনা, বোধহয় দু মাস। বহুকাল পবে ধীবে ধীবে জ্ঞান হ'তে লাগলো, বোগেব যন্ত্রণা কমে গেল, তাব পবেও অনেক কাল বিছানায় পড়ে থাকতে হয়েছিল।

কিন্তু রোগের যন্ত্রণা বা মৃত্যুর আঘাত ভুলতে আমার বেশি সময় লাগেনি। পুরাতনকে ভুলে গিয়ে নূতনকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে আমার অদ্ভুত একটা দক্ষতা

ছিল। প্রত্যহ রাত্রে ঘুমের সঙ্গে সঙ্গে আগেকার দিনের কষ্ট এবং কালিমাগুলো প্রায় সমস্তই মন থেকে মুছে যেতো, স্মৃতির মধ্যে যা কিছু অবশিষ্ট থাকতো তাতে লাগতো নবোদিত সূর্যের নতুন সোনালি রং। পূর্বদিনের কোনো কষ্ট আমার পরদিনের আনন্দকে ব্যাহত করতে পারতো না। সমস্তই ভুলে গিয়ে আবার আমি খেলাধুলায় মেতে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতাম।

একদিন হাতে-খড়ি হ'য়ে শুরু হোলো আমার লেখাপড়া। সকলে বললে আমাকে বিদ্বান হ'তে হবে, উকিলের ছেলে উকিল হ'তে হবে। আমিও কৌতূহলের বশে খানিকটা পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম। মা হস্তাক্ষর লিখতে শেখাতে লাগলেন, তাড়াতাড়ি সেটা বেশ শিখে ফেললাম। তারপরে বাবা শেখাতে শুরু করলেন ইংরেজী ভাষা, সেটা কিছুতেই রপ্ত করতে পারি না। বাবাকে বড়ো ভয় করি, তাতেই আরো গোলমাল হ'য়ে যায়। আমি বাবার কাছে পড়তে রাজি হইনা, সময় বুঝে পালাই।

দু চার বছর এমনি ভাবেই কাটলো। কিন্তু চৌধুরী বংশের ছেলে মূর্খ হ'য়ে থাকবে, বাবার বড় ভাবনা হোলো। ইংরেজী পড়তে জানা এবং ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে পারাই ভব্যতা এবং সভ্যতার পরিচায়ক। এবার দস্তুরমতো একটা স্কুলে ভর্তি হ'য়ে লেখাপড়া শিখতে হবে, নতুবা বংশের গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে। এই নিয়ে মা'র সঙ্গে বাবার অনেক পরামর্শ হোলো, দেশে ঠাকুরদাদার সঙ্গে অনেক চিঠিপত্র লেখালেখি হোলো, তারপরে স্থির হোলো যে আমাকে দেশে নিয়ে গিয়ে রাখা হবে ঠাকুরদাদার কাছে। সেখানে স্কুলও আছে আর ঠাকুরদাদার কড়া শাসনও আছে, অতএব সেখানে থাকলে আমার লেখাপড়াও হবে আর নৈতিক উন্নতিও হবে। মা আর ছটু চাকরের সঙ্গে আমি দেশে রওনা হলাম।

গোবিন্দপুরে এসে দেখলাম এখানকার পৃথিবী ওখানকার চেয়ে একেবারেই স্বতন্ত্র। তবে নতুন মাত্রকেই আমার ভালো লাগে, সুতরাং এ-দেশটা প্রথম প্রথম আমার ভালোই লাগলো। মনে মনে তুলনা ক'রে দেখতাম ওখানকার চেয়ে এখানকার গাছপালাগুলো যেন একটু বেশি রকমের সবুজ, মাটিটা একটু

বেশি রকমের নরম। আর মানুষ থেকে শুরু ক'রে গরু ছাগল, এমন কি পাখীগুলো পর্যন্ত যেন খর্বাকৃতি। বাংলা দেশের মানুষদের কথা অনেক শুনেছি যাঁ'র কাছে, তাঁর বর্ণনার সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতা কিন্তু মিললো না। আমি দেখলাম বিদেশী বাঙালীর সঙ্গে বাংলাদেশের বাঙালীর অনেক তফাৎ। তাদের কেমন একটা তেজ আছে, গর্ব আছে, মর্যাদাবোধ আছে, এদের যেন তেমন কিছু নেই। এরা খালি গায়ে থাকে, অনবরত তামাক খায়, আর কাজের চেয়ে কথার মধ্যেই এদের উত্তেজনা বেশি দেখা যায়।

এ দেশে এসে কতকগুলো নতুন জিনিস বিশেষ ক'রে আমার নজরে পড়লো। ঘন বাঁশের বন, পাট-পচানো পানাপুকুর, রাত্রিকালে মশার ঝাঁক, ভোরবেলাতে পাখীর ডাক, আর বর্ষাকালে পথের পাঁক। পাঁক কথাটি এখানে ইচ্ছাপূর্বক ব্যবহার করছি, ওটি শিখিয়েছিলেন আমাদের স্কুলের এক মাষ্টার। তিনি একদিন ক্লাসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বল দেখি CLAY মানে কি? কেউ বললে—কর্দম, কেউ বললে—পঙ্ক। কারো উত্তর তাঁর মনঃপূত হোলোনা, সকলকে তিনি বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। বললেন,—ও-সব মানে-বইএর মুখস্থ বিদ্যে এখানে চলবে না, বাঙালীর ছেলে সোজা বাংলায় কথা কও, বলো পাঁক। ঐ সোজা কথাটা সোজা ভাষায় বলতে লজ্জা করে বুঝি? এ-কথা এখনো অনেক সময় আমার মনে পড়ে।

দেশে আমার সঙ্গে মা কিছুদিন মাত্র ছিলেন, তারপরে একদিন বাবা এসে তাঁকে নিয়ে চলে গেলেন। ছট্টু সর্দার রইল আমার কাছে। ওর দেহে ছিল অসাধারণ শক্তি, মনে ছিল অদম্য সাহস, আর লোকটা ছিল অত্যন্ত বিশ্বাসী এবং প্রভুভক্ত। সে আমাকে কুস্তি লড়তে শেখাতো। কিন্তু ওর একটা বিশেষত্ব ছিল, যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়া আর সঙ্গে সঙ্গে নাকডাকা। রোজ বিকেলে সে সিদ্ধি ঘুঁটে খেতো। সিদ্ধি ঘুঁটতে ঘুঁটতেই তার নাক ডাকতো, অনেক সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও নাক ডাকতো।

একটা প্রকাণ্ড নিমগাছের ধারে আমার ঘর। পাকা নিমফল ঝরে পড়তে

থাকে উঠনের মধ্যে, আমি জানলার ধারে পড়তে বসে অন্যমনস্ক হ'য়ে বাইরের দিকে চেয়ে তাই দেখি। নিমগাছের ওপর থেকে অনবরত পাখী ডাকে, রাত্রেও কি একটা পাখী ডাকতে থাকে। রাত্রে ঐ ঘরে আমি একা একা শুয়ে থাকি, খানিকটা দূরে মাটিতে বিছানা পেতে শুয়ে থাকে ছটু সর্দার। সারা রাত্রির মধ্যে পাখীর ডাকও থামেনা, ছটুর নাক ডাকাও থামেনা। বারে বারে আমার ঘুম ভেঙে যায়, তখন ভয় করে। থেকে থেকে মা'র জন্যে মন কেমন করে, শুয়ে শুয়ে কাঁদি, চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়। মা কেন এখানে আমাকে ছেড়ে চলে গেল, বাবার কাছে গিয়ে থাকবার কি এমন দরকার ছিল? আমার জন্যে কি তাঁর একটুও মন কেমন করচে না? আমার চেয়ে কি বাবাই হোলো বড়ো? কোনো কোনো দিন একা শুয়ে থাকতে পারিনা, ছটুর কাছে উঠে যাই, ঠেলে ঠেলে তার ঘুম ভাঙাই। সে ধড়মড় ক'রে উঠে বলে,—খোকাবাবু, তোমার ঘুম হচ্ছেনা কেন, মচ্ছড় কামড়াচ্ছে বুঝি? আমি বলি,—তা নয়, আমার ভয় করচে, তোমার কাছে শুই, তুমি একটা কাহানি বলো। ছটু তখন জড়িতকণ্ঠে সুর ক'রে বলতে থাকে ওদের দেশের কুমার সিংহের বীরত্বের গাথা।

বহুকাল পর্যন্ত আমার রাত্রে ঘুম ছিলনা, মনে স্ফূর্তি ছিলনা। জীবনে তখন একটি মাত্র সামগ্রী আমাকে আনন্দ দিতে পারতো,—মা'র চিঠি। পশ্চিম থেকে মাঝে মাঝে মা'র চিঠি আসে আমার নামে, তাতে খামের ওপর মা'র নিজের হাতের মেয়েলি ছাঁদের ঠিকানা লেখা—পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু অমরনাথ চৌধুরী দীর্ঘজীবেষু। খাম দেখেই আমার সমস্ত বুকটা ভরে ওঠে। ঐ যে খামের ওপর লেখা আছে—শ্রীযুক্ত বাবু—ওতেই মনে মনে গর্ব হয়, এর মধ্যেই আমি 'বাবু' হ'য়ে গেছি। ইচ্ছা হোতো খামের ঠিকানাটা সকলে দেখুক, কি সম্বোধনে আমার চিঠি আসে। কিন্তু ভিতরের চিঠি কাউকে দেখানো চলে না, সে হচ্ছে অত্যন্ত গোপনীয় বস্তু। তার মধ্যে লেখা থাকে অনেক লজ্জার কথা, মা আমাকে যেমন ভাবে আদর করতেন তেমনি সব ভাষা, কাউকে তা পড়তে দেওয়া অসম্ভব। সে কেবল আমিই পড়ি—দিনের মধ্যে অনেকবার, ছটুকে কিছু কিছু বলি। মা

লিখেচেন—আমার জন্যে তাঁব মন কেমন করে, রাত্রে ঘুম হয়না। আমারও যে ঠিক তাই। চিঠিতে আরো থাকে অনেক লোভনীয় সামগ্রী দেবার প্রতিশ্রুতি—একটা দু'চাকার সাইকেল, একটা দু'নলা বন্দুক, আরো কত কি। যেদিন মা'ব চিঠি আসতো সেদিন সারাক্ষণ আনন্দে লাফিয়ে বেড়াতাম, বকুনি খেলেও গ্রাহ্য করতাম না। রাত্রে সেদিন খুব ঘুম হোতো আর কেবল মাকেই স্বপ্নে দেখতাম।

বকুনি আর প্রহার আমাকে যথেষ্টই খেতে হয়েছে—ঠাকুবদাদার কাছে নয়, ঠাকুমার কাছে। ঠাকুরদাদা ছিলেন বৃদ্ধ এবং অনেকটা আলাভোলা প্রকৃতিব, মাঝে মাঝে প্রচণ্ড রেগে ওঠেন, মাঝে মাঝে একেবারে মাটিব মানুষ। কিন্তু ঠাকুমা তেমন নন, অত্যন্ত নীরস প্রকৃতিব কডা মেজাজেব মানুষ। তিনি যেন চিরস্থায়ী বয়স আর চিরকক্ষ কণ্ঠস্বর নিয়ে একই ভাবে কাটিয়ে যাচ্ছেন, কিছুতেই তাঁর বয়সও বাড়েনা কিংবা তেজও কমে না। ক্ষমা কাকে বলে তাঁর জানা নেই।

ঠাকুরদাদা করতেন স্নেহ, আর ঠাকুমা করতেন শাসন। কিন্তু ঠাকুরদাদাব স্নেহ বলতে যা বোঝায় তা কতটুকু বা পেয়েছি! তিনি থাকতেন বাড়িব বাইরে, কাজকর্ম নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত। জমিজমা আছে, বিষয়কর্ম আছে, লোকেব বিবাদ বিসম্বাদে সালিশি করা আছে, তাছাড়া চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাকচর্চা এবং ধর্মচর্চাব সঙ্গে সামাজিক কূট তর্ক নিয়ে ঘোঁট পাকানোব ব্যাপাব আছে। সাবাদিনে তাঁব সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকতো না, কেবল সন্ধ্যাব সময় খেতে বসে আমাকে ডাকতেন, পাতের মুড়োটা ডিমটা দুধেব সবটা আমাকে না খাওয়ালে তাঁব তৃপ্তি হোতোনা। এক একদিন হয়তো মনে পড়তো যে তাঁব কর্তব্যেব অবহেলা হচ্ছে, হঠাৎ সকালে আমাকে পডাব ঘর থেকে ডেকে পাঠাতেন। আমার কাকাব ছেলেকেও সেই সঙ্গে ডাকতেন। আমাব চেয়ে সে বয়সে অনেক ছোটো, কিন্তু বুদ্ধি অনেক বেশি, আঁক কষতে ভারী ওস্তাদ। আমাদের দুজনকে একটা অত্যন্ত দুরূহ আঁক কষতে দিয়ে তিনি ঘড়ি দেখতেন, কে কতক্ষণের মধ্যে আঁকটা কসে ফেলতে পারে। বলা বাহুল্য আমারই অনেক দেরী হ'য়ে যেতো, আমাব খুড়তুতো ভাই আঁকটা শেষ ক'রে হাসতে হাসতে চলে যেতো। আমি অনেক

সময় আঁকটার কোনো মীমাংসাই করতে পারতাম না। তখন বেধে যেতো এক তুমুল কাণ্ড। লেখাপড়া আমার কিছুই হবে না, শেষ পর্যন্ত গরু চরিয়ে খেতে হবে, এই সকল তীব্র মন্তব্য প্রকাশ ক'রে ডেকে পাঠাতেন আমার ঘরের মাষ্টারকে। তাঁকে মাত্র পনেরো দিনের সময় দেওয়া হোতো আমাকে অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ক'রে তোলবার জন্যে, অন্যথায় নিশ্চিত তাঁর চাকরি যাবে। যথাসময়ে সেই পনেরো দিন কেটে যেতো, পাণ্ডিত্য আমাব কতদূব অগ্রসর হয়েছে সেটা পবীক্ষা কববার কথা আর কারো স্মরণ থাকতো না।

কিন্তু ঠাকুমার শাসনে কোনো ভুলভ্রান্তি নেই, তাঁর কড়া পাহারা নিত্য এবং নিয়মিত। ঠিক সময়ে পড়তে বসেছি কিনা, ঠিক সময়ে মাষ্টার এসে হাজির হয়েছেন কিনা, চাব প্রহরে চাব বার কাপড় ছেড়েছি কিনা, শীতের সময় সকাল সন্ধ্যায় গলাবন্ধ জড়িয়েছি কিনা, ছোটলোকের ছেলেদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াতে শিখছি কিনা, চাকবদের সঙ্গে মিশে তামাক খাওয়া শিখছি কিনা, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সতত সজাগ দৃষ্টি ছিল।

একদিনেব কথা বলি। সেদিন লুকিয়ে লুকিয়ে তামাক খেয়েছি। আমি একা নয, আমবা দুই ভাই মিলেই খেয়েছি। ঠাকুরদাদা সদ্য তামাক টেনে কোথায চলে গেছেন, তাঁর গড়গড়াটাব কলিকা থেকে তখনো ধোঁয়া উঠচে, অথচ বৈঠকখানায় জনপ্রাণী কেউ নেই। তামাক মাহাত্ম্য উপলব্ধি করবার এই সুবর্ণ সুযোগ। এ সকল বিষযে আমিই অগ্রণী, খুড়তুতো ভাইটি আমার অনুকবণ কবে, কিন্তু ধরা পড়বার সময আমিই পড়ি ধরা, সে বুদ্ধিবলে নিষ্কৃতি পায়। তামাকটা ছিল কড়া, তার ধোঁয়া গলাধঃকরণ ক'রে আমি অত্যন্ত কাসতে লাগলাম। সুবল আমার দেখাদেখি ভয়ে ভয়ে দুএক টান দিলে, তারপরে বেগতিক বুঝে পালিয়ে গেল। আমি কাসতে কাসতে মুখচোখ লাল ক'রে ঠাকুমার কাছে গিয়ে একগ্লাস জল চাইলাম। ঠাকুমা বললেন—অত কাসচিস কেন, কি খেয়েচিস? আমি বললাম—কিছুতো না, এমনি কাসি হচ্ছে। ঠাকুমা বললেন—উহুঁ, মিথ্যে কথা বলচিস, মুখটা হাঁ কর দেখি।

তৎক্ষণাৎ হাঁ ক'রে দেখিয়ে দিলাম মুখের ভিতর কিছুই নেই। কিন্তু তিনি ছাড়বার পাত্রী নন, মুখের ভিতরকার আঘ্রাণ নিলেন এবং বললেন—আমাকে লুকোবি কেমন ক'রে, তুই তামাক খেয়ে এসেচিস। উঠনে শুকোচ্ছিল উনন জ্বালাবার চেলা কাঠ, তারই আঘাত পড়তে লাগলো পিঠে। পিঠের চামড়া জ্বালা করতে লাগলো। যত বলি—আর মেরোনা, শোনো শোনো, সত্যি কথা বলছি, তামাক আমি খাইনি, একবারটি মাত্র টেনে দেখছিলাম,—কিন্তু এ সত্য স্বীকারে তাঁর কাছে শাস্তির কোনো লাঘব হয় না। অবশেষে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ছুটে গিয়ে উঠে পড়লাম নিমগাছের মগডালে। সেখান থেকে আমাকে নামিয়ে আনা দুঃসাধ্য। সারাদিন গাছের ওপরেই কাটালাম, কিছুতেই নামলাম না। অবশেষে সন্ধ্যার সময় ঠাকুরদাদার কাছে খবর গেল, তিনি এসে ঠাকুমাকে খুব তিরস্কার করলেন, আমাকে বারে বারে অভয় দিতে লাগলেন, তখন আমি নেমে এসে সারাদিন পরে খাওয়াদাওয়া করলাম।

বাড়ির শাসন থেকে নিষ্কৃতি পেতাম স্কুলে গিয়ে, কিন্তু সেখানেও আবার অন্যান্য রকমের সমস্যা। বাড়ি থেকে স্কুল ছিল প্রায় দেড় মাইল দূরে সদরের শহর অঞ্চলে। প্রত্যহ হেঁটে যাতায়াত করতাম, টিফিনের সময় চাকর গিয়ে খাইয়ে আসতো এক গ্লাস দুধ। তাতে মোটেই আমার পেট ভরতো না, অত্যন্ত খিদে পেতো। বুঝতে পারতাম না, এখানে এসে কেন এত খিদে পায়। পশ্চিমে এমন খিদে পাওয়া কখনো টের পাইনি। সেখানে ছিল যথেচ্ছা খাওয়া, এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণে নিয়মিত খাওয়া, আর স্কুলে পড়তে গেলে বোধ হয় খিদেটা কিছু বাড়ে। আমি দেখতাম অন্যান্য ছেলেদের বাড়ি থেকে কত রকমের জলখাবার আসছে, আমারও লোভ হোতো কিছু জলখাবার কিনে খেতে। ফেরিওয়ালা নানারকম তেলেভাজা ও মুখরোচক দ্রব্য নিয়ে আসতো, অনেকে তাই কিনে খেতো, আমিও খেতাম। তাতেও পেট ভরতো না, কিন্তু তা ছাড়া আর কি করা যায়। বাড়িতে বললে হয়তো কিছু ব্যবস্থা হোতো, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারতাম না। যা কিছু টাকা আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন,

তাই ভাঙিয়ে খেতাম। টাকা যখন ফুরিয়ে গেল তখন ছটুর কাছে ধার করতাম। সে যথাসময়ে মা'র কাছে আদায় ক'রে নিত।

স্কুলে ভর্তি হ'য়ে কিছুকাল পর্যন্ত আমি অত্যন্ত আড়ষ্ট হ'য়ে ছিলাম, সে আড়ষ্টতা কাটতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। মাষ্টারদের তো যথেষ্টই ভয় করতাম, ক্লাসের ছেলেদেরও ভয় করতাম। তাদের সঙ্গে আমি তেমন মিশতে পারতাম না, বাংলা কথা ভালো বলতে পারিনা ব'লে তাদের যথাসাধ্য এড়িয়ে চলতাম। বাংলা লিখতে বেশ পারি, পড়তেও পারি, কিন্তু কথা বলতে পারি না। বাংলার মাঝে হিন্দি বলে ফেলি, তার কারণ শিশুকাল থেকে হিন্দিতে কথা বলতেই বেশি অভ্যস্ত হয়েছিলাম। মাষ্টারেরা এই নিয়ে আমাকে বিদ্রূপ করতো, ক্লাসের ছেলেরা হাসাহাসি করতো। মজা দেখবার জন্যে তারা হাস্যকর হিন্দিতে আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসতো, আমি তাদের কথায় জবাব দিতাম না, গম্ভীর হ'য়ে থাকতাম। মনে মনে সংকল্প করলাম যেমন করেই হোক বাংলা ভাষাটা উত্তমরূপে আয়ত্ত করতে হবে। চেষ্টা করতে করতে দেশের কথাভাষা যখন আমার আয়ত্তের মধ্যে এলো তখন ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলাম।

প্রথম প্রথম ক্লাসের মধ্যে আমি ভালো ছেলেই ছিলাম, দুএকবার পরীক্ষায় প্রথম স্থানও অধিকার করেছি। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ এর পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। যে স্কুলে পড়াশোনা করাটাই ছিল মুখ্য এবং ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশাটা ছিল নিতান্ত গৌণ, সে স্কুলে ঐটাই হ'য়ে উঠলো প্রধান আকর্ষণ, পড়াশোনা করাটা হ'য়ে পড়লো গৌণ ব্যাপার। স্কুলের ক্লাসটা যেন ছেলেদের পক্ষে একত্রে বাস করবার একটা সংসার, এই সংসারে কতকগুলি ছেলের সঙ্গে আমার বিশেষ সদ্ভাব, কতকগুলির সঙ্গে অসদ্ভাব। এই নিয়ে নিত্য বিরোধ এবং বিদ্রোহের সৃষ্টি, কে কি করলে এবং না করলে এই নিয়েই সারাক্ষণ জল্পনা কল্পনা, রেষারেষি আর মন-কষাকষি।

স্কুলের মধ্যে কতকগুলি মিশুক ছেলে দেখা গেল, আমি যেন তাদের কাছে

পরম আগ্রহের বস্তু। তারা যেচে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে চায়, আমার কাছে বসবার জন্যে তারা উৎসুক, তারা আমাকে কত কি উপঢৌকন এনে দেয়, কত কি মিষ্টান্ন এনে খাওয়ায়। কেন যে তাদের আমার প্রতি এমন অহেতুক প্রীতি, সেটা আগে বুঝতাম না, মনে মনে আশ্চর্য বোধ করতাম। ক্রমে বুঝতে পারলাম আমার চেহারাটা যে কিছু সুদর্শন, এইটুকুই কারণ। শুধু আমি নয়, যারাই সুদর্শন, তারাই এদের প্রিয়। এদের মধ্যে আবার দুটি দল আছে—ভালো ছেলের দল, আর বকাটে ছেলের দল। যারা ভালো ছেলে তারা আমাকে দলে টানতে চায় তাদের আভিজাত্যের দ্বারা, বিদ্যার প্রভাবের দ্বারা, পরীক্ষায় নানাবিধ সাহায্যের দ্বারা। যারা বকাটে ছেলে, অর্থাৎ যাদের বয়স বেশি, গলার স্বর ভারী, যারা বারে বারে ফেল হয়, পিছনের বেঞ্চে বসে, হাজিরা দেবার পরেই ক্লাস ছেড়ে চলে যায়, তারা আমাকে দলে টানতে চায় নানাবিধ অসাধ্যসাধনের দ্বারা। তারা সুযোগ খোঁজে কিসে আমার সুখসুবিধা ক'রে দিতে পারবে। আমার জন্যে সকল রকমের স্বার্থত্যাগ করতে যেন তারা সততই প্রস্তুত। আমি পশ্চিম দেশ থেকে আমদানি কোমলপ্রকৃতি বড়লোকের ছেলে, আমাকে সর্বদা মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করতে হবে, তাদেরই যেন এটা বিশেষ কর্তব্য। প্রথমটায় এতে আমি আমোদ অনুভব করতাম, দুই দলের কাছেই দুই রকমের সুযোগ গ্রহণ করতাম। এই নিয়ে ঈর্ষার সৃষ্টি হ'তে লাগলো, দুই দলে কয়েক দফা মারামারি পর্যন্ত হ'য়ে গেল। শেষে বকাটে ছেলের দলই জিতলো, আমি তাদের দলভুক্ত হ'য়ে গেলাম। তখন তারা একে একে তাদের আশ্চর্য বিদ্যাগুলি আমাকে শেখাতে লাগলো। তারা আমাকে ক্লাস থেকে পালাতে শেখালে, সিগারেট খেতে শেখালে, জমিদারের বাগানে কাঁচামিঠে আমের সন্ধানে যেতে শেখালে, এবং আরো কিছু শেখালে যা নিতান্ত গোপনীয় এবং আমার পক্ষে অভিনব। ওদের কাছেই প্রথম শিখলাম যে দেহের মধ্যে এক রকমের অনুভূতি আছে যা যথেচ্ছা জাগিয়ে তোলা যায়, কিন্তু যা চুরি করার মতোই অত্যন্ত প্রচ্ছন্নভাবে উপভোগ করতে হয়, কারণ লোকচক্ষে সেটা অত্যন্ত পাপ কাজ. ধরা পড়লেই তার শাস্তি

অতি ভীষণ। এখন বুঝি, ঐ জাতীয় অভিজ্ঞতাটা জীবনে হয়তো একদিন অন্য উপায়েও উপলব্ধি হোতো, কিন্তু অল্প বয়সে ওর জ্ঞানলাভের সঙ্গে যে ভুল শিক্ষাটা আমি পেলাম সেটাই হোলো আমার পক্ষে মারাত্মক। যে শরীরবৃত্তি নিতান্তই স্বাভাবিক, সেটা রইল আমার মনে গুরুতর অপরাধের তালিকাভুক্ত হ'য়ে। এবং যেহেতু সেটা গুরুতর অপরাধ, সেই হেতু সেটা বালকের পক্ষে পরম লোভনীয়। তাতে যে কোনো আনন্দ আছে তা নয়, কিন্তু চুরি ক'রে ভোগ করার তীব্র উত্তেজনা আছে। এ-যে আমার পক্ষেই একটা নতুন আবিষ্কার তা নয়, আর এটা যে কোনো মারাত্মক অপরাধ তাও নয়, এইটুকু বুঝতে পারলাম অনেক বছর পরে। এই রকমের ভুল শিক্ষা প্রথম জীবনে কতই হয়, এক একটা ভুল শোধরাতে বহুকাল লেগে যায়। অনেকেরই এই সমস্ত ভুল ধারণা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্তই হয়তো থেকে যায়, বিকৃত ধারণা নিয়ে তারা সারাজীবনই কাটায়। হাতে-খড়ির সময় যদি কোনো ভুল বানান শেখা হয়, সেটা পরে শুধ্‌রে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

মনের আনন্দ আমি বাড়িতেও পেলাম না, স্কুলেও না, পেয়ে গেলাম বাংলা গানের মধ্যে, আর বাংলা বইএর মধ্যে। চলন্ত গরুর গাঁড়ির গাড়োয়ানরা পল্লী-পথে গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে গাড়ি চালাতো, তাদের মিঠা সুরের মেঠো গানগুলি আমার কানে এসে বাজতো নিকট থেকে ক্রমশ দূরে, দূর থেকে ক্রমশ নিকটে—সেই গ্রাম্য সুরের গ্রাম্য ভাষার গান। সেই সব গান শুনে শুনে আমি মুখস্থ করতাম, তাদের মতো সুরে গাইতে চেষ্টা করতাম। এ-ছাড়া সুযোগ পেলেই অনেক বাংলা বই পড়তাম। আমার কাকার এ-সব সঞ্চয় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের গল্প, বিবেকানন্দের বাণী। সস্তা সংস্করণের যা যা বেরুতো কাকা সবগুই কিনতেন। তাঁর ঘর থেকে লুকিয়ে এনে পড়তাম, আবার যথাস্থানে রেখে আসতাম। শুনেছি এগুলো অত্যন্ত বাজে বই, পড়লে কুশিক্ষা হয়, ঠাকুমা যদি এ বই পড়তে দেখেন তাহ'লে মহা বিপদ ঘটবে। তাই অত্যন্ত সাবধানে পড়তে হোতো, সেইজন্যে আরো বেশি ভালো লাগতো। সব কথা

আমি বুঝতাম না, কিন্তু ঐ না-বোঝার মধ্যেই এমন এক কুহক ছিল, পড়তে পড়তে আনন্দে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতো। যে রহস্যলোকের সন্ধান আমি কিছুই জানিনা, সে যেন তার দ্বার উদ্ঘাটন ক'রে আমাকে ভিতরে কোথায় টেনে নিয়ে যেতো। গভীর রাত্রে পর্যন্ত না ঘুমিয়ে আলো জ্বেলে আমি পড়তাম, ছট্টু সর্দারের নাসিকাগর্জনও আমার সে তন্ময়তা নষ্ট করতে পারতো না।

আরো এক আনন্দের সন্ধান পেলাম আমাদের পাড়ার দরিদ্র পল্লীবাসীদের মধ্যে। আমরা কথায় যাদের বলি ছোটলোক, তাদের সঙ্গে মেশা আমার শিশুকাল থেকেই অভ্যাস। স্কুলে আমার পড়ার সঙ্গী ছিল ভদ্রলোকের ছেলেরা, আর গ্রামে আমার খেলার সঙ্গী হোলো সেই ছোটলোকেব ছেলেরা। হরে, মধু, পঞ্চু, শিবে, দোলগোবিন্দ, বাদলা,—এরাই আমার খেলার সাথী। স্কুল থেকে ফিবে এসেই এদের পাড়ায় যেতাম। সেখানে হোতো ঘুড়ি ওড়ানো, চু-কপাটি, কিংকিং খেলা, বাতাবি লেবুর ফুটবল খেলা। এও আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেলতে হোতো, ঠাকুরদাদা কিংবা ঠাকুমা জানতে পারলেই সর্বনাশ। ছোটলোকের ছেলে,—যাবা গরু চবায়, জাল ফেলে মাছ ধরে, লাঙল চষে, যাবা সাতজন্মে কাপড ছাড়েনা, যারা জেলে দুলে বাগ্‌দি বাগাল, তাদের সঙ্গে চৌধুরী বাবুদের ছেলেব মেলামেশা? আমি বুঝতে পারতাম না এতে দোষের কি আছে, কিন্তু তবু এ বিষয়েও আমাকে লুকোতে হোতো। ভদ্রলোকের ছেলেদের চেয়ে এরা অনেক ভালো, এদের মনে কোনো কু-অভিসন্ধি ছিল না, এরা খেলা ক'রে আনন্দ পেতে এবং আনন্দ দিতে জানতো, কিন্তু তথাপি আমাকে এদের কাছে লুকিয়ে যেতে হোতো।

গ্রামের পাশে অতি প্রাচীন পার্বতী নদী, তাব দুই তীরে ঘন সর-কশাড় বন. সেই বন পাব হ'য়ে বালির চর। সেখানে যেতে একেবারেই নিষেধ, কারণ সর-বনের মধ্যে সাপ থাকে। কিন্তু বালির চড়ায় কপাটি আর কিংকিং খেলার বিশেষ সুবিধা। সেখানে কোনো বাধা নেই কারণ সহজে কেউ দেখতে পায়না, তাই সেখানেই যেতাম প্রত্যহ

খেলার সঙ্গীদের মধ্যে সব চেয়ে ভালো লাগতো বাদলাকে। কালো কুচ্‌কুচে চেহারা, ছিপ্‌ছিপে গড়ন, মাথায় তেলচুকচুকে ঢেউখেলানো টেরি, কিন্তু পরণে মাত্র একটি খাটো কাপড়। তার যত কিছু বিলাস ছিল ঐ টেরি নিয়ে, তার একটি চুলও এদিক ওদিক হবার যো নেই। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে প্রথমেই যেতাম বাদলাদের বাড়ি। সে'ও তখন গরু চরিয়ে বাড়ি ফিরতো। তার মা তাকে খেতে দিত এক কাঁসি লাল চালের ভাত, শাকভাজা, কাঁচা লঙ্কা আর ভাতের রাশির মধ্যে গর্ত ক'রে খানিকটা কলাইএর ডাল। উবু হ'য়ে বসে গ্রাসের পর গ্রাস তুলে বাদলা নিমেষের মধ্যে ভাতগুলো উদরসাৎ ক'রে ফেলতো। তাই দেখেই কেমন মায়া হোতো, জানতাম না এর নাম ভালোবাসা।

বাদলার মা বলতো,—হাঁরে আব চারটি ভাত দেবো? বাদলা অম্লানবদনে বলতো,—দাও। মা বলতো,—কি দিয়ে খাবি, একটু তেঁতুল নিবি? বাদলা বলতো,—হুঁ।

আমি বসে বসে মুগ্ধ হ'য়ে বাদলার ভাত খাওয়া দেখতাম। তার মাকে জিজ্ঞাসা করতাম,—দুপুরে তো ভাত খায়, আবার এখন ভাত খায় কেন? এখন বরং কিছু জলখাবার খেতে দাও না কেন?

বাদলার মা হেসে বলতো,—কি জলখাবার দেবো, লুচি মণ্ডা? ও সব আমরা কোথায় পাবো বাবা?

—কেন মুড়ি আছে, চিঁড়ে আছে, আবো কত সব আছে।

—ওতে আমার ছেলেদের পেট ভরে না। বাইরে ঘুরে এলেই ওদের বড়ো খিদে পায়, তখন চারড়ি ভাত পেলেই পেটটা ভরে। আর তো কিছু নেই, ঘরে শুধু চালই আছে, ভাত রেঁধে রাখি, তাই ওরা দিনে তিন চারবার খায়। আর কোথায় কি পাবো বলো? তোমার ঠাকুমা তোমায় কি জলখাবার খেতে দেয় খোকাবাবু?

আমি অনেক রকম মিষ্টান্ন দ্রব্যের নাম করতাম।

—ওতে তোমার পেট ভরে তো?

—তা ভরবে না কেন?

মুখে বলতাম এই কথা, এদিকে আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে চেয়ে বাদলার ভাত খাওয়া দেখতাম। বাদলার মা বোধহয় মনে করতো যে আমার ঐ খেতে লোভ হচ্ছে। বলতো,—আমার হাতে তো তোমাদের খেতে নেই, নইলে এই লাল চালের ভাত রেঁধে একদিন খাওয়াতাম।

বাদলাদের দারিদ্র্য দেখে আমার দুঃখ হোতো। মনে মনে সংকল্প করতাম, যদি কখনো বড়লোক হই, বাদলাকেও আমি বড়লোক ক'রে দেবো।

একদিন ছিল আমাদের হরা-পোড়া। ঐ অঞ্চলের পল্লীবাসী ছেলেদের মধ্যে এ একটা উৎসব, শরৎকালের শেষে হয়। সরের পুষ্প আর কাশের ফুল যখন ফুটে গিয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়বার সময় হয়, তুলোর ফেঁসোর মতো কাশের ফুলগুলি যখন খসে খসে বাতাসে উড়তে থাকে, সেই সময় একদিন রাশি রাশি সরের পুষ্প সকলে মিলে কেটে এনে একত্রে জড়ো করে। সেগুলিকে লম্বা লাইন ক'রে সারে সারে সাজানো হয় রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত। তখন সেই লাইনের একটি প্রান্তে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। নিমেষের মধ্যে সেই আগুন সর্বত্র সঞ্চারিত হ'য়ে সমস্ত লাইনগুলি একত্রে দাউদাউ ক'রে জ্বলে ওঠে। সকলে মিলে তাই দেখে আনন্দে হাততালি দিতে থাকে।

সরপুষ্প সংগ্রহ করতে করতেই দেরী হ'য়ে গেছে, সেগুলি লাইন ক'রে সাজাতে সাজাতে সন্ধ্যা হ'যে গেল। আর অন্ধকারটা একটু গাঢ় না হ'লেই বা হরা-পোড়ার চমৎকারিত্ব প্রকাশ পাবে কেন? সুতরাং আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো। আমোদটা সম্পূর্ণ ক'রে বাড়ি ফিরতে আমার খানিকটা রাত্রি হ'যে গেল। সন্ধ্যার মধ্যেই পড়তে বসার কথা, তার অনেকটা বিলম্ব ঘটলো।

ঠাকুরদাদা ইতিমধ্যে আমার সন্ধান করেছিলেন, আমি যে বাদলাদের সঙ্গে মিশে কোথায় যাই, কি খেলা করি, সে খবরও তিনি জেনেছিলেন। অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে, এবার শাসন করা দরকার, সম্ভবত এই ভেবে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। আমি ঘরে ঢুকে পড়তে বসবামাত্রই তিনি আমাকে

ডেকে পাঠালেন। বজ্রগম্ভীর স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলি ?

—খেলতে গিয়েছিলাম, বাড়ি ফিরতে আজ একটু দেরী হ'য়ে গেল।

—আমি সব জানি। তুই কোথায় যাস, কাদের সঙ্গে মিশতে শিখেচিস, কিছুই জানতে আমার বাকি নেই। ঐ বাদলা ছোঁড়াটা যে আমাদের গরু চরায়, সেই হোলো তোর ইয়ার! যত সব ছোটলোক ইতরদের সঙ্গে মিশে মিশে এমনি বিগ্‌ড়ে গেছিস, এত রাত্রে বাড়ি ফিরতে তোর প্রাণে একটু ভয়ও হয়না। এই শেষবার বলে দিচ্ছি, খবরদার ঐ সব ছোটলোকের সঙ্গে আর মিশতে পাবিনা, কাল থেকে বাড়িতে খেলা করবি। এই আমার কড়া হুকুম দেওয়া রইল।

সর্বনাশ, বিকেলেও একটু খেলতে যেতে পাবোনা ? দিনান্তে যেটুকু আনন্দ পাই সেটুকুও গেল ? মুখ বুজে এ-আদেশ মেনে নেওয়া যায় না, এর প্রতিবাদ করা দরকার। আমি বেপরোয়া হ'যে বললাম—কেন, ওদের সঙ্গে মিশতে এমন দোষ কি ? আপনি বারণ করচেন, কিন্তু আমি ভালো ভালো বইতে পড়ে দেখেছি ওদের সঙ্গে মেশাই আমাদের উচিত, না মেশাই বরং অন্যায়।

—বটে ? কোথায় কোন বইতে এ-কথা লেখা আছে শুনি ?

—এখনই দেখাচ্ছি,—ব'লে আমি ছুটে গিয়ে আনলাম স্বামী বিবেকানন্দের একখানা বই। তাতে এক জায়গায় লেখা আছে—'দেশের ইতর সাধারণ লোককে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ।' সেই জায়গাটা খুলে ঠাকুরদাদাকে দেখিয়ে দিলাম।

ঠাকুরদাদা ভীষণ চটে উঠলেন। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন—ডেঁপো ছেলে, এত উন্নতি হয়েছে তোর, বই দেখিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করিস! তাইতো ভাবি, প্রথমে এসেছিলি ভারী নিরীহ সুবোধ ছেলেটি, এই ক'টা বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে এমন ফাঁকিবাজ হ'য়ে উঠলি কেমন ক'রে ? নিজের পড়ার বই কোথায় পড়ে থাকে তার ঠিক নেই, এই সব বাজে বই তোমার পড়া হচ্ছে ?

এবার যদি দেখি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হ'তে পারোনি, তাহ'লে তোমার হাড়-মাস আলাদা ক'রে ছাড়বো।

আমার মনটা তৎক্ষণাৎ বিমুখ হ'য়ে উঠলো। ঠাকুরদাদার ভয়ে আমাকে ফার্ষ্ট হ'তে হবে? যদিও বা হতাম, কিন্তু আর আমার সে ইচ্ছে নেই। 'দোষ দেখিয়ে কোনো ভালো কাজ করানো যায় না, হাজার হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে,'—মনে পড়লো যে এ-কথাও লিখেচেন স্বামী বিবেকানন্দ।

ঠাকুরদাদা ভীষণ রেগেছেন দেখে কাকা আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

কাকা ছিলেন একটু অন্যরকম ধরণের মানুষ। মাথার কিছু ছিট ছিল। প্রচুর দাড়িগোঁফে সমাচ্ছন্ন মুখটা প্রায় অন্ধকার, বোঝা যেতোনা হাসছেন কি গম্ভীর হ'য়ে আছেন। বুকে চুল, পিঠে চুল, হাতে পায়ে চুল, চোখের ভুরুতে চুল,—চতুর্দিকে ঘন চুলের রাশি। সমস্ত শরীরটাকে শিথিল ক'রে দিয়ে ভুঁড়িটি দুলিয়ে দুলিয়ে একপাশে ঘাড় বেঁকিয়ে মন্থরগতিতে পথ চলেন। গ্রামে পোষ্টমাষ্টারি করেন, এবং সকল সময়েই পড়েন বই কিংবা খবরের কাগজ। দুনিয়ার সব কিছুই তাঁর কাছে ভালো। যা কিছু ঘটতে দেখা যাচ্ছে তা ভালো, যে যা করছে তা ভালো, যে যা বলছে তা ভালো,—সকল বিষয়ে এই একটিমাত্র অভিমতই তিনি পোষণ করেন। প্রশ্ন করলে এই ভালো বলার সপক্ষে একটা যুক্তিও দেখিয়ে দেন। মাঝে মাঝে কথা যা বলেন তা নতুন কেউ শুনলে মনে করবে বেফাঁস বলছেন, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়, নিতান্ত অন্যমনস্ক হ'য়ে একটার বদলে অন্য বাক্যের প্রয়োগ করছেন। যে কথাটা মুখে উচ্চারণ করলেন তার অর্থ তাই ধরে নিলে চলবে না, কারণ সেটা ওঁর বক্তব্য না হ'তেও পারে, আকারে ইঙ্গিতে আভাসে অবস্থানুযায়ী বুঝে নিতে হবে আসলে কোন কথাটা তিনি বলতে চাইছেন। খেতে বসে হয়তো বললেন,—একটু বালিশ এনে দাও তো। খেতে বসে অবশ্যই বালিশের কোনো প্রয়োজন নেই, উপস্থিত প্রয়োজন হয়েছে গেলাসে

একটু জল এনে দেবার, অন্যমনস্কে গেলাসের বদলে বলচেন বালিশ। কোনো অসুখবিসুখ হ'লে পড়ে পড়ে কেবল যন্ত্রণা ভোগ করেন, কোনো সেবাও নিতে চাননা, ওষুধও খেতে চাননা। একবার নিমন্ত্রণ খেয়ে পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছেন দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কাকা, ডাক্তার ডেকে আনবো? কাকা বললেন—না না, ও আপনিই সেরে যাবে। মাঝে মাঝে অসুখ হওয়া ভালো, ওতে শিক্ষা হয়। দোষ করেছি তাই এখন শিক্ষা পাচ্ছি, যাতে আর কখনো এই দোষটা না করি।

সেদিন কাকা আমাকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন—ও-বই তুই কোথায় পেলি? আমার ঘর থেকে কিনে এনেছিলি না আব কোথাও?

—না, তোমার ঘব থেকেই এনেছিলাম কাকা, শুধু একবাব পড়বার জন্যে। এখনই তোমার ঘরে আবার রেখে দিচ্ছি।

—বেশ করেচিস, বেশ করেচিস, বই পড়া খুব ভালো। না ব'লে আনলেও কোনো দোষ নেই। না ব'লে বাগান থেকে ভালো ফুল তুলে নেওয়া, ঘর থেকে ভালো বই তুলে নেওযা, আর ভালো বই থেকে ভালো কথা তুলে নেওয়া, ও সবই সমান, ওতে কোনো দোষ হয় না। তোর ঠাকুরদাদা যা বলচে বলুক, ওতে কোনো ভয় করিসনে। আমাব বই সবই নিবি, যখন খুশি পড়বি। তোব বেশ মনে থাকে দেখচি, এটা খুব ভালো। কি কি বই পডেচিস বল।

—তোমাব সব বইগুলোই আমি পড়েচি।

—বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়েচিস? কমলাকান্তের দপ্তর?

—হাঁ পডেচি।

—কেমন লাগলো বল। সব কথা মনে আছে তো?

—হাঁ মনে আছে। খুব ভালো লেগেছে, ভারী মজাব বই। কিন্তু ওর মধ্যে অনেকগুলো কথা কিছু বুঝতে পারিনি।

—বোঝার তো দরকার নেই—মজা পাওযারই দবকার। বুঝিস আর নাই বুঝিস, ভালো লেগেছে তো, যখনই মনে পড়ে তখনই খুশি হ'যে উঠিস তো?

তাহ'লেই হোলো। তুই পড়বি, আমি বলচি তুই পড়বি। সব রকমের বই পড়াই ভালো। কত রকমের মানুষ আছে দেখেচিস তো? মানুষ দেখতে কোনো দোষ আছে কি? তেমনি বই পড়তেও কোনো দোষ নেই। মানুষ দেখাও যা আর বই পড়াও তাই, ও একই জিনিস।

কাকার কথাটা আমার বেশ মনে লাগলো। পড়ার বই ফেলে রেখে আমি নানারকম বই পড়তাম, আর নানা রকমের মানুষ দেখতাম। রাহী লোকেরা দূরের রাস্তা দিয়ে চলেছে, চাষীরা মাঠে ধান রুইছে, ঘরামি মাথায় গামছা জড়িয়ে কুঁড়েঘরের চালের ওপর খড় ছাইচে, মেয়েরা কলসিতে পুকুরের জল নিয়ে ঘরে যাচ্ছে, বৈরাগীরা মন্দিরা বাজিয়ে বাউল গান করচে, দোকানী চাটাই পেতে হাঁড়ি ঘুরিয়ে বাতাসা গড়ছে, জেলেরা উরুর ওপরে টাকু ঘুরিয়ে মাছের জালের সুতো পাকাচ্ছে, আরো কত লোকে কত রকমের কাজ করছে,—আমি পড়তে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু এই দেখতাম, বইএর একটিও পাতা ওল্টানো হোতো না। ঠাকুমা সন্ধান নিতে এসে দেখে যেতেন আমি বহুক্ষণ পড়ার ঘরেই বসে আছি, সুমুখে বই খোলা রয়েছে, তাই দেখে খুশি হ'য়ে তিনি নিঃশব্দে চলে যেতেন। খাবার সময় হ'লে ডাক পড়তো, আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে যেতাম।

খেলা ছেড়ে দিলাম, সঙ্গ ছেড়ে দিলাম, পড়া ছাড়া কিছুই আর করবার রইল না, কিন্তু তবু কিজানি কেন পাঠ্য বই পড়ায় আমার মন বসলো না। সেবার পরীক্ষায় আমি ফেল হলাম। মাষ্টাররা প্রমোশন দিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু লজ্জায় আমি কারো মুখের দিকে চাইতে পারলাম না।

কাকা বললেন—এক আধবার ফেল করা ভালো।

তাঁর ছেলে সুবল ফস্ ক'রে বললে—তাই কি কখনো হয়? ফেল করাও ভালো?

কাকা বললেন—আলবৎ ভালো, তুই বুঝবি কেমন ক'রে? একবার ফেল করলে তবে তো পরের বারে জানবি পাশ করার কত আনন্দ। যারা বরাবরই

পাশ করছে তাদের পক্ষে তো ওটা একঘেয়ে ব্যাপার। একটা জিনিস হারিয়ে ফেলে আবার নতুন ক'রে খুঁজে পেলে কত সুখ হয় তা কি বুঝিস? তুই সে কথা কখনই বুঝবি না, তুই যে বেশি সাবধানী।

সুবল আবার প্রশ্ন করলে—সাবধানী হওয়াটা খারাপ বুঝি?

কাকা বললেন—না, তা কেন, সাবধানী হওয়াও খুব ভালো। দাড়ি কামাবার ক্ষুর দেখেছিস? সবই অমনি। সাবধান না হ'লেই অমনি কুচ্ ক'রে কেটে যায়। সেই ভয়েই আমি দাড়ি কামাই না। রাস্তায় সাবধানে না চললেই পা মুচ্‌ড়ে যায়, পাহাড় চাপা পড়ে।

আন্দাজে বুঝে নিলাম, পাহাড়চাপা অর্থে গাড়িচাপা।

এ বছর না হয় প্রমোশন পেলাম, কিন্তু সামনেব বছরেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা। ঠাকুরদাদা লিখলেন বাবাকে—তোমাব ছেলের একটা ব্যবস্থা করো, ওর বুদ্ধিটা বড়ো ভোঁতা, এ বকম ভাবে পড়লে ও পাশ করতে পারবে না। বাবা লিখলেন ঠাকুরদাদাকে,—আপনি ওকে হুগলিতে পাঠিয়ে দিন দাদার কাছে। সেখানে তিনি নিজেই স্কুলেব হেডমাষ্টার, তাঁর চোখে ও ফাঁকি দিতে পাববে না।

এবাব হুগলিতে জ্যাঠামশায়েব কাছে আমার বাসস্থান নির্দিষ্ট হোলো।

সেখানে গিয়ে প্রথমেই দেখলাম পোষ্টমাষ্টার আর স্কুলমাষ্টারে অনেক তফাৎ। জ্যাঠামশাই কাকার চেয়ে একেবারে উল্টো প্রকৃতির। দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথাব চুল অল্পবযস থেকেই পাকা, অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ছেলে পড়াতেও জানেন, ছেলে শাসন করতেও জানেন। অন্য কোনো রকমের বই কস্মিনকালেও পড়েন না, বঙ্কিমচন্দ্রের নামও হয়তো জানেন না, খবরের কাগজটা খুলেও দেখেন না। পড়বার বই এবং পড়ুয়া ছেলে, এই নিয়েই সর্বদা থাকেন। আঁক কষতে অদ্বিতীয়,—আর অতিশয় মিতব্যয়ী। একা থাকেন একটি ভদ্রলোকের বৈঠকখানার ঘরে, গঙ্গায় গিয়ে স্নান ক'রে আসেন, আর খেতে যান এক ব্রাহ্মণ বিধবার ঘরে, সেখান থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। একটু

ঘি আর দই মেখে একবেলা নিরামিষ আহার করেন। অন্য বেলাটা গয়লার খাঁটি দুধ আর মুড়ি মুড়কি প্রভৃতি দোকানের জলখাবার খেয়ে কাটিয়ে দেন।

জ্যাঠামশায়ের কাছে আর কিছু না হোক, মনের কোনো অশান্তি ছিল না। পরিচিত অন্য কেউ ছিল না, তাঁর সঙ্গেই সর্বদা ঘুরতাম। সেখানে থেকে আমার পড়াশোনা মন্দ হয়নি। তিনি বেশ বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমাকে পড়িয়ে দিতেন, ভুল করলে রেগে না উঠে আবার বোঝাতেন, বসে বসে প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখতে শেখাতেন।

কিছুদিন পরেই হোলো আমার চোখের অসুখ। দেখতে দেখতে অন্ধপ্রায় হ'য়ে গেলাম। লেখাপড়া ঘুচে গেল। বাবা নিজে এসে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে অনেক ডাক্তার দেখালেন। ডাক্তাররা বললে, হয় কোনো খারাপ রোগের বিষ থেকে, কিংবা কোনো খাদ্যের অভাব থেকে এই রোগটি হয়েছে, সারবে কিনা সন্দেহ। ভিটামিনতত্ত্বের তখন আবিষ্কার হয়নি। একটা বছর চোখেই দেখতাম না, আলোর দিকে চাইতে পারতাম না, অন্ধকার ঘরের মধ্যে সর্বক্ষণ থাকতাম।

মনে করলাম, এই বয়সেই আমার চোখ গেল! একে ওকে কাছে ডেকে এনে বসাতাম, বই পড়িয়ে শুনতাম। একবার যা শুনতাম তা পরিষ্কার মনে থাকতো, তাই নিয়ে মনে মনে সারাক্ষণ জল্পনা করতাম। প্রাণপণে সর্বদা হাসিমুখে থাকতাম, কাউকে জানতে দিতাম না যে আমার মনে কোনো কষ্ট আছে। কিন্তু অন্ধ হওয়ার যে কি কষ্ট সে আমিই জেনেছি।

পশ্চিমে বাবার কাছে গিয়ে আমার যথেষ্ট যত্ন হোলো, বহু রকমের চিকিৎসা হোলো, ক্রমে ক্রমে আমি সেরে উঠলাম। কিন্তু এই বয়সের দুটো বছর বৃথায় নষ্ট হোলো।

মীরার কথা

মীরা নামটা আমার জন্মনাম নয়। আমি বড়ো হ'লে বাবা আসল নাম ছেড়ে আমাকে ঐ নামে ডাকতে শুরু করেন। গোড়াতে আমার নাম ছিল শিবানী। নিতান্ত সেকেলে নাম, কিন্তু তখনকার দিনে ঠাকুরদেবতার নামটাই লোকে পছন্দ করতো, আর অনেক বনেদি বংশে তখন নাম রাখবার এক একটা বংশগত ধারাও ছিল। আমার পিতৃবংশের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন শৈব, তাই এ বংশে বরাবরই ছেলেদের নাম রাখা হতো শিবের নামে আর মেয়েদের নাম রাখা হতো দুর্গার নামে। আমার বাবার নাম ছিল শিবসুন্দর রায়। আমার একটিমাত্র ভাই, তার নাম শঙ্কর। আমরা তিন বোন, আমাদের তিনজনের নাম ভবানী, সর্বাণী, শিবানী। আমি সকলের ছোটো, তাই ছিলুম বাবার সব চেয়ে আদুরে মেয়ে। বড়ো দুটি বোন আমার চেয়ে অনেক বড়ো, আমি যখন জন্মেছি তখন তাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে।

কলকাতার পাথুরেঘাটা অঞ্চলের রায় বংশের নাম করলে এখনও অনেকে চিনতে পারবে, যদিও তার জারিজুরি আর কিছুই নেই। আমার যখন জ্ঞান হয় তখনও তার নামডাক কিছু কিছু ছিল, সেই ভগ্নাবশিষ্ট ভিটেবাড়িটার প্রকাণ্ড জীর্ণ থামগুলোর মতো। এখন আর তাও অবশিষ্ট নেই। নবাব আলিবর্দি খাঁর আমলে আমার বাবার প্রপিতামহ ছিলেন সুতানুটি পরগণার দেওয়ান। তিনি অনেক জায়গীর পেয়েছিলেন এবং রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। তারপরে মিরজাফরের কোপে পড়ে তাঁর চাকরিটি এবং উপাধিটি খোয়া যায়। তবুও সম্পদ এবং সম্ভ্রম যথেষ্টই ছিল। বংশানুক্রমে ক্ষয় হ'তে হ'তে এবং ভাগবাটোয়ারা হ'তে হ'তে বাবার হাতে যেটুকু এসে ঠেকলো তাতে চাকরি না করলেও কোনোমতে সংসার চলে, কিন্তু বাবুগিরি চলে না।

অথচ বাবুগিরি ছিল বাবার জন্মগত প্রকৃতি, মনেপ্রাণে তিনি ছিলেন শৌখীন, অনতিকালপূর্বের কলকাতা শহরের শৌখীনযুগেব শেষ নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' সকলেই পড়েছেন, তাঁর বিপ্রদাসবাবুর নাম করলে সকলেই চিনতে পারবেন। আমার বাবা ছিলেন হুবহু সেই মানুষটি। প্রথম যখন 'যোগাযোগ' পড়ি তখন অবাক হ'য়ে ভেবেছিলুম, বাবাকে দেখেই হয়তো রবীন্দ্রনাথ ঐ চরিত্র এঁকেছেন। যখন ঐ বইখানা বেরিয়েছে তখন বাবা বেঁচে নেই। বইখানা বোধ হয় আদ্যোপান্ত আমি পঁচিশবার পড়েছি। প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গেছে, তবু এখনো মাঝে মাঝে পড়ি। পড়লেই মনে হয় বাবা বেঁচে রয়েছেন, তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

নায়েব গোমস্তারা বলতো রাজাবাবু, সে নামের যথেষ্ট সার্থকতা ছিল। তাঁর প্রত্যেক চলায় বলায় ধরণধারণে এমন একটা আভিজাত্য আপনা থেকেই ফুটে বেরুতো, যেমন মিহি আদ্দির পাঞ্জাবীর ভিতব থেকে সর্বদাই ফুটে বেরুতো তাঁর ধব্ধবে ফর্সা গায়ের বং। শখ এবং প্রসাধন করতেন বাছাইকরা জিনিসগুলি দিয়ে, নিজেই সেগুলি সংগ্রহ ক'বে রাখতেন। তিনি যে তামাক খেতেন সেটা আসতো খাস গয়া থেকে। যে আলবোলায় তামাক খেতেন তাতে প্রত্যহ ভরা হতো গাজীপুরের গোলাপজল, তার নলে জড়ানো থাকতো টাটকা বেলফুলের মালা। মাঝে মাঝে সিগারেট খেতেন সোনালি পাড় দেওয়া, পানের সঙ্গে খেতেন খাস কাশীব কস্তুরী দেওয়া জর্দা। মাথায় মাখতেন চামেলি, গায়ে মাখতেন ফরাসী সাবান, রুমালে মাখতেন রিগডেব এসেন্স। সবই মৃদুগন্ধবিশিষ্ট, কোনোটা বেশি উগ্র নয়। কতকগুলো বিষযে তাঁর শখ ছিল.বিলাতীঘেঁষা। ফার্ণিচাবগুলো ছিল বিলাতী, অয়েলপেণ্টিং ছিল বিলাতী, শীতের সময় গায়ে দেবার চেষ্টারফিল্ড ছিল বিলাতী।

বাবা যখন ঈজিচেয়ারে বসে আলবোলায় তামাক খেতেন তখন তাঁর পিঠের কাছে গিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকতুম। আর কিছুর জন্যে নয়, কেবল তাঁর গায়ের গন্ধটুকু পাবার লোভে। ঐ তামাকে জর্দায় এসেন্সে বেলফুলে মিশ্রিত 'এমন

একটা মিষ্টিমিষ্টি গন্ধ ছিল বাবার গায়ে, সে যেন আমাকে আকর্ষণ করতো, আমি কিছুতে বাবার কাছ থেকে নড়তে পারতুম না। ছেলেবেলা থেকেই আমি গন্ধবিলাসী, ওটা আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। কেবল গায়ের গন্ধ থেকে আমি ভালোমন্দ মানুষ চিনতে পারি, সে চেনা আমার প্রায়ই ভুল হয় না। আমাব বিশ্বাস, যে মানুষ ভালো, তার গায়ের গন্ধ অন্তত খানিকটা ভালো হ'তেই হবে। বাবা সুগন্ধ মাখতেন ব'লে নয়, এমনিতেই তাঁর গায়ে একটা চমৎকাব গন্ধ ছিল।

ছেলেবেলাকার অনেক গল্পই আমার মনে পড়ে। ছেলেবেলায় আমি ভাবী দুষ্টু ছিলুম। এখনই যে নিতান্ত ভালোমানুষটি হ'য়ে গেছি তা নয়, তাহ'লে আর এমন কাহিনী আমাকে লিখতে হতো না। খুব ছেলেবেলাতেই অনেককে ঘোল খাইযে ছেড়েচি। মনে আছে অল্প বয়সে আমি পড়তে যেতুম পাড়ার একটা মিশনরি স্কুলে। পথ দিয়ে আমি কখনো ধীর হ'যে চলতে পারতুম না। পিঠে ঝুলতো বিনুনি করা চুলের লম্বা বেণী, ছুটতে গেলে সেটা লট্‌পট্‌ করতো। আমি বিনুনিটার শেষ প্রান্ত দাঁত দিয়ে চেপে ধবে তীববেগে ছুটতুম। যখন তখন রাস্তায় ছুট দিতুম, বাড়ির চাকরবাকর কিংবা দরোয়ান কেউ আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারতো না। বাবার কাছে নালিশ যেতো, কিন্তু বাবা তাতে রাগ করতেন না, পিঠে হাত চাপড়ে একটু হাসতে হাসতে বলতেন—মেয়েটা পাগলী। অবশ্য তখনকার দিনে কলকাতা শহরে এত মোটরগাড়ি ছিল না, গাড়ি ঘোড়ার সংখ্যাই ছিল কম, আমাদের গলির মধ্যে প্রায় কোনো গাডি ঢুকতোই না। কিন্তু তবু আমারও একটু বাডাবাড়ি ছিল বৈকি। লোকে বলতো,—কী দস্যি মেয়ে বাবা!

স্কুলে গিয়েও আমি ঝগডা করতুম। মেয়ে মাস্টারদের বকুনি আর চোখ-রাঙানি আমার মোটে সহ্য হতো না। একটু বয়স হ'তেই বাবা বললেন,—তোর আর স্কুলে পড়তে গিয়ে কাজ নেই, তুই আমার কাছেই পড়বি। আমার তাতে কোনো আপত্তি ছিল না, আমি বাবার কাছে খুব মন দিয়ে

পড়তুম, তাঁর কাছে অনেক লেখাপড়া শিখেছিলুম। কিন্তু রাস্তায় বেরোনো তখন থেকেই একরকম বন্ধ হ'য়ে গেল।

নামকরণ সম্বন্ধে আমার একটা অদ্ভুত রকমের পটুত্ব ছিল। বাড়িতে অনেকের আমি এক একটা স্বতন্ত্র নাম রেখেছিলুম, আর রাগ হ'লে তাদের ডাকতুম আমার স্বকৃত নামে। আমাদের বাড়িতে এক ঝি ছিল, সে অনর্থক যা তা বাজে বকতো, তাকে বলতুম তেলেনা। আমাদের বাড়ির রান্নাবান্নার তদারক করতেন এক বিধবা পিসি, তিনি আমাদের খাবার বেড়ে দিতেন, কিন্তু হাতে ছিল খুব বড়ো বড়ো নখ, তাঁর নাম দিয়েছিলুম শূর্পণখা পিসি। বাবার একজন দূরসম্পর্কের কাকা থাকতেন আমাদের বাড়িতে, বৈঠকখানা ঘরে শুতেন, নানারকম ফাইফরমাস খাটতেন। যেমন চমৎকার চেহারা, তেমনি চমৎকার স্বভাব। একটি পায়ে বাত, সেই পা-টা লেংচে লেংচে চলতেন। গলার স্বরটা ছিল হাঁড়িচাঁচার মতো। বাবা তাঁকে ডাকতেন—শচীকাকা, আমি বলতুম ছাঁচিকাকা। বাবা হেসে জিজ্ঞাসা করতেন,—ওঁকে তুই ছাঁচিকাকা বলিস কেন? আমি বলতুম,—যেমন ছাঁচি কুমড়ো আর ছাঁচি পান, তেমনি ছাঁচিকাকাও তো হ'তে পারে। ঐ নামে তাঁকে ডাকলে তিনি ভাবতেন আমি তাঁর সঙ্গে রসিকতা করছি, তিনিও আমার সঙ্গে একটু রসিকতা করবার প্রয়াস ক'রে বলতেন,—আমার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, তখনও কি কাকা ব'লে ডাকবি? আমি ভীষণ রেগে উঠে বলতুম,—ওকথা খবরদার বলবে না, তাহ'লে তোমাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবো। তিনি ভাবতেন রসিকতাটা সার্থক হয়েছে। একদিন তিনি আমার হাতটা ধরে ফেললেন, বললেন —আর যাবি কোথায়, এবার আমাকে বিয়ে করতেই হবে। তখনই তাঁর হাতখানা কামড়ে রক্ত বের ক'রে দিলুম। তিনি আমার মায়ের কাছে গিয়ে নালিশ করলেন। তিনি জানতেন যে বাবাকে ব'লে কিছু ফল হবে না। মা আমাকে খুব ধমকালেন। আমি বললুম,—বেশ করেছি। ও আমাকে বিয়ে করতে চায় কেন ঐ চেহারা নিয়ে? ওর লজ্জা করে না?

মায়ের সঙ্গে আমার বনতো না। তিনি আমাকে শাসন করতে যেতেন, কিন্তু সে আমার কোনোকালে সহ্য হতো না, আমি সমানে তাঁর সঙ্গে উত্তর প্রত্যুত্তর করতুম। তিনি বলতেন, বাপের আদর পেয়ে পেয়ে আমি নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছি, শ্বশুরবাড়িতে আমাকে অনেক দুঃখ পেতে হবে। আমি বাবার মেয়ে, বাবার কাছেই থাকতুম, মাকে বড়ো একটা গ্রাহ্যই করতুম না।

আমার দাদার কথা এখনো বলা হয়নি। দাদাতে আর আমাতে ছিলুম পিঠোপিঠি ভাইবোন। দাদাই ছিল আমার একমাত্র খেলবার আর ঝগড়া করবার সাথী। পাড়াপড়সী অন্য কোনো ছেলে কিংবা মেয়ের সঙ্গে আমি কখনো মিশিনি। কেউ কেউ আসতো ভাব করতে কিন্তু আমার সঙ্গে তাদের বনতো না, আমার ভাবগতিক দেখে সরে পড়তো। দাদা ছিল নিতান্ত ভালোমানুষ, ভয়ে ভয়ে সে আমার বাধ্য হয়েই থাকতো। সেইজন্যে তার সঙ্গে আমার বনতো। খেলার বিষয় নিয়ে যদি কখনো মতের অমিল হতো অমনি আমি তাকে দুম্‌দাম্ পিটিয়ে দিতুম। দাদা কাঁদতে জানতো না, ছোটো বোনের কাছে মার খেয়ে লজ্জায় চুপ করেই থাকতো, সুতরাং শীঘ্রই আমাদের ঝগড়ার মীমাংসা হ'য়ে যেতো। একটু বড়ো হ'তেই দাদা স্কুলে ভর্তি হলো, পড়া নিয়ে তাকে ব্যস্ত হ'তে হলো, খেলবার সুযোগ আর রইল না। খেলা করবার প্রবৃত্তি আমার তখন থেকেই একরকম ঘুচে গেল।

আমি নামকরণের কথা বলছিলুম না? আমার নিজেরও একটা নামকরণ করা হয়েছিল। একদিন রাস্তা দিয়ে বেদম ছুটেচি, অন্যমনস্কে কোন গলি থেকে কোন গলিতে গিয়ে পড়েচি মোটে খেয়ালই নেই; শেষে একটা বড়ো রাস্তায় পড়ে আমার চৈতন্য হলো। এ রাস্তায় কোথায় এলুম? চারিদিকে চেয়ে দেখি, কিছুই বুঝতে পারিনা। এদিকে ভয়টুকুও আছে, হাতে রয়েছে সোনার বালা, কেউ যদি কেড়ে নেয়। ভয়ে ভয়ে একজনদের বাড়ির দরজায় ঢুকে পড়লুম। ভিতর থেকে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে আসতেই তাঁকে

বললুম,—বাড়ি যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না, আমাদের গলিটা কোনখানে একটু দেখিয়ে দাওনা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কোন গলি, কত নম্বরের বাড়ি? আমি গলির নামও জানিনা, নম্বরও জানিনা, জায়গাটার নাম পাথুরেঘাটা এইটুকু মাত্র জানি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কাদের বাড়ির মেয়ে? আমি বললুম,—আমি রাজাদের বাড়ির মেয়ে, সেই যে-বাড়িতে মোটা মোটা থাম আছে, বৈঠকখানায় একটা ঝাড়লণ্ঠন ঝুলচে। কিন্তু এতে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না, ভদ্রলোক আমাকে থানায় নিয়ে গেলেন। থানার ইন্‌সপেক্টর আমাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলে, তাকেও ঐ একই রকম পরিচয় দিলুম। এদিকে বাবা নিজেই আমার খোঁজ করতে বেরিয়েছিলেন, ঘণ্টাকতক পরে তিনিও সেই থানায় গিয়ে হাজির হলেন। বাবার সঙ্গে যখন সেখান থেকে চলে আসছি তখন ইন্‌সপেক্টর আমাকে হাসতে হাসতে বললে,—কৈ খুকী, তুমি না বলছিলে কোথাকার তুমি রাজকন্যে? আমি তো ভয়েই মরি। বাবাই হাসতে হাসতে সে কথার জবাব দিলেন,—ও নিতান্ত মিথ্যে বলেনি। পূরাকালে ঐরকমই একটা পরিচয় আমাদের ছিল কিনা, ও ভেবেছে সেটা বললে হয়তো আপনারা চিনতে পারবেন। সেই অবধি সকলে আমাকে ঠাট্টা ক'রে বলতো রাজকন্যে।

বাবা ছাড়া আরো একজনকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসতুম। তিনি আমার দিদিমা। এক এক সময় মনে হয়েছে বাবার চেয়েও হয়তো দিদিমাকে আমি বেশি ভালোবাসি,—সে যখন তাঁর কোলটির কাছে শুয়ে শুয়ে মহাভারতের গল্প শুনতুম তখন। দিদিমার কেউ ছিল না। একটিমাত্র ছেলে মারা যাবার পর আমার বিধবা মামীকে নিয়েই তিনি থাকতেন। মামার বাড়িটা ছিল আমাদের বাড়ির খুব কাছে। প্রায় আমি সেখানে গিয়ে থাকতুম, বিশেষ যখন মায়ের ওপর রাগ হতো। দিদিমাকে আমি বলতুম জান্‌কীমায়ী। দিদিমার নাম ছিল জানকী, ও বাড়ির একজন সেকেলে বুড়ো চাকর তাঁকে বলতো জান্‌কীমায়ী, আমি তার থেকেই শিখেছিলুম।

জান্‌কীমায়ীর জ্যোতির্ময়ী মূর্তিটা এখনো আমার চোখের ওপর ভাসচে। আম পাকলে যেমন তার রংটা টক্‌টকে লাল হ'য়ে ওঠে তেমনি ছিল তাঁর গায়ের রং। থল্‌থলে মাংসপিণ্ড নয়, কিন্তু নতুন তৈরি লেপ যেমন নরম হয় তেমনি নরম ছিল তাঁর গায়ের মাংস, হাত দিয়ে ধরলেই যেন হাতটা তার মধ্যে ডুবে যেতো। সত্তরের ওপর বয়স হয়েছিল, কিন্তু বুকের স্তন দুটি তখনো পর্যন্ত এমন নধর যে দেখলেই আমার হাত দিতে ইচ্ছে করতো। মাথায় একমাথা কোঁকড়ানো পাকাচুলের রাশি, মুখের চামড়া সহস্রস্থানে কুঞ্চিত, হাসলে সেই কুঞ্চন আরো অসংখ্য গুণে বেড়ে যেতো। আমি তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'লেই আমাকে দেখে তিনি খুশি হ'য়ে এমন এক অপূর্ব হাসি হাসতেন,—যেন মুখের ওপর লাগানো ছিল একখানা আয়না, ভিতর থেকে হাসির ধাক্কা লেগে সেটা টুক্‌রো টুক্‌রো হ'যে ভেঙে গেল, স্বর্গের আলোকরশ্মি তার সহস্রখণ্ডে প্রতিফলিত হ'য়ে একসঙ্গে হেসে উঠলো, আর সেই সহস্র টুক্‌রো হাসিব ভিড়েব মধ্যে যেন নিতান্ত অপ্রতিভ হ'যে বেরিয়ে হাসতে লাগলো তাঁর একটিমাত্র ফোক্‌লা দাঁত। সে যে কী অপরূপ দৃশ্য! কুঞ্চিত চামড়ার অন্তরালে চোখ দুটি যেন ঢেকে যেতো, কিন্তু কী স্নেহের আহ্বান সেই চোখে! হাসতে হাসতে একবারটি আমাব দিকে চাইলেই আমার সমস্ত দুরন্তপনা ঘুচে যেতো, ছুটে গিয়ে আমি তাঁকে দুই হাতে জড়িয়ে ধবতুম। নিতেন আমার মাথাটি তাঁর বুকের মধ্যে জড়িযে, মুহূর্তে স্থির হ'য়ে যেতো আমার সেই অদম্য চঞ্চলতা। বৃদ্ধবয়সেব এমন আশ্চর্য সম্মোহনী শক্তি আর কারও দেখিনি,—দেখেছি কেবল এক রবীন্দ্রনাথের।

দিদিমাব মুখের কথাগুলি ছিল বড়ো মধুব। ভাষাটি তাঁর নিজস্ব, সেই নিতান্ত সেকালের মেয়েলি ভাষা, আজকাল কারো মুখে বড়ো একটা শোনা যায় না। তাঁর অদ্ভুত কথাগুলোর একটা ভাবার্থ ছিল নিশ্চয, কিন্তু সে ভাষা সাহিত্যেও চলেনা, অভিধানেও তার কোনো উল্লেখ নেই। সে ভাষা কাগজে লিখলে হয়তো খারাপ দেখায়, কিন্তু তাঁর মুখে শুনতে খুব মিষ্টি লাগতো।

তিনি আমাকে ব্রতপূজা করতে শেখাতেন। পুণ্যিপুকুর, গোকাল, দশপুতুল, এই সব নানারকমের ব্রত। ব্রতের নানারকম মন্ত্র আমার মুখ দিয়ে বলাতেন,—দশরথের মতো শ্বশুর হোক, রামের মতো স্বামী হোক, লক্ষ্মণের মতো দেওর হোক, গঙ্গার মতো শীতল হই, ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণু হই, আরো কত কী। সমস্তই আমি নির্বিবাদে বলে যেতুম, বলতে কৌতূহল হতো। দিদিমা খুব গল্প বলতে পারতেন। নিজের বাপেব বাড়ির এবং শ্বশুর বাড়ির কত গল্পই শোনাতেন। এ ছাড়া দিদিমা আমাকে শোনাতেন বামায়ণ মহাভারতের গল্প। শুনে শুনে আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল। কোন রাজার বংশে কে জন্মালো, তার থেকে আবার কে কে জন্মালো, তার থেকে কী কী বংশের সৃষ্টি হলো, সমস্ত ছিল আমার নখদর্পণে।

প্রত্যহ ভোবে উঠে গঙ্গাস্নানে যাওয়া ছিল তাঁব একটি নিত্যকর্ম। যখন সবেমাত্র ভোরেব আলো একটু দেখা দিচ্ছে, ময়লা ফেলার গাড়িগুলো চাকাব ঝঙ্কাবে গলিব রাস্তা মুখরিত কবতে কবতে চলেছে, পথে পথে ভিস্তিব জলসিঞ্চন সবে শুরু হচ্ছে, তখন তিনি গামছা কাঁধে একটি ঘটি হাতে চলতেন গঙ্গাস্নানে। এ অভ্যাস তাঁব মৃত্যুকাল পর্যন্ত ছিল। অসমর্থ তিনি কোনোদিনই হননি, মৃত্যুদিন পর্যন্ত সচল ছিলেন। বাড়ি থেকে গঙ্গার ঘাট অনেকটা পথ, অবলীলাক্রমে তিনি হেঁটে চলে যেতেন এবং স্নানেব পর ভিজে কাপড়ে এক ঘটি জল হাতে নিয়ে গঙ্গাস্তোত্র আর কৃষ্ণের শতনাম আওড়াতে আওড়াতে ফিবতেন। আমি জিজ্ঞাসা কবতুম,—জানকীমায়ী তুমি গঙ্গাস্নানে যাও কেন? বাড়িতে চান কবলেই পারো। তিনি বলতেন,—শুধু চান করা নয় রে, গঙ্গায় গেলে মনেব কালিমা ধুয়ে যায়। গায়ে যেমন ময়লা জন্মায়, মনেও তেমনি ময়লা জন্মায়। কথায় বলে মনের বাড়া পাপ নেই। গঙ্গায় একটা ডুব দিলেই সমস্ত মনটা ধুয়ে পরিষ্কাব হ'য়ে যায়। আমি বলতুম,—তুমি তো সাঁতার জানো না, যদি ডুবে যাও? তিনি বলতেন,—মা গঙ্গা কী এত শিগ্‌গির আমায় নেবেন? নিলে তো বাঁচি। তার এখনো

দেরী আছে, আরো অনেক ভোগ রয়েছে যে। তুই যে আমার আদরেব নাতনী, তোকে একজনের হাতে তুলে দিয়ে তবে আমি ছুটি পাবো।

দিদিমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতে আমারও খুব লোভ ছিল, কিন্তু কখন ঘুম থেকে উঠে তিনি চলে যেতেন, কিছুতেই আমার তখন ঘুম ভাঙতো না। একদিন বললুম,—জান্‌কীমায়ী তুমি যখন ভোরে উঠবে তখন আমাকেও ডেকে দিও। তারপর থেকে যখনই মামার বাড়ি গিয়ে থাকতুম তখনই তিনি গঙ্গাস্নানে যাবার সময় ডাকতেন, আমি তাঁর সঙ্গে যেতুম। সব দিন তিনি আমাকে স্নান করতে দিতেন না, ঘাটে বসিয়ে রেখে নিজে স্নান করতেন, ফিরে আসবার সময় উড়ে ঠাকুরের কাছে আমার কপালে চন্দনের ছাপ পরিয়ে দিতেন। ঐটি আমার ভারী ভালো লাগতো। পথের ধারের আয়নার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতুম, ছাপ প'রে আমার মুখখানি কেমন চমৎকার ঠাকুর-ঠাকুর মতন দেখাচ্ছে।

কিন্তু তাঁর আর বেশিদিন ভোগ ছিলনা, আমার বিয়ে হবার আগেই তিনি মারা গেলেন। তখন মামার বাড়িতেই আমি ছিলুম। সেদিন ভোরে উঠে আমাকে ডাকলেন, হাতমুখ ধুয়ে নিজের নিত্যকর্ম সারলেন, তারপর হঠাৎ হাত পা কেঁপে এক জায়গায় বসে পড়লেন। উঠতে চেষ্টা ক'রেও আর উঠতে পারলেন না। তখন আপন মনেই বললেন,—আমার মরণের আর দেরী কেন? এই তো অথর্ব হ'য়ে পড়ে গেলুম, এর পরে হয়তো পরের সেবা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। বলতে বলতে তিনি আবার কাঁপতে শুরু করলেন, উঠতে গিয়ে আবার পড়ে গেলেন। তখন আমাকে কাছে ডেকে বললেন,—ওরে এবার আমি যাচ্ছি। তোর মাকে একটু খবর দে, একবার তাকে দেখে যাই। ছুটে গিয়ে মাকে ডেকে আনলুম। মা আসতেই দিদিমা বললেন,—আমি চললুম, মেয়েটার বিয়ে দেখে যেতে পারলুম না, খুব সুন্দর একটি বর দেখে ওর বিয়ে দিস। মা জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমাকে গঙ্গাযাত্রা করাবো? তিনি বললেন,—ও সব কিছুই করতে হবেনা, এখানেই আমি গঙ্গা দেখতে

পাচ্ছি। কথা বলতে বলতে তিনি নিস্পন্দ হ'য়ে গেলেন। ইচ্ছামৃত্যু কাকে বলে জানিনা, শুনেছি কেবল মহাপুরুষদেরই ইচ্ছামৃত্যু ঘটে। কিন্তু এই যে আমার দিদিমার মৃত্যু আমি চোখের সুমুখে দেখলুম এমন সহজ সমাপ্তি আর কখনো দেখিনি। কোন রোগে ভোগা নয়, কষ্ট পাওয়া নয়, কাউকে কষ্ট দেওয়া নয়,—মানুষটা কথা বলতে বলতে থেমে গেল। মৃত্যুকে আমরা চিনিনা, তার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাদায়ক রূপটাই আমরা কল্পনা করি, কিন্তু তাঁর বেলায় দেখেছি সে সব কিছুই না। দিদিমার মৃত্যুর কথা যখনই মনে পড়ে তখনই বুঝতে পারি, সহজ মানুষের সমাপ্তিটাও কেন সহজ হয়। তিনি তাঁর জীবনে কোনো আবর্জনা জমতে দেননি। পৃথিবীতে কত গণ্ডগোল, কত জটিলতা, লোকের গায়ে কতই কাদা মাখামাখি। তাঁর গায়েও নিশ্চয়ই কত কাদা লেগেছে, কিন্তু কোন একটা অদ্ভুত উপায়ে সমস্তই তিনি ধুয়ে ফেলতেন, জমতে দিতেন না। হাঁসগুলোর গায়ে কাদা লাগলে যেমন তারা জলে ডুব দিয়ে সব ধুয়ে ফেলে, তেমনি ভাবেই তিনি ধুয়ে ফেলতে জানতেন। জীবনটা ছিল সহজ সরল আবর্জনাশূন্য, মৃত্যুটাও তাই অমন আড়ম্বরশূন্য।

এবার আবার বাবার কথা বলি। বাবার কাছে আমি অনেক জিনিস শিখেছি, সে কথা আগেই বলছিলুম। একটা জিনিস শিখেছি,—পরিচ্ছন্নতা, কিন্তু তাঁর তুলনায় সে কিছুই নয়। নোংরামি তিনি দুচক্ষে দেখতে পারতেন না, কণামাত্র ধূলোময়লা তাঁর ঘরের মধ্যে কোথাও জমতে পেতোনা, একটু কিছু দেখলেই নিজের হাতে পরিষ্কার ক'রে ফেলতেন।

আর একটা জিনিস তাঁর কাছ থেকে শিখেছি,—নির্ভীকতা। কোনো কিছুতেই তিনি যেমন ভয় করতেন না, আমাকেও তেমনি হ'তে শিখিয়েছিলেন। বলতেন, —ভয় করবি কেন? ভয় করে জন্তুজানোয়ারে, ভয় করে যত অসভ্য বর্বর মানুষে, যাদের কোনো বুদ্ধি নেই। বুদ্ধি থাকতেও যদি আমরা ভয় করি তাহ'লে আর এই বুদ্ধিটা থেকে লাভ কী? যখনই কিছুতে মনে ভয় আসবে, তখনই ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করবি, বুঝে নিতে পারলে আর কোনো ভয় থাকবে না।

বাবা ছিলেন খুব সঙ্গীতানুরাগী, কিন্তু অন্যান্য গানের চেয়ে মীরাবাঈএর ভজন গানই বেশি পছন্দ করতেন। তিনি নিজে তেমন সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু চমৎকার এস্‌রাজ বাজাতে পারতেন। এস্‌রাজের সঙ্গে যখন মাঝে মাঝে মীরার ভজন গাইতেন তখন গলাটা প্রায়ই একটু বেসুরো হ'য়ে যেতো, কিন্তু এস্‌রাজের মীড়ের সঙ্গে মিশে সে এমন একরকম মিষ্টিমিষ্টি শোনাতো যে মনে হতো যেন বাবার অন্তরের মধ্যে একটা শিশু লুকিয়ে আছে, ঐ বেসুরের ফাঁক দিয়ে সে স্পষ্ট ধরা পড়ে যাচ্ছে। গাইতে গাইতে তিনি যখন অনেকখানি খুশি হ'য়ে উঠতেন, আমাকে তখন বলতেন তাঁর সঙ্গে গাইতে। তাঁর সঙ্গে গেয়ে গেয়ে অনেকগুলো ভজন আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে গান থামিয়ে ভজনেব প্রত্যেক লাইনগুলোর মানে আমাকে বুঝিয়ে দিতেন। একটি ভজন তাঁর খুব প্রিয় ছিল, সেটি বারেবারেই গাইতেন—

সাধন করনা চাহিবে মনুয়া ভজন করনা চাই
হরিসে প্রেম মিলানা চাই।
তুলসী পূজকে হরি মিলে তো ময় পূজে জঙ্গল ঝাড়
পাথর পূজকে হরি মিলে তো ময় পূজে পাহাড়।
দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুত বৎসা বালা
মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

এটা গাইতে গাইতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ব্যাখ্যা শুরু করতেন,—কিছু বুঝলি পাগলী? পূরো দামটি না দিলে আসল জিনিস কিছুতেই মেলেনা। তুলসীগাছেই জল ঢালো আব পাথর পূজোই করো, ও সব ভড়ং করলে কিছু হবে না। তোমার ভেতরের সেই খাঁটি প্রেমটিকে আগে বের করো, বিনা প্রেমে আর কোনো কিছু দিয়েই নন্দলালাকে পাবে না! মীরাবাঈ এই কথাটাই বারেবারে বলেছে।

বাবা যে কাকে বলচেন প্রেম, সেটা আমি খানিক বুঝতে পারতুম, তাঁর তখনকার মুখচোখের ভাব দেখে। কিন্তু এও শুনেছি জান্‌কীমায়ীর কাছে যে মানুষকে খুব ভালোবাসতে হয়, তাকেই বলে প্রেম। দুটোর মধ্যে আমি গুলিয়ে ফেলতুম। দুটোই কি একই রকমের জিনিস?

এমনি বাইরের থেকে দেখতে বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী, কেউ কোনো কথা বলতে সহজে সাহস করতো না। কিন্তু কারো কথাতেই তিনি রাগ করতেন না, সাহস ক'রে কোনো প্রশ্ন করলে ঠিক তার জবাবটি দিতেন। এটুকু আমি জানতুম। একদিন ঐ গানটা গাইতে গাইতে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম—

—প্রেম কথাটার মানে কী বাবা?

—জানিস নে বুঝি? প্রেম মানে ভালোবাসা। সেটা কাকে বলে জানিস তো?

—হাঁ, তা জানি।

—বল দেখি কাকে তুই ভালোবাসিস?

—তোমাকে,—আর জান্‌কীমায়ীকে,—আর, আর,—আর কাউকে না।

—আর তোর মাকে?

—হাঁ, মাকেও বাসি, তবে একটু একটু, খুব বেশি নয়।

—আর তোকে কে কে ভালোবাসে?

—এই তুমি,—আর জান্‌কীমায়ী।

—বাঃ, তবে তো অনেকটা শিখে গেছিস প্রেম কাকে বলে। তুই আমাদের যতটা ভালোবাসিস, তার চেয়েও অনেক বেশি যে ভালোবাসা, তাকেই বলে প্রেম। মীরাবাঈ তার নন্দলালার জন্যে তেমনি প্রেমের কথা বলেছে।

—মানুষের জন্যে বুঝি তেমন প্রেম হয় না?

—হ'তে পারে, কিন্তু প্রায়ই হয় না। মানুষের মধ্যে অনেক দোষ থাকে কি না।

—কৈ তোমার কোনো দোষ নেই তো! জানকীমায়ীরও কিছু দোষ নেই।

—আছে বৈকি, তুই দেখতে পাস্ না। তুই খুব ভালোবাসিস কিনা, তাই খুঁজলেও কোনো দোষ দেখতে পাবি না।

—কেন, দোষটা বুঝি আমাব চোখে ঢাকা পড়ে গেছে?

—হঁা, ঠিক বলেছিস।

এমনি ভাবে কত জিনিস শিখেছি বাবার কাছে।

আরো একটা মস্ত বাই ছিল বাবার,—জ্যোতিষচর্চা। আমি এটাকে বাই বলছি, কিন্তু তিনি খুব বিশ্বাস কবতেন। অবসর পেলেই জ্যোতিষেব বড়ো বড়ো পুঁথিপত্র নিযে বসে যেতেন, ঘণ্টাব পব ঘণ্টা তাই নিয়ে আলোচনা কবতেন, কোষ্ঠী তৈরী করতেন, তাব ফলাফল বিচাব কবতেন। এই নিয়ে যদি কেউ তাঁর সঙ্গে তর্ক কবতে যেতো, এক কথায তাকে থামিয়ে দিতেন। বলতেন,—বাপু এখানে কোনো তর্ক নেই। পৃথিবী একটা কোনো বিশেষ নিয়মে ঘুরছে তো? তাব সঙ্গে তাল রেখে সকলকেই চলতে হচ্ছে। সে নিযমটা অঙ্কশাস্ত্রে ধবা যায়, আঁক কষলেই বেরিযে পড়বে তোমার কখন কী ঘটেছিল, আব তাব পরে কী ঘটবে। এটা বুজরুকি নয, এতে আব অবিশ্বাসের কী আছে? সব কিছুতে অবিশ্বাস কবাটাই যে খুব বাহাদুরি তা মনে কোরোনা।

আমারও একটা কোষ্ঠী তিনি তৈরী করেছিলেন। সে এক প্রকাণ্ড কাগজের বাণ্ডিল। প্রত্যেক মাসে মাসে আমার কোন দশা এবং কোন প্রত্যন্তরদশা চলবে, আর তার ফলে কী কী লাভ লোকসান হবে সমস্তই তাতে লেখা ছিল। আমার বিয়ের সময় সেই কোষ্ঠীপত্র বের করা হয়েছিল, অনেক দেখেশুনে কোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিয়ে মনোমত পাত্র খুঁজে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন। আমার মনে আছে তিনি একদিন হাসতে হাসতে মাকে বলেছিলেন—তোমার

মেয়ের একটি বিয়ে নয়, ওর কোষ্ঠীতে দুই বিবাহের যোগ আছে। মা গম্ভীর হ'য়ে ভুরু কুঁচকে বললেন,—আরো কী কী অদ্ভুত যোগ আছে শুনি, যা তোমার চমৎকার মেয়ে। বাবাও তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। বললেন,—তোমার চেয়ে ওর কোষ্ঠী অনেক ভালো। মীরা নাম ওর কেন রেখেছি তা জানো? তার সঙ্গে ওর কোষ্ঠীর অনেক মিল আছে। মীরার মতো নিজের ধর্ম ও নিজেই বেছে নেবে, সে ধর্ম থেকে কেউ ওকে ছাড়াতে পারবে না।

কোষ্ঠীটা কোথায় হারিয়ে গেছে। অনেক খুঁজেছিলুম কিন্তু পাইনি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাবার খুব সৌহার্দ্য ছিল। সে হয়তো কতকটা প্রতিবেশী হিসাবে, কতকটা সমসামাজিক বন্ধু হিসাবে, আমি ঠিক জানিনা। কিন্তু তিনি প্রায়ই খবর নিতেন, রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় এসেছেন শুনলেই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়ে দেখা করতেন।

আমি যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি তখন তাঁর চুল পেকেছে কিন্তু বার্ধক্য আসেনি। তখন তিনি সাদা পোষাকের ওপর কালো ফিতায় ঝোলানো পাঁস্‌নে চশমা পরেন, মাথায় মাঝে মাঝে তুর্কী টুপি পরেন, সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে আসতে পারেন, ষ্টেজে দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে পারেন, বাউল সেজে রীতিমত নাচতে পারেন, গান গাইতেও পারেন।

যখন কতকটা বয়স হলো তখন নিজেই আমি আগ্রহ ক'রে সেখানে যেতে চাইতুম। দেখতে যেতুম তাঁর ফাল্গুনীর অভিনয়, ডাকঘরের অভিনয়, তাঁর বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব। প্রথম প্রথম তাঁর গানগুলো কেমন অদ্ভুত শোনাতো। ক্রমে ক্রমে কিন্তু এমন নেশা লেগে গেল যে তাঁর গানের সুরটা শুনলেই আমি চিনতে পারতুম, মনটা আনন্দে ডগমগ ক'রে উঠতো। অনেক মেয়েদের সঙ্গে মিলে আমিও তাঁর মুখ থেকে কিছু কিছু গান শিখে নিয়েছি। আজকাল ওঁর গানের সুর রেডিও মারফত, ঘরে ঘরে, কণ্ঠে কণ্ঠে মুখরিত হচ্ছে, কিন্তু তখন ওঁর খাঁটি সুরগুলো শেখাই ছিল দুর্লভ। শুধু সেইজন্যে নয়, সব চেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিলেন তিনি নিজেই। তাঁকে দেখলেই

মনটা আমার আপনা থেকে ভরে উঠতো। বেশিদিন না দেখতে পেলে মন কেমন করতো।

তিনিও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। কিন্তু তার মধ্যে যে একটু বিশেষত্ব ছিল সেটুকুর কথা কেমন ক'রে বলি? আমাদের দেখলে তাঁর মুখে এক রকমের হাসি ফুটে উঠতো, যাকে বলে স্মিতহাসি। তেমনি আমার প্রতি তাঁর যেটুকু স্নেহ দেখেছি, তাকে বলা যেতে পারে স্মিতস্নেহ। সে অতি সূক্ষ্মবস্তু, একটুতেই মনে হতো যেন অনেকখানি।

আমি যখন যেতুম, গিয়ে দেখতুম হয়তো কোনো লেখায় ব্যস্ত আছেন, কিংবা কারো সঙ্গে আলাপ করচেন। সংকোচের সঙ্গে আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতুম, কিংবা অনেকটা দূরে এক কোণে বসে পড়তুম। আমার দিকে চোখ পডবামাত্রই আর কোনো কথা নেই, তৎক্ষণাৎ বলতেন—এই যে, তুমি! রাজকন্যে! এসো এসো, এইখানে কাছে এসে বসো। আমার জন্যে কী এনেছো বলো? আমাকে তিনি বরাবর রাজকন্যে ব'লে ডাকতেন, বাবার কাছে শুনেছিলেন আমার সেই হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস।

যখন তিনি রহস্য ক'রে কথা বলতেন তখন এক রকম, কিন্তু যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন তখন একেবারে অন্য বকম। চোখের দৃষ্টি নমিত ক'রে যেন কোন সমাহিত মর্মলোক থেকে ধীর মৃদুস্বরে একটি একটি কথা উচ্চারণ করতেন। সমস্ত অঙ্গ আচ্ছাদনে ঢাকা, কেবল পায়ের পাতা দুটি বেরিয়ে আছে, অলসভাবে পায়ের আঙুলগুলি একটু একটু নড়ছে। আমি তখন চেয়ে চেয়ে দেখতুম সেই পা দুটির গঠন,—যেন মোম দিয়ে গডা, যেন একটু ফুলো ফুলো। ভাবতুম, ওখানে কোনো ব্যথা নেইতো?

সকল কথা ওঁর বুঝতে পারতুম না। শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হ'য়ে যেতুম, মাঝে মাঝে ঘুম পেয়ে যেতো। যখন কোনো একটা লম্বা বই পড়ে শোনাতেন দু'তিন ঘণ্টা, তখন বসে বসে কেবল ঢুলতুম। অতক্ষণ চুপ ক'রে বসে শোনবার মতো ধৈর্য আমার ছিল না। কিন্তু কখনো কখনো

এমন কথা কানে এসে পৌঁছতো যে আমি চমকে জেগে উঠতুম, সে কথা আমার মনের মধ্যে গাঁথা হ'য়ে যেতো। একটা দিনের কথা এখনো আমার মনে আছে, কাকে যেন বলছিলেন—"আমার কাছে এটা জানতে চেয়ো না, তোমার নিজের মনকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ। তোমার ন্যায়-অন্যায় তোমার নিজের কাছে, সেখানে তুমি ছাড়া আর কেউ বিচারক নেই।"

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার খবর কিছু কিছু রাখতে শিখেছিলুম। বাবা আমাকে ইংরেজী পড়তে শিখিয়েছিলেন, আমাকে দিয়ে ইংরেজী অমৃতবাজার কাগজ পড়াতেন, তিনি তামাক খেতে খেতে শুনতেন। যে কথাটা উচ্চারণ করতে না পারতুম, সেটা বানান করতুম, বাবা তার শুদ্ধ উচ্চারণটা বলে দিতেন, তার অর্থটা বলে দিতেন। তিনি বলতেন ইংরেজী শেখার সব চেয়ে ভালো উপায় বাঙালীর লেখা খবরের কাগজ পড়া। ওরা ইংরেজীতে লেখে আমাদেরই নিজের কথা, সেটা পড়লেই চট্ ক'রে বোঝা যায়, সঙ্গে সঙ্গে ভাষাটাও শেখা হ'য়ে যায়। সাহেবদের মনের কথা আমরা বুঝিনা, তাদের লেখা থেকে ভাষা শিখতে তাই দেরী হ'য়ে যায়।

মা আমার লেখাপড়া শেখার একটু বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, —মেয়েকে এত লেখাপড়া শিখিয়ে কী হবে, মেয়ে কী তোমার চাকরি করতে যাবে? কোথায় কাদের ঘরে গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই, তারা বলবে মেয়েকে বিবি ক'রে পাঠিয়েছে। তার চেয়ে ঘরকরণা করতে শিখুক, যা কাজে লাগবে।

বাবা বলতেন,—তুমি শেখাও না সেগুলো, আমি কী বারণ করছি?

কিন্তু মা আমাকে কিছুই শেখাতে পারতেন না, আমার সঙ্গে মোটে এঁটে উঠতে পারতেন না। ভয় দেখিয়ে আমার বশ্যতা আদায় করা যেতো না।

বাবার শিক্ষায়, দিদিমায়ের স্নেহে, রবীন্দ্রনাথের আবহাওয়াতে আমি বাপের বাড়ি মানুষ হয়েছিলুম। কিন্তু আমার নিজস্ব স্বভাব যাবে কোথায়? আমার চরিত্রের মধ্যে দুটো দিক ছিল, একদিকে ছিল দুষ্টুমি, আর একদিকে

ছিল বশ্যতা। যে আমাকে কোনো কিছুর দ্বারা মুগ্ধ করতে পারলে না তার কাছে আমি দুষ্টু। তার কোনো প্রাধান্যই আমি স্বীকার করবো না, তার ভালো কথাও আমি মানবো না, কারণ সর্বদাই সে আমার সমালোচ্য। কিন্তু যে আমাকে মুগ্ধ করতে পেরেছে তার কাছে আমি অতি বাধ্য। সে ভালো কথা বললেও আমি শুনবো, মন্দ কথা বললেও শুনবো, কোনো দোষগুণ তার বিচার করবো না। এই সমস্ত দেখেশুনে দিদিমা মাঝে মাঝে রাগ করতেন, বলতেন—এমন একগুঁয়ে জেদী একবগ্‌গা মেয়ে কখনো দেখিনি বাপু। আমি বলতুম,—তবে তুমি আমায় অমন আদর করো কেন? তিনি বলতেন,—আমার কাছে তুই যে লক্ষ্মী হ'য়ে থাকিস। তোর মায়ের কাছে অমন থাকিস না কেন? তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারিস কেন?

কী করবো, আমার ঐ স্বভাব ছিল।

অমরনাথের কথা

শাহাবাদের পরে গোবিন্দপুর, গোবিন্দপুরের পরে হুগলি, হুগলির পরে এবার কলকাতা। এবারেও সঙ্গে আছে ছট্টু সর্দার। মিশনরী কলেজে ভর্তি হলাম, উঠলাম কলেজের হস্টেলে।

পাড়াগাঁর ছেলে, কলকাতার শহরে নতুন এসেছি, এখানকার ছেলেদের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সহজে কারো সঙ্গে মিশতে পারিনা। সকলের মধ্যেই দেখি একটু বিদ্রূপ, একটু যেন তাচ্ছিল্য। এই সময়ে প্রথম আমার বন্ধুত্ব হোলো যোগেনের সঙ্গে। ছেলেটি বড়ো অমায়িক, সাজপোষাকে যেমন নব্য, আচার-ব্যবহারে তেমনি সভ্য। অবসরপ্রাপ্ত হাকিমের ছেলে, এবং আমার চেয়ে উঁচুদরের লোক বলতে হবে। কিন্তু যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করলে, সে আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হোলো। কলেজের কাছেই তাদের বাড়ি, যোগেন প্রত্যহ টিফিনের সময় আমাকে তাদের বাড়িতে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করলে। যোগেনের ভাই সুরেন, স্কুলে পড়ে, খুব সপ্রতিভ ছেলে, সেও দাদার সঙ্গে যোগ দিলে,—আমাকে অমরদা বলে ডাকতে শুরু করলে।

যোগেনের মা অত্যন্ত স্নেহময়ী। আমাকে জলখাবার খাওয়াবার জন্যে তাঁর মহা আগ্রহ। টিফিনের সময় প্রত্যহ প্লেট ভরে ল্যাংড়া আম কেটে খাওয়াতেন। ভীমনাগের দোকান থেকে বড়ো বড়ো সন্দেশ আনিয়ে রাখতেন, আমার জন্যে দুটো, যোগেনের জন্যে দুটো। আমাকে কিছু পেটুক প্রকৃতির দেখে বরাদ্দ বাড়িয়ে দিলেন,—আমার জন্যে চারটে, যোগেনের জন্যে দুটো। কৃত্রিম অভিমানে যোগেন তাঁর পক্ষপাতিত্বের সম্বন্ধে দোষারোপ করলে তিনি বলতেন,—যার যেমন চেহারা তার তেমনি খোরাক হবে তো? তুই ঐ খেয়েই হজম কর দেখি। আগে ওর মতন চেহারা কর, তবে ওর মতন পাবি।

কলেজের প্রফেসরদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো আমার গোবেচারা গোছের ভাব দেখে কিংবা চেহারার মধ্যেই কিছু বিশিষ্টতা দেখে আমার সম্বন্ধে কৌতূহলী হচ্ছিলেন, আমার পড়াশোনার উন্নতির জন্যে যত্ন নিচ্ছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন মনোরঞ্জন বাবু, আমাদের অঙ্কের প্রফেসর। ঐ বিষয়টায় আমি বরাবরই কাঁচা, ওর সহজ রাস্তাটা কোথায় দেখিয়ে দিলেও আমার মাথায় ঢোকেনা। কিন্তু তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। আমার বাবাকেও তিনি চিঠি লিখেছিলেন এই সম্বন্ধে। বাবা তাঁকে আমার টিউটর নিযুক্ত করলেন। তিনি হষ্টেলে এসে আমাকে পড়িয়ে যেতেন।

যোগেনের বাবা ছিলেন ডিস্‌পেপটিক। চুলও পাকেনি, দাঁতও পড়েনি, কিন্তু ঈজিপসিয়ান মামীর মতো সিঁটিয়ে যাওয়া শুষ্কমূর্তি। পেট সম্বন্ধে সর্বদাই সন্ত্রস্ত, যদি কিছু খেলে পেটের অসুখ হয়, তাহ'লেই তিনি মারা পড়বেন। পায়ে সাদা মোজা এবং গায়ে মোটা চাদর ঢাকা দিয়ে, হাতে মোটা একগাছি বেতের লাঠি নিয়ে মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে আকাশের দিকে মুখ তুলে যেন নিতান্ত উদাসীর মতো অতি ধীর পদক্ষেপে তিনি পথ চলেন, সিকি মাইল পথ চলতে তাঁর সওয়া ঘণ্টা সময় লেগে যায়। অথচ পথ চলতে হবে দুবেলাই, নতুবা যা খেয়েছেন তা হজম হবে না। আগে আগে তিনি যাবেন, পিছনে থাকবে তাঁর চাকরটি, তার হাতে থাকবে একটি চটের থলি। বেড়াতে বেড়াতে তিনি ঢুকবেন বাজারের মধ্যে, খুঁজে খুঁজে কিনবেন পলতা পাতা, হিঞ্চে শাক, কচি ডুমুর, কাঁচা পেঁপে, কাগজি লেবু। অল্প এক চামচ পোরের ভাত এবং তার সঙ্গে এইগুলি খেয়ে তিনি কোনমতে প্রাণধারণ করবেন।

কেউ অনেকটা পরিমাণে খেতে পারে দেখলে তাঁর মহা আনন্দ। আমি খাচ্ছি দেখলেই তিনি খুশি হতেন, কাছে বসে বলতে শুরু করতেন তাঁর যৌবন-কালের হজমশক্তির আশ্চর্য আশ্চর্য কাহিনী। প্রায়ই বলতেন,—পল্লীগ্রামের ছেলেরা যেমন সুচারুভাবে খেতে পারে কলকাতার ছেলেরা তা পারবে কেন? দেখছো না যোগীন্দ্রের খাওয়া, কলের জল খেয়েই তিনবার ঢেকুর তুলবে। তা দেখ বাবা

অমরনাথ, আমি বরং একটা কথা বলি। তুমি বরং আমাদের এখানেই থাকোনা কেন? হষ্টেলের খাবারে মারাত্মক ভেজাল থাকে, কোন দিন পেটের অসুখ করে বসবে, শরীরটা নষ্ট হ'য়ে যাবে। আমি বরং তোমার বাবাকে লিখে দিই?

আমি বলতাম—থাক থাক, এই তো এখানে রোজই কত খেয়ে যাচ্ছি।

পড়াশোনা একরকম ভালই চলছিল, হয়তো পাশও করতাম। কিন্তু সেকেণ্ড ইয়ারে ওঠবার কিছুকাল পরেই ছাত্রমহলে দেখা দিল এক দারুণ উত্তেজনা। তখন ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন মহাত্মা গান্ধী। তিনি বললেন রাউলট আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করতে হবে, বর্তমান শাসননীতির বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চালাতে হবে। আমরা প্রথমটায় এ সকল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতাম না। আমাদের চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ও এর বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দমননীতি যত প্রকট হ'যে উঠলো ততই দেশের লোকেরা বলতে লাগলো যে অসহযোগীতাই ওর উৎকৃষ্ট জবাব। সবাই এবার কাউন্সিল ত্যাগ করো, আদালতে যাওয়া পরিত্যাগ করো, ওদের স্কুল কলেজে পড়াও পরিত্যাগ করো। দেখিয়ে দিতে হবে যে ওদের শাসন পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের কোনো সহযোগীতা নেই, ওদের কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপরেই আমাদের আস্থা নেই।

এই হুজুগে অনেকে কলেজে পড়া ছেড়ে দিলে। আমিও ছিলাম তাদেরই দলে। দেশের নেতারা বললেন, পড়াশোনা ক'রে আর কি হবে, তার চেয়ে পল্লীগ্রামে গিয়ে চাষবাস করো, স্বদেশী জিনিসের ব্যবসা করো, তাতে পেটও ভরবে এবং দেশেরও উন্নতি হবে। আমি ভেবে দেখলাম, এই ঠিক কথা।

যোগেনও ঐরকমই ভাবতে শুরু করেছিল। কিন্তু তার বাবা বললেন,—না বাবা, আমার ছেলের পক্ষে ওটি চলবে না। আমি সরকার থেকে মাস গেলে মোটা পেন্সন পাই, যেমনি ওরা দেখবে যে আমার ছেলে কলেজ ছেড়ে স্বদেশী করছে অমনি পেন্সনটি আমার মারা যাবে। তার চেয়ে আমি বলি, অমরনাথ বরং ব্যবসা করো, যোগীন্দ্র বরং কলেজেই যাক।

আমার বাবা চিঠি লিখলেন মনোরঞ্জন বাবুর কাছে,—এ সব কি কথা শুনছি? আসল ব্যাপারটা কি? মনোরঞ্জন বাবু লিখলেন,—এ ভালোই হয়েছে। অমরনাথকে ব্যবসা করতে দিন, ওর যখন ইচ্ছা হয়েছে। লেখাপড়ার দিকে ওর আগ্রহ কম, আপনার মতো বিদ্বান হওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যবসা করাই ওকে শিখতে দিন, আমিও দুদিন বাদে চাকরি ছেড়ে ওর সঙ্গে যোগ দেবো, পরের দাসত্ব আমার আর পোষায় না। কিন্তু ও ছেলেমানুষ, সব নষ্ট ক'রে ফেলতে পারে, উপস্থিত আমার ভাইকে ওর সঙ্গে লাগিয়ে দিতে পারি, যদি অনুমতি দেন।

অঙ্কের দ্বারা অকাট্যভাবে মনোরঞ্জন বাবু দেখিয়ে দিলেন যে স্বদেশী কাপড় আর স্বদেশী চিনির ব্যবসাতে অনেক লাভ আছে, যদি মোটা মূলধন থাকে।

বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার আগ্রহাতিশয্য দেখে তিনি প্রথম মূলধনস্বরূপ দিয়ে দিলেন পাঁচ হাজার টাকা। টাকাকড়ি সম্বন্ধে হুঁশিয়ারি করবার জন্যে ছট্টু সর্দারকে রাখলেন আমার সঙ্গে।

স্বদেশী কাপড় এবং স্বদেশী চিনির ব্যবসা খুলে বসলাম কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে। আমিও কিছুই জানিনা, মনোরঞ্জন বাবুর ভাইও কিছু জানেনা। মনোরঞ্জন বাবু নিজেই এসে মাঝে মাঝে সমস্ত দেখাশোনা করেন। আমরা কেবল বসে বসে কর্মচারীদের ওপর কর্তৃত্ব করি। মন্দ লাগে না ব্যাপারটা, পড়া মুখস্থও করতে হয় না, অঙ্কও কষতে হয় না, অথচ টাকা লাভ হচ্ছে।

ক্রমে ক্রমে দেখলাম যাকে বলছি স্বদেশী জিনিস তা প্রকৃত স্বদেশী নয়। বিলিতি সুতোয় কাপড় বোনা হয়, তাকেই বলি স্বদেশী কাপড়। জাভা থেকে আসে মোটা চিনি, তাকে কলে পিষে বলা হয় স্বদেশী চিনি। লোকে অতি ভক্তি সহকারে কেনে এবং স্বদেশপ্রীতির গর্ব অনুভব করে।

কিছুকাল এমনিভাবে ব্যবসাটা চলল ভালো। সকলেই মনে করলে বেশ লাভ হচ্ছে, কিন্তু পরে দেখা গেল যে তা নয়, লোকসান হচ্ছে। আয়ের চেয়ে ব্যয়ের ভাগটা যেন বেশি। ব্যয়সংক্ষেপ করবার চেষ্টা হ'তে লাগলো।

যোগেনের বাবা বললেন,—কলকাতায় বাসা ভাড়া ক'রে থাকতে অনেক খরচ হ'য়ে যাচ্ছে, ঐটা বরং আগে বন্ধ করো। ওতে তোমার শরীরের কিছুই উপকার হচ্ছে না। চাকরবাকরের হাতে খাওয়া, কোনদিন কি খেতে দেয় তাব ঠিক নেই, পেটের একটা রোগ দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তোমরা বরং আমাব বাড়িতে এসে থাকো।

বাসা অবশ্য বজায় রইল, তবে খরচ অনেক কমিয়ে ফেললাম। তাতেও দেখি লোকসান হচ্ছে। বাজারে খাঁটি স্বদেশী-চিনির প্রাদুর্ভাব হোলো, নকল স্বদেশী-চিনির কদর রইল না। কিন্তু স্বদেশী কাপড়েব ব্যবসাযে কেন যে লোকসান হ'তে লাগলো আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনোরঞ্জন বাবু কাগজে কলমে কষে দেখিয়ে দিলেন, তবুও বুঝতে পারলাম না। শুনলাম কেবল, লাভের পরিবর্তে আমাদেব অনেক দেনা হ'য়ে গেছে।

আমি না বুঝতে পারলেও বাবা সেখান থেকে সব বুঝতে পারলেন। তিনি মনোরঞ্জন বাবুকে লিখে পাঠালেন যে স্বদেশীর ব্যবসায় আর প্রয়োজন নেই, দোকানপাটে যা কিছু আছে সমস্ত বেচে বাজারেব দেনাগুলো মিটিযে ফেলা হোক।

তখন থেকে কিছুকাল কাটলো অত্যন্ত গণ্ডগোলের মধ্যে। অতঃপর কি করা যাবে কিছুই ভেবে পাইনা। ব্যবসাব ব্যাপাবটা তো মিটেই গেল। আবার পড়াশোনা? সেই কেঁচে গণ্ডুষ করা আর পোষাবে না, বিশেষত অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে আমার মারাত্মক ভয়টা তখনো ঘোচেনি। চাকরি? অনেক খুঁজলাম, কিন্তু একটাও মিললো না। তবে আমি কি করি?

অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম, ডাক্তারি শেখাই আমাব পক্ষে ভালো। কিন্তু এদেশে নয়, বিলেতে গিয়ে শিখে আসাই ভালো। ছেলেবেলাকার উচ্চাভিলাষটা আমার মনের মধ্যে ক্রিয়া করছিল।

তখন চলল আমার বিলেত যাবার প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যে এডিনবরাতে চিঠিপত্র লেখালেখি ক'রে খানিকটা তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। সেখানে

ছ'মাস পড়ে একটা প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারলেই তারা ডাক্তারি শিক্ষায় ভর্তি ক'রে নেবে। এদিকে বয়স বেড়ে যাচ্ছে. সুতরাং বিলম্ব না করে চিঠিটা আমি বাবাকে দেখালাম। এখানকার কলেজে ভর্তি হ'তে হ'লে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করতে হবে, কিন্তু সেখানে তার কিছু প্রয়োজন নেই।

আমাকে নিয়ে বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। ভবিষ্যতের প্রত্যাশা কোনোদিকেই কিছুমাত্র নেই, অথচ আমার শিক্ষার জন্যে এবং রোগের জন্যে অনবরত তাঁকে ব্যয় করেই যেতে হচ্ছে। আরো অনেক অর্থব্যয় করতে হবে এটা তিনি বুঝেই নিয়েছিলেন আর তার জন্যে যেন প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন। আমার কথায় কোনো দ্বিরুক্তি করলেন না। বললেন,—যা ভালো বোঝো তাই করো। খরচ যা লাগবে তা দিতেই হবে।

উৎসাহের সঙ্গে আমি বিলেতযাত্রার আযোজন করতে লাগলাম। এডিনবরাতে দরখাস্ত পাঠালাম, কোন জাহাজে যাওয়া হবে এবং কত ভাড়া লাগবে সমস্তই ঠিক হ'য়ে গেল, পুলিশে ঘোরাঘুরি ক'রে পাসপোর্ট নেওয়া হোলো। যোগেন তখন বিএ ক্লাসে পড়ছে, কিছুদিন পরেই তার পরীক্ষা। কিন্তু আমার দেখাদেখি সেও ধরে বসলো, আমার সঙ্গে সেও যাবে ব্যারিস্টারি পড়তে। তার বাবা তাকে অনেক কষ্টে নিবৃত্ত করলেন। তিনি ওকে বুঝিয়ে দিলেন,—তুমি যাবেই তো একদিন, কিন্তু এখন কেন? আগে আইন পরীক্ষাটা এখান থেকে পাস ক'রে নাও, তাতে অনেক সুবিধা হবে। অমরনাথ বরং এখন যাক, তুমি বরং পরে যেও।

আমার যাবার সমস্তই ঠিকঠাক, এমন সময় ঠাকুমা বাদ সাধলেন। তিনি বললেন,—বিলেত যাওয়া ওর কিছুতেই হবে না। এখানেই ও অনেক পয়সা নষ্ট করেছে, সেখানে গিয়ে আরো নষ্ট করবে। আমার ছেলের অনেক কষ্টের রোজগার আমি এমনভাবে নষ্ট হ'তে দিতে পারি না। ও যা শেখবার এখানেই শিখুক, বিলেত-টিলেত যাওয়া হবে না।

ঠাকুরদাদা বললেন,—সেই ভালো, তুই এখানকার কলেজেই ভর্তি হ'য়ে পড়। আমি কথা দিচ্ছি, এখান থেকে পাস করবার পরেই আমি নিজে তোকে বিলেত পাঠিয়ে দেবো, অল্পদিনের মধ্যেই একটা ডিগ্রি নিয়ে চলে আসবি।

আমি বললাম,—ইণ্টারমিডিয়েট পড়া আমার দ্বারা হবেনা।

ঠাকুরদাদা বললেন,—তা কেন পড়তে হবে? এমনিই ভর্তি হ'য়ে যাবি, তার জন্যে সুপারিশের যা কিছু ব্যবস্থা আমি করছি।

আমি ভাবলাম, কথাটা নিতান্ত বাজে। ম্রিয়মাণ হ'য়ে চুপ করে থাকলাম। কাকা বললেন,—বাবা বুঝি যেতে দিলে না তোকে? ভালোই করেছে। যাওয়ার চেয়ে না-যাওয়া আরো ভালো। গেলেই তো ফুরিয়ে যেতো, যখন দেখতিস যে সেখানেও চাষারা জমিতে চাষ করে, সেখানেও মানুষের মধ্যে গরিব-বড়লোক থাকে। আর না গেলে চিরকালই মনে করবি বিলেত দেশটা না জানি কত সুন্দর। স্বর্গ আমরা কখনো দেখিনা তাই বলি খুব ভালো, দেখলে কি আর বলতাম?

কিন্তু ঠাকুরদাদার কথা মিথ্যা নয়, সুপারিশের জোরে সবই সম্ভব। তাঁর কে একজন আত্মীয় ছিলেন লাটসাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারির খাস কেরানি। তাঁকে দিয়ে সুপারিশ করে প্রাইভেট সেক্রেটারিকে দিয়ে চিঠি লেখালেন কলেজের অধ্যক্ষকে। তৎক্ষণাৎ আমি ভর্তি হ'য়ে গেলাম। তখনকার দিনে সুপারিশ থাকলে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেও ডাক্তারি কলেজে ঢুকতে পারা সম্ভব ছিল।

আমি যখন ডাক্তারি পড়চি, যোগেন তখন আইন পড়চে।

ডাক্তারি পড়তে পড়তে আরো এক কাণ্ড ঘটলো। আমার হঠাৎ বিয়ে হোলো।

ঠাকুরদাদাই চুপি চুপি মার সঙ্গে পরামর্শ করে এর ব্যবস্থা করেছিলেন। যে আত্মীয়টি আমাকে কলেজে ভর্তি করিয়েছিলেন তাঁরই দাদার মেয়ে।

ঠাকুরদাদা মাকে বুঝিয়েছিলেন,—এই বেলা সময় থাকতে থাকতে ছেলের একটা বিয়ে দিয়ে ওর মনটাকে বেঁধে ফেলা উচিত, নইলে ওর উড়ুউড়ু মন

কিছুতেই ঘরে থাকবেনা। হয়তো কখন পালিয়ে বিলেত চলে যাবে, সেখানে গিয়ে একটা কাণ্ড করবে। মা বলেছিলেন,—খুব সুন্দরী মেয়ে না পেলে আমি ছেলের বিয়ে দেবো না। ঠাকুরদাদা বলেছিলেন,—অমুক বাবুর মেয়ে, সে একেবারে ডাকসাইটে সুন্দরী। আমার কথায় বিশ্বাস না করো, তুমি স্বচক্ষে দেখে এসো।

সত্যই সুন্দরী। সবাই বললে, খুব সুন্দর, এমন বৌ কেউ কখনো চক্ষে দেখেনি। আমিও দেখলাম, খুব সুন্দর, এমন বৌ কখনো কারো ভাগ্যে জোটেনি। নামটিও চমৎকার,—চম্পাবানী। নামের সঙ্গে গায়ের রং যেন একেবারে মিলে যায়। আমি আদর করে আরো একটু নতুনত্ব জুড়ে দিয়ে বলতাম,—চম্পকী। নানা জায়গা থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ চাঁপাফুল সংগ্রহ করে রেখে দিতাম ওর বিছানার কাছে।

বৌ থাকতো দেশে, আমি থাকতাম মেসে। প্রতি সপ্তাহে বাড়ি যেতাম শনিবারে, কলকাতায় ফিরতাম সোমবারে। ঐ দুটি দিন ছিল আমার দীপালী উৎসব, আমার নিদ্রাহারা দুটি বিহ্বল রাত্রিযাপন, আমার সারা সপ্তাহের জন্যে দুট চোখভরা পাথেয় সঞ্চয়। ট্রেণে যেতাম ভাবতে ভাবতে, কেমন মুখখানি দেখবো ; ট্রেণে আসতাম ভাবতে ভাবতে কেমন মুখখানি দেখে এলাম। সদ্য অন্ধতাবিমুক্ত চক্ষুর দর্শনীয এবার মিলেছে, অন্ধকারে প্রদীপ এবার জ্বলেছে। অনেক কষ্টের পরে এবার শুধু দেখবার জন্যে, শুধু আদর করবার জন্যে, শুধু কাব্যলোক রচনা করবার জন্যে আমাকে এই পুষ্পিকাবল্লটি স্বয়ং বিধাতার স্বহস্তের দান। অদর্শন বেশিদিন সহ্য হয় না, চোখের আড়াল হ'লেই অস্থির হ'য়ে উঠি। মা যদি কিছুদিনের জন্যে সঙ্গে নিয়ে যেতে চান পশ্চিমে, অমনি আমার মুখভার হয়, শরীর খারাপ হয়।

কিন্তু স্ত্রীর মনের দিকটা কেমন? সে দিকে চেয়ে দেখবার আমার ফুরসৎ হয়নি। যেটুকু সময় কাছে পাই সে কতটুকু সময়? মুখের দিকে চাইতে চাইতেই দিনরাতগুলো কেটে যায়, মনের দিকে চাইবার সময় কোথায়? রূপ দেখে দেখে

আমার আশা মেটেনা। গভীর রাত্রে যখন সে ঘুমোয় তখনো আমি জেগে থাকি, প্রদীপ জেলে শুধুই দেখি তার নাকের স্পন্দন, তার ওষ্ঠকুঞ্চন, তার অলস বাহুর গঠন, তার অনুপম নারীসৌন্দর্য। নহে মাতা, নহে কন্যা, নহে বধু, এ-শুধুই উর্বশী। মন সকলেরই থাকে, কিন্তু এমন রূপ থাকে ক'জনের?

দেখতে দেখতেই তিনটে বছর কেটে গেল, অকস্মাৎ হোলো বাবার মৃত্যু। তাঁর ব্লাডপ্রেসার খুব বেশি ছিল, হঠাৎ মস্তিষ্কের ভিতরকার শিরা ছিঁড়ে গেল, আদালতে কাজ করতে করতেই মৃত্যু ঘটলো। মা তখন সেখানে। ঠাকুরদাদার আদেশে আমি সেখান থেকে মাকে নিয়ে এলাম। তুমুল কোলাহলের মধ্যে বাবার শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হোলো।

এর পরেই নানারকম অনিয়মে অত্যাচারে আমার জ্বর হ'তে শুরু হোলো। যা কিছু আমার রোগ হয় তাই যেন অসাধারণ। জ্বর ক্রমে ক্রমে আমাকে জীর্ণ করে ফেললে, কোনো চিকিৎসাতেই কিছু ফল হয় না। দুচার দিন একটু ভালো থাকি, আবার জ্বরে পড়ি। কলেজের প্রফেসররা বললে, এ পাড়াগাঁয়ের ক্রনিক ম্যালেরিয়া, সহজে সারবে না। শরীরে মোটে রক্ত নেই। বহুকাল ওষুধ খেতে হবে আর হাওয়া বদল করতে হবে।

ঠাকুরদাদা এবং ঠাকুমার সঙ্গে আমি পশ্চিমে গেলাম। আমার স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা। আমার সঙ্গে সেও যেতে পারে না, তাকে ফেলে মাও যেতে পারে না। এ ছাড়া ডাক্তাররা নাকি বলে দিয়েছিল যে স্ত্রী নিকটে থাকা আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর।

প্রাণান্তকর তেতো ওষুধগুলো খেতে খেতে আর পশ্চিমের সেই সোন নদীর ধারে খোলা মাঠের হাওয়া লাগতে লাগতে বছরখানেক বাদে আমি সেরে উঠলাম। এক বছর পশ্চিমে কাটিয়ে দেশে ফিরলাম।

দেশে ফিরে আবার আমি কলকাতার কলেজে ঢুকলাম, আবার যথারীতি যাতায়াত করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে আমার একটি ছেলে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে

গভীর পিতৃস্নেহ দেখা দিল, ছেলের প্রতি যত্ন এবং আদরের কোনো পরিসীমা রইলনা।

প্রায় বছর দুই অদর্শনের পরে যোগেনদের বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে শুনলাম অনেক খবর। আমি যখন বাবার শ্রাদ্ধাদি নিয়ে ব্যস্ত তখন যোগেনের বিয়ে হয়েছে। আমার শোকের সময় বলে তখন এ বিষয়ে আমাকে কোনো খবর দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি মাত্র পনেরো দিন আগে যোগেন বিলেত যাত্রা করেছে। পাশ করে ফিরতে দু'বছরের কম নয়। এখানকার আইন পরীক্ষায় সে খুব ভালো ভাবেই পাশ করে গেছে। আমি যোগেনের বৌ দেখতে চাইলাম, কিন্তু সেও চলে গেছে তার বাপের বাড়ি। যোগেনের মা আমাকে নানারকম আয়োজন করে খাওয়ালেন, যোগেনের বাবা আমার শরীররক্ষা সম্বন্ধে নানারকম উপদেশ দিলেন।

বাড়িতে যথারীতি যাতায়াত করতে করতে এবং পরীক্ষা দিতে দিতে দুটো বছর নির্বিঘ্নে কাটিয়ে শেষ পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলাম। ভালো ভাবেই এবার পাশ করেছি, এমন কি একটা বিষয়ে প্রথম স্থানও অধিকার করেছি। ডাক্তারি ডিগ্রিটা নিয়ে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

কলেজে একটা ডিমনস্ট্রেটরের চাকরি খালি ছিল, সেই চাকরিতে আমি ঢুকে পড়লাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারি অভিজ্ঞতাও কিছু কিছু সঞ্চয় করতে লাগলাম। কিন্তু ডাক্তারি অভিজ্ঞতা যতটা হোক কিংবা নাই হোক,—অন্য এক নতুন ধরণের অভিজ্ঞতা এবার আমার শুরু হোলো। জীবনের চলতিপথে এমন একটা দিক হঠাৎ দেখা দিল যে সম্বন্ধে আগে কিছুই আমি ভাবিনি।

বাল্য এবং কৈশোর পেরিয়ে আমার পূর্ণ যৌবন চলেছে, সন্তানের পিতাও হয়েছি, কিন্তু মানুষের হৃদয়ের হালচাল তখনও পর্যন্ত কিছুই আমি জানতাম না। অল্পদিনের মধ্যেই আমার অনেক রকমের জ্ঞান হোলো।

স্ত্রীলোকের বাইরের গঠনটা সুন্দর, কিন্তু ভিতরের গঠনটা কেমন তা আমার জানা ছিল না। ভাবতাম এরা সবাই সবল এবং সুন্দর, আমাদের তরফ থেকে শুধু

যত্ন করবার এবং ভালোবাসবার সামগ্রী। বস্তু এবং কাব্য মিশিয়ে তবেই তো এ পৃথিবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এখানে ফল রচনা করবে যত কালো কালো বনস্পতিরা, আর লতারা রচনা করবে শুধু রঙীন ফুলের সৌন্দর্য। জগৎটাকে এমনিভাবেই আমি বুঝেছিলাম। দেখলাম সেটা আমার নিতান্তই ভুল। একটা নিজস্ব মনগড়া বিশ্বাস নিয়ে চলেছিলাম, সে বিশ্বাস আমার ভাঙলো।

দেখলাম, স্ত্রীলোকের মধ্যেও একটা মন আছে। তারও একটা নিজস্ব পছন্দ-বোধ আছে। তাকে যতই আদর আপ্যায়ন করো, সে নিজের মনে থাকে, নিজের পথ দেখে, নিজেকে খুশি রাখবার উপায এই সংসার-বন্ধনেব মধ্যেই ফাঁকতালে আবিষ্কার ক'বে নেয়।

একদিন আমার স্ত্রীর মনের দিকে চেয়ে দেখবার প্রয়োজন হোলো, দেখলাম সেটা তিন ভাগে ভাগ করা। একদিকে সে তার স্বামীর স্ত্রী, একদিকে ছেলেব মা, আর একদিকে দেওর প্রভৃতি সমবযস্কদের সঙ্গী। তাতেও কিছু যায আসে না,—কিন্তু আর ও কথা থাক। কোনো বিস্তৃত বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই। মোট কথা, এইটুকু বুঝলাম যে স্ত্রীলোকের প্রেম অতি দুর্লভ সামগ্রী, তাকে আদর কিংবা আকিঞ্চন দিযে কেনা যায় না, অশ্রু দিযেও না।

তবে স্বাস্থ্য ভেঙে গেলে তখনই কেউ সহজে সেটা মেনে নেয় না। কেবলই জোর ক'রে বিশ্বাস কবতে থাকে যে যাই হোক না কেন, তবুতো এক রকম চলে যাচ্ছে। এই যুক্তিটা ধরেই স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তিরা কাটিয়ে দেয় মৃত্যুকাল পর্যন্ত। বিশ্বাস ভেঙে গেলেও ঠিক তাই হয়। ঐ ভাঙা বিশ্বাসকেই টেনে নিয়ে কোনোমতে চালিয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিঃশেষ মৃত্যু না ঘটে।

অতঃপর স্ত্রীও যেমন ছিল তেমনি রইল, আমিও যেমন ছিলাম তেমনি রইলাম। স্ত্রী রইল আমার সঙ্গিনী এবং সহধর্মিণী হ'য়ে। আর কোনো বিষয়ে না হোক, অন্তত একটা বিষয়ে তো নিশ্চযই। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিরও একটা দিক আছে বৈকি। জীবন থেকে ইন্দ্রিয়গুলোকে একেবারে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, ইন্দ্রিয নিয়ে আমাদের জীবন।

কিন্তু চেষ্টা এতই করি, তবু ভিতরের মনটিকে শান্ত রাখতে পারি না। থেকে থেকে সে কেবলই ছট্‌ফট্ করে।

মনটা আমাদের কোন পদার্থ? অনেক ভেবে দেখেছি, কিছু কিনারা করতে পারিনি। একটা কিছু অঙ্গ তো বটেই। মন হচ্ছে আমাদের এই শরীরেরই একটা অঙ্গস্বরূপ। তা যদি না হবে, তাহ'লে ওর আঘাতে এত কষ্ট লাগে কেন? পেটে কিছু একটা দোষ ঘটলে যেমন আমাদের কষ্ট লাগে, চোখে কিছু দোষ ঘটলে যেমন কষ্ট লাগে, মনে কিছু ঘটলেও ঠিক তেমনি কষ্ট লাগে। ঠিক তেমনি বলাটা ভুল হচ্ছে, তার চেয়েও অনেক বেশি। খুব ছেলেবেলাতেই এর পরিচয় আমি পেয়েছি। কিন্তু মন ছাড়াও কি আরো কিছু আমার আমিত্বের মধ্যে নেই?

অনেক বই খুঁজলাম, অনেক মহাপুরুষের লেখা পড়লাম। দেখলাম একজন মহাপুরুষ বেশ একটি কথা বলেছেন। তিনি বলছেন,—আগে খুঁজে দেখ তুমি কে? এই প্রশ্নটি নিজেকে ভালো ক'রে জিজ্ঞাসা কর। তোমার ঐ দেহটাই কি তুমি? তা নিশ্চয় নয়, কারণ শরীরকে ছাড়িয়েও তুমি নিজেকে অনুভব করো। তোমার যে মনটা ভাবছে 'আমি আমি',—সেই মনটাই কি তুমি? তাও নিশ্চয় নয়। ঐ মনটা তোমার চিন্তা এবং অনুভব করবার একটা যন্ত্র, ওটাও তোমার এক ইন্দ্রিয়। তোমার অবস্থাগতিকে অনেক সময় ও যা-খুশি তাই ভাবে। অনেক সময় দেখবে, তুমি যখন একটা কাজ চাইছো তোমার মন তখন অন্য কাজ করছে। তাহ'লে প্রকৃতপক্ষে তুমি কে? এই কথাটাই আগে খুঁজে বের করো। যখন এটা জানতে পারবে, তখন তোমার সব প্রশ্নেরই সহজ মীমাংসা হ'য়ে যাবে।

আমি খুঁজতে চেষ্টা করি, খুঁজে পাই না। প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেষ্টা করি, কোনো প্রশ্নেরই কিছুমাত্র মীমাংসা হয় না।

মনের এত বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিন্তু আমার শরীরটা খুব ভালোই রইল। সামান্য একটু রোগা হ'য়ে গেলাম বটে, কিন্তু তাতেই যেন নিজেকে সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। খাওয়া কমে গেল বটে, কিন্তু তাতেই আমার শারীরিক

প্রয়োজন মিটতে লাগলো। আমি এই একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছি যে—মন যখন আমার সুস্থ থাকে তখন শরীরটা যেন খারাপ। আর মন যখন খারাপ থাকে তখন শরীরটা বেশ সুস্থ। তখন যতই অনিয়ম অত্যাচার করি কিছুতেই কোনো অসুখ দেখা দেয় না।

বহুকাল এমনি ভাবেই কাটলো। অনেক রকমের সাংসারিক সুখদুঃখ এর মধ্যে এলো গেল। সুবলের একটি বিয়ে দেওয়া হোলো,—এবং তার পরেই ঠাকুরদাদা মারা গেলেন। কিছুকাল পরে কাকাও হঠাৎ মারা গেলেন। এর পরে আমার একটি কন্যা সন্তান হোলো। এদিকে চাকরিতে আমার উন্নতি হোলো, কিছু মাইনে বাড়লো। চাকরির ফাঁকে ডাক্তারিও কিছু কিছু চলতে থাকলো। হাতে বেশ পয়সা জমতে লাগলো, কিন্তু জমলেই আমি খরচ ক'রে ফেলতাম। মাঝে মাঝে একটা লম্বা ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম, খানিকটা বিদেশ ঘুরে আসতাম, নতুন নতুন দেশ দেখতাম। আরো কত দিকে কত পয়সা নষ্ট করলাম। অনেক টাকা দিয়ে দুটো কুকুর কিনে পুষলাম। এদের জাতের একটা এই গুণ দেখলাম, এরা একজন প্রভু পেলে সমস্তটাই উৎসর্গ ক'রে দেয় সেই প্রভুর জন্যে। দু'নলা বন্দুকের শখ ছিল আমার খুব ছেলেবেলা থেকে, অনেক চেষ্টায় একটা পাস যোগাড় ক'রে বন্দুক কিনলাম। মাঝে মাঝে হরিণ শিকার করতে চলে যেতাম হাজারিবাগ, কোনারক, আগ্রা।

ছেলেবেলায় দেখেছি নদীর জলে পল্লীগ্রামের লোকের মাছ ধরা। জলের মধ্যে তারা কাঠির জাল পুঁতে দিয়ে যায়। স্রোতের জলে খড়কুটো সবই তার ফাঁক দিয়ে ভেসে বেরিয়ে যায়, কেবল মাছগুলো থেকে যায় সেই জালের মুখে আটকে। মাছগুলো এমনি বোকা, তারা এগিয়েও যেতে পারে না, পিছিয়েও যায় না, সেইখানেই একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। আমার নিজের সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই ঐ মাছগুলোর কথা মনে হোতো। স্রোতেই ভেসে আছি, আমার সুমুখে পড়ে রয়েছে অতি দীর্ঘ জীবনের পরমায়ু, সুখদুঃখ কতই আমার ওপর দিয়ে পার হ'য়ে যাচ্ছে, কিন্তু যেখানে আমি আটকে গেছি সেখানেই আমার স্থিতি। এগিয়ে

যাবারও শক্তি নেই, পিছিয়ে যাবারও উদ্যম নেই। বাইরে যতই বড়াই করি, ভিতরের দিক দিয়ে হয়তো আমি একটা অযোগ্য অপদার্থ। বাইরের লোকে জানে না, কিন্তু ঘরের লোকে আমাকে চিনেছে। এবং জানতে পেরেছে যে আমার রূপ থাকলেও কোনো জৌলুষ নেই, গুণ থাকলেও কোনো গরিমা নেই।

অনবরত আত্মবিলোপ করতে থাকা একরকমের আত্মহত্যা। কিন্তু তবু বহুকাল এমনি ভাবেই কাটলো। বাংলা মাটির পথে পথে পাঁক। ভেবে নিলাম এই বাংলা দেশের পল্লীতে চিরদিনই হয়তো আমাকে এমনি পাঁকের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে।

মীরার কথা

আমি নিজে কিছুই বুঝতে পারিনি, কিন্তু বাড়ির লোকেরা বললে আমার বয়স হচ্ছে। ছাঁচিকাকাও আমার সঙ্গে আর বিয়ের প্রস্তাব করতে আসে না। বুড়ো দরোয়ানটা আমাকে ডাকে দিদিমণি, তার মধ্যেও একটা সমীহের ভাব। রাস্তায় বেরোনো তো আগের থেকেই বন্ধ, কিন্তু বাড়ির মধ্যেও মা আমাকে সর্বক্ষণ আগলে আগলে একেবারে অস্থির ক'রে তুললেন। ছাদে আর ওঠবার জো নেই। রাস্তার ধারের বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়ালেই কেমন ক'রে তিনি জানতে পারতেন, সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠিয়ে ধমকাতেন—ওদিকে কী করতে গিছিলি?

কেবল বাবা কিছু বলেন না, তাঁর ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন দেখলুম না। কিন্তু এটা লক্ষ্য করলুম, কিছুদিন ধরে তিনি কী একটা ভাবচেন। মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লেখালেখি করচেন, অপরিচিত লোকজন প্রায়ই যাতায়াত করচে, তখন তিনি আমাকে তাঁর ঘর থেকে সরিয়ে দিচ্ছেন। আমার অসাক্ষাতে মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতেন, কত কী গয়নাপত্রের কথা বলতেন, কিছু কিছু আমার কানে যেতো। আভাষে ইঙ্গিতে বুঝতে পারতুম যে আমার বিয়ের কথা উঠেছে। আমার শুনতে কৌতূহল হতো, কিন্তু সেইজন্যেই আমি আরো সরে যেতুম, ওঁদের ত্রিসীমানায় থাকতুম না।

একদিন শুনলুম আমাকে কারা দেখতে আসবে। আমি তো জানিই সে কথা, কিন্তু ভাবটা দেখালুম যেন কিছুই জানিনা, নির্বিকার। মা যেটুকু করতে বলচেন সেটুকু করচি, থেকে থেকে তাতেও বিরক্ত হচ্চি। এ সময় যদি একটুও বিরক্ত না হই তাহ'লে মা ধরে ফেলবেন, কারণ আমার স্বাভাবিক স্বভাবটা তো নিতান্ত বাধ্যতামূলক নয়। পরিপাটি ক'রে তিনি আমার চুল বেঁধে দিলেন, গা ধুয়ে আসতে বললেন, হাতে মুখে আর গলায় খুব কষে স্নো ঘষে দিলেন, টিপ

পরিয়ে দিলেন, একখানা বেগুনি রংএর বেনারসী বের করে দিলেন পরতে,—যে কাপড়খানা আমার দুচক্ষের বিষ। তাও কোনো রকমে পরলুম, কিন্তু যে গয়নার রাশি সাজিয়ে রেখেছিলেন সে আমি কিছুতেই পরলুম না।

দুটি ভদ্রলোক আমাকে দেখতে এলেন। একজন বৃদ্ধ, একজন আজকালকার ইয়ংম্যান, চেহারাটাও নিতান্ত মন্দ নয়। কথাবার্তায় বুঝলুম পাত্র নিজেই এসেছেন দেখতে, সঙ্গে এসেছেন তাঁর কাকা। পাত্র কোনো কথা বলেন নি, তাঁর কাকাই আমাকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন, লেখাপড়া এবং গানবাজনার শিক্ষা সম্বন্ধে।

জলখাবারের রেকাবি এবং সরবতের গ্লাস সাজিয়ে দেওয়া হলো, তখন আমার উঠে যাবার সময় হলো। বাবা বললেন,—মেয়েটিকে দেখলেন তো? এবার ও চলে যেতে পারে?

বৃদ্ধ বললেন—দেখলুম বৈকি, চমৎকার মেয়ে। কিন্তু মা-মণিকে আমার একটি কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। দেখ মা, আমার একটি খুব ছোটো নাতি আছে, এই ছ'মাসেরও নয়। তাকে কিন্তু তোমায় মানুষ ক'রে তুলতে হবে। পারবে তো মা?

বাবা বললেন—ও কী কথা বলচেন? এ সব আমাকে আগে বলেন নি কেন?

তিনি বললেন—এমন কিছু বলবার কথাই নয়, তাই বলিনি। পাত্রের বয়সটা দেখচেন তো? এর আগে নাম মাত্রই একটা বিয়ে হয়েছিল, বছর খানেকের মধ্যেই একটা সন্তান রেখে বৌমাটি মারা গেল। এখন সেটাকে রক্ষা করতে হবে তো? আপনার মেয়েটিকে তাই আগের থেকে জিজ্ঞাসা ক'রে নিচ্ছি। ছেলে পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, চাকরবাকর অনেক আছে, কিন্তু তাদের দ্বারা কী এ কাজ চলে?

বাবার চোখ দুটো জবাফুলের মতো লাল হ'য়ে উঠলো। এমন রুদ্রমূর্তি তাঁর কখনো দেখিনি। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন,—আপনি ভদ্রলোক

তাই কিছু বললুম না। যান আপনি। দ্বিতীয় পক্ষের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া তো দূরের কথা, তার সামনে মেয়েকে বের করাও আমার অপমান। নিতান্ত ভদ্রলোক না হ'লে এ অপমানের শোধ নিতুম।

জলখাবারের রেকাবি এবং সরবতের গ্লাস সমস্তই যথাস্থানে পড়ে রইল, তাঁরা দুজনে ম্লান মুখে উঠে চলে গেলেন।

মা এই নিয়ে বাবাকে ঠাট্টা করতেন। বলতেন,—এতদিন বেছে বেছে খুব পাত্রটি এনেছিলে। বড়োলোকের বড়ো নজর। বাবা তার জবাব দিতেন—ওর কোষ্ঠীতে যে লেখা রয়েছে ওর দুটো বিয়ে, আমি তার কী করবো? জ্যোতিষীরা বলেন, বিয়ের প্রস্তাব হওয়াও যা, বিয়ে হওয়াও তাই। কোষ্ঠীর একটা ফল এমনি করেই ফলে গেল। দ্বিতীয়টা এবার আসছে, একটু সবুর করো।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এলো কিছুকাল পরেই। এবারকার পাত্রটি দ্বিতীয়পক্ষ নয়। খুব নাকি বিদ্বান ছেলে, অনেক পাস করেছে। এবার পাত্রের বাপ একাই এলেন আমাকে দেখতে। আবার আমাকে সেই যথারীতি সাজগোজ করতে হলো, অনেক স্নো ঘষতে হলো। এবার কিন্তু আমি বেনারসীখানা পরিনি, অন্য একটা কাপড় পরেছিলুম।

পাত্রের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কী-কী বিদ্যা জানি।

আমি একে একে পরিচয় দিতে লাগলুম।

পাত্রের বাবা বললেন—ও-সব তো শুনলুম, এবার আমি বরং একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি সিঙ্গি মাছের ঝোল রাঁধতে জানো কী? ঐটি আমাকে রোজ নিজের হাতে রেঁধে দিতে হবে, আগের থেকে বরং বলেই রাখছি।

তাঁর কথা শুনে আমি হেসে ফেললুম। ভদ্রলোকের একটু মুদ্রাদোষ আছে।

খুব ঘটা করেই আমার বিয়ে হলো। বাবা অনেক গয়নাপত্র দিলেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করলেন। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, এই বিয়েটি দিতে তাঁর বিস্তর টাকা বেরিয়ে গেল।

যে বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল সেটা নিতান্ত বালিকা বয়স নয়। ও বয়সে বিয়ে করবার একটা অহেতুক বাসনা সকলেরই হয়, সুতরাং আমারও হয়েছিল। বিয়ের কথা উঠলে সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্ন আমার মনে হতো, বরটি কেমন দেখতে হবে। তেমন সুন্দর যদি না হয়? অসুন্দর বর কেউই পছন্দ করেনা, অন্তত আমি তো করিই না।

বিয়ের দিন সেজেগুজে চন্দনচর্চা করে বরের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম দুরুদুরু অন্তঃকরণে। অল্প বয়স থেকেই আমাদের মনের মধ্যে বরের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আদর্শ তৈরী করা থাকে। মনে মনে কামনা করচি সেই আদর্শের সঙ্গে যেন অন্তত খানিকটাও মিল হয়। সন্ধ্যার সময় অনেক শাঁক বাজলো, হুলুধ্বনি হলো, সানাই বেজে উঠলো, সকলে বললে—বর এলো। কম্পিতপদে বিয়ের আসরে গিয়ে বসলুম, বরের দিকে একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখলুম। মনে আছে প্রথম দৃষ্টিতেই আমার মনটা যেন একবার মোচড় খেয়ে সংকুচিত হ'য়ে গেল। আমার ধারণার সঙ্গে এর কিছুই মিল নেই, নিতান্ত অপরিচিত ধরণের একখানা মুখ। বাঞ্ছিত বরের মতো যেন মনেই হয় না। বাসর ঘরে কে একজন জিজ্ঞাসা করলে,—হাঁরে তোর বর পছন্দ হয়েছে তো? আমি তৎক্ষণাৎ সজোরে ঘাড় নেড়ে বললুম—না। সবাই হেসে উঠলো। কিন্তু আমার পছন্দ হয়নি তা কী বলবো?

যে সংসারে প্রবেশ করলুম সেখানে যা কিছু দেখি সবই অদ্ভুত ঠেকে। আমার বাপের বাড়ির ব্যবস্থা এবং রুচির সঙ্গে এদের কোনই মিল নেই। মানুষগুলো দেখি সবই রোগা রোগা। সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান চেহারার মানুষ দেখা আমার ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস, রোগা লোকদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনা। আমার শ্বশুরের গায়ে মাংস তো নেই বললেই হয়, হাড়গুলি সব গোণা যায়। তাঁর ছেলে দুটিও প্রায় তদ্রূপ। জানকীমাযী থাকলে বলতেন বৃষকাঠ।

তবে স্বামীর চেহারা যে আমার মনের মতো হয়নি, এটা প্রথমে কিছুদিন মাত্রই মনে হয়েছিল। কেবল চেহারা নিয়েই যে আমরা সারাক্ষণ ভাবতে

থাকি তা নয়। প্রথম দৃষ্টিতে পছন্দ হলো না—এই পর্যন্ত, তারপরে ও-কথা মিটেই গেল। ঘর করতে করতে দুদিন পরেই মানুষটাকে অভ্যাস হ'য়ে যায়, তখন আর চেহারার দিকে মোটে নজরই যায় না। তখন নজর যায় সচল সক্রিয় মানুষটার ব্যবহারগুলোর দিকে।

বিয়ে দেবার গূঢ় উদ্দেশ্যটা কী, স্বামীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্পর্কটা কী, স্বামীর কাছ থেকে কী ব্যবহার প্রত্যাশা করতে হবে, এ সব শিক্ষা কেউই আমাকে দেয়নি। বোধ হয় অধিকাংশ মেয়েই এ শিক্ষা নিয়ে শ্বশুরঘর করতে যায় না। যারা আগের থেকে বিবাহিত মেয়েদের সঙ্গে মিশতে সুযোগ পায় তারা হয়তো কতকটা জানে, কিন্তু আমার সে সুযোগ ছিলনা। কাজেই আমি প্রস্তুত ছিলুম না। স্বামীকে ভক্তি করো, গুরুজনদের সেবা করো, সংসারে তরকারি কোটো পান সাজো রান্না করো, এ সব শিক্ষাই আমি পেয়েছি,—কেবল ঐটি ছাড়া। কাজেই এখানে এসে যা ঘটতে লাগলো তা আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত এবং অদ্ভুত। রাত্রে ঘরে শুতে যাওয়া আমার পক্ষে একটা আতংকের বিষয় হ'য়ে উঠলো।

আমি দেখলুম দিনের স্বামী আর রাত্রের স্বামী দুটি স্বতন্ত্র জীব। দিনের বেলা বেশ নম্র এবং ভদ্র, শিষ্টতা করতেও জানে, মিষ্টি কথা বলতেও জানে, মর্যাদা রাখতেও জানে। রাত্রে নির্জন শয়নকক্ষে দরজাটি বন্ধ করবার পরে কিন্তু অন্য মূর্তি। এমন এক একটা নির্লজ্জ রকমের প্রস্তাব করে বসেন যে আমার পক্ষে তা একেবারে অসম্ভব। স্তম্ভিত হ'য়ে যাই, প্রতিবাদ করতেও মুখ সরেনা, চুপ ক'রে কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি। এখন আমার বয়স হয়েছে, সমস্তই জানি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা নগ্ন পাশবিক সত্তা আছেই। কিন্তু অপর ব্যক্তির হৃদয় এবং রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্য ক'রে খাপ খাইয়ে নিতে জানলে তাও শোভন এবং সহনীয় হ'তে পারে, নতুবা সেটা তার চক্ষে দেখা দেয় দারুণ বীভৎস মূর্তিতে। উনি সব কিছুই জানতেন কিন্তু এই বিদ্যাটুকু জানতেন না। এরও বোধ হয় একটা শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু কেউ কিছু শেখায় না, এস্থলে সকলেই নিজের

ইচ্ছামতো ব্যবহার করে। একদিন উনি এমন এক জঘন্য প্রস্তাব করলেন যে কিছুতেই আমি তাতে সম্মত হ'তে পারলুম না। আমি নির্বাক এবং নিশ্চল, কিন্তু তিনিও নাছোড়বান্দা। অনেক সাধ্যসাধনা ও নানাবিধ ভয় দেখানোতেও যখন কিছু ফল হলোনা, তখন তিনি আমাকে ঘর থেকে ঠেলে বের করে দিয়ে খিল বন্ধ করলেন। সমস্তটা শীতের রাত্রি আমি বারান্দায় বসে ঢুলতে ঢুলতে কাটিয়ে দিলুম। আমাকে ভুলিয়ে বশ ক'রে নিতে পারলে হয়তো ওতেও আমি রাজি হতুম, কিন্তু আমাকে ভোলাতে উনি জানতেন না। আমাকে উনি চিনতেই পারেন নি।

প্রায়ই এ রকম বিপর্যয় ঘটতো। জীবন দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে আমার অনমনীয় প্রকৃতি দেখে অত্যাচারের মাত্রাটা তিনি কমিয়ে দিলেন, খানিকটা ভালো ব্যবহারও করতে লাগলেন। অনন্যোপায় দেখে আমিও কতকটা নম্র হ'য়ে গেলুম। চিরদিন আমি নিতান্তই একরোখা ছিলুম, কিন্তু সে কেবল আমার স্বাধীনতার রাজ্যে। এই পরাধীনতার রাজ্যে এসে আমার দুর্দমনীয় স্বভাবেরও কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছিল।

কিছুকাল পরে স্বামী বিলাত চলে গেলেন। আমিও খানিক হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

কিন্তু ইতিমধ্যেই আবার সংসারের শাসন শুরু হ'য়ে গিয়েছিল। চলতে হবে ধীরে, বলতে হবে ধীরে, মাথায় থাকবে খানিক ঘোমটা। সহানুভূতি এবং স্নেহ নেই, কিন্তু তার কৃত্রিম ব্যঞ্জনাটুকু আছে। কাজ করতে হবে, কিন্তু দোষ ত্রুটির জন্যে কোনো ক্ষমা নেই, সঙ্গে সঙ্গেই বাপের বাড়ির গঞ্জনাটুকু আছে।

কুটনো কোটা আমার তেমন অভ্যাস নেই। আলু কুটতে খোসার সঙ্গে খানিকটা শাঁস চলে যায়। শাশুড়ীর নজর এড়ায় না। তিনি বলেন,—ওগো বড়োমানুষের মেয়ে, অমনি ক'রে কী তোমার মা আলু কুটতে শিখিয়েছেন? খোসার সঙ্গেই যে সব চলে গেল। ওগুলো ফেলোনা, ওতেই আমাদের মতো গরিবদের একটা তরকারি হ'য়ে যাবে। কাজের যা ছিরি!

মাংস রাঁধতে আমি ভালোই জানি। বাবা আমার হাতের রান্না মাংস খেয়ে খুব সুখ্যাতি করতেন। অনেক যত্ন ক'রে রাঁধলুম। মশলা কম দেওয়াই আমার বরাবরের অভ্যাস, কারণ বাবা বলতেন, এটা মশলার ঘন্ট খাবার জন্যে রাঁধা হচ্ছেনা, মাংস খাবার জন্যেই রাঁধা হচ্ছে। কিন্তু শাশুড়ী বললেন,—মশলা দেবার বেলাটি তো বেশ হাতটান দেখছি বাছা। এ কি রোগীর পথ্যি বানিয়েছ? ছ্যা ছ্যা!

দুধের ক্ষীর থেকে সন্দেশ তৈরী করতেও আমি জানতুম। শাশুড়ীর হুকুমে খুব যত্ন ক'রে তৈরী করলুম, সুগন্ধ করবার জন্যে তাতে একটু গোলাপী আতর লাগিয়ে দিলুম। শাশুড়ী বললেন,—ওগো বড়োমানুষের ঝি, এ কী কাণ্ড করেছ? এবার ভাতে ডালেও আতর লাগিয়ে দেবে না কী? এমন কখনো দেখিনি বাবা। সব কিছুতে আতর লাগালেই বুঝি আমার ছেলে তাড়াতাড়ি তোমার বশ হ'য়ে যাবে?

কিন্তু এ সব আমি তেমন গ্রাহ্য করতুম না। মায়ের কাছে এই ধরণের বাক্যবাণ শুনতে আমি কতক অভ্যস্ত। বয়স্কা মেয়েদের শাসন করবার ধারাটা কেমন তা আমার জানা ছিল। এগুলো উত্তরাধিকারসূত্রেই আসে, বড়োরা যখন প্রয়োগ করে, ছোটোরা তখন মনের মধ্যে জমা ক'রে রেখে দেয়। তারপরে যিনি যে-বাণ শাশুড়ীর কাছে হজম করেছেন তিনি সে-বান যথাকালে বৌএর প্রতি নিক্ষেপ করবেন, তার কোনো অজুহাত থাক কিংবা নাই থাক।

শ্বশুর লোকটি দেখতে নিরীহ প্রকৃতির, কিন্তু বড়ো খুঁৎখুঁতে, সুতরাং খিটখিটেও আছেন। গরম দুধটা আরো গরম করোনি কেন, আজকের ঝোলটা কালকের মতো হলোনা কেন, লংকাবাটা বেশি দেওয়া তোমার কেমন বদ অভ্যাস, ইত্যাদি অনেক খুঁটিনাটি আছে। এ-ছাড়াও আমাকে বোঝাতে চান যে আমার বাপের বাড়ির আভিজাত্যের চেয়ে এঁদের আভিজাত্য আরো মহার্ঘ, যেহেতু হাকিমের মানমর্যাদা চিরকালই সবার ওপরে। সম্ভবত সেটা জাহির করবার জন্যেই মাঝে মাঝে আমাকে পা টিপে দিতেও বলেন। আমি কোন

প্রতিবাদ করিনা, মনে মনে হাসি। মানুষের বাইরেটা এক রকম, ভেতরটা অন্য রকম। এঁরা মনে করেন আমি কিছুই বুঝতে পারবো না। জানেন না যে আমার প্রকৃতির মধ্যেই এমন একটা ধারালো নজর আছে যে সামান্য কিছু দেখলেই সবটা বুঝে নিতে পারি। কিন্তু কারো কথায় আমি কোনো কথা বলিনা, শুধু চুপ ক'রে শুনি। এখানে অনর্থক কথা বলে কী লাভ ?

একটিমাত্র লোকের কাছে আমি মন খুলে সব কথা বলতে পারতুম। সে সুরেন ঠাকুরপো। সে আমার দাদার বয়সী, আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়ো। দাদাও যে কলেজে পড়ে সেও সেই কলেজে পড়ে। কিন্তু দাদার মতো সে নিতান্ত ভালোমানুষটি নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি চালাক।

সুরেন ঠাকুরপো খুব মিশুক, আর মনটি সাদা। মনের মধ্যে কোন প্যাঁচ নেই, খোলাখুলি স্পষ্ট কথা কয়। প্রথম থেকেই সে আমাকে বন্ধুর মতো গ্রহণ করলে, আমিও তার কাছে সৌহার্দ আর সহানুভূতি পেয়ে মন খুলে দুটো কথা বলে বাঁচলুম।

বন্ধুত্বটা প্রথমে ছিল বাহ্যিক, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেটা আন্তরিক হ'য়ে উঠলো। যেখানে মেলামেশার মধ্যে একটা সহজভাব দেখা গেল সেখানেই বন্ধুত্বটা খুব সহজে জমে উঠলো। ঠাকুরপো হ'য়ে উঠলো আমার আড্ডার সঙ্গী, আমার ঠাট্টার পাত্র, আমার সুখদুঃখের শ্রোতা, আমার সর্ববিষয়ের পরামর্শদাতা। সকল বিষয় নিয়েই আমাদের আলোচনা চলতো, কোনো পক্ষে কিছু বাধা কিংবা সংকোচ ছিল না। আমি শুরু করতুম—

—ঠাকুরপো, তোমার বিয়েটা এবার কবে হচ্ছে বলো, আমার একটা সঙ্গী জোটে। আমার চেয়েও সুন্দর বৌ আনা চাই কিন্তু।

—ধেৎ, এই চেহারায় আর বিয়ে করবেনা। কতদিন বাঁচবো তার ঠিক নেই, বিয়ে ক'রে মরতে যাই কেন ? তুমিই বলোনা, বিয়ে করার মধ্যে কী সুখটা আছে ? নিতান্ত রাবিশ একটা সেকেলে প্রথা, ওটা আমরা আর মানবোই না।

—সে আবার কী? বিয়ে না করলে চলবে কেন? ঘর সংসার করবার একটা সঙ্গী চাই তো!

—ভুল কথা। ও রকম সঙ্গী মোটেই চাইনা, বরঞ্চ বলতে পারো তোমার মতো একজন বন্ধু চাই।

—আহা তা কেন, পুরুষমানুষের একটা জীবনসঙ্গিনী বৌ চাই তো?

—তাই হও বুঝি তোমরা? পুরুষের ঘরজোড়া অংশীদার নাকি? জানোই-তো, আমাদের ভিতরে এমন সব ব্যাপার আছে যার অংশীদার কেউ হ'তে পারেনা, ও হ'তে গেলেই নানা গোলমাল বেধে যায়। ওর চেয়ে বন্ধু ঢের ভালো, যে হবে শুধু সমজদার। যেখানেই ভাগাভাগির ব্যবস্থা সেখানেই অনেক লুকোচুরি এসে পড়ে। নিজের বেলাই দেখনা, আমার কাছে যা বলতে পারো দাদার কাছে সেটুকুও পাবোনা। দাদারও সেই অবস্থা, যেটুকু আছে তার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখাতে হয়, নইলে পাছে গুমোর ফাঁক হ'য়ে যায়। খোলাখুলি ভাগের কারবার করতে আমরা মোটে জানিই না।

—বেশ তো, বিয়ে ক'রে বৌকে তোমার বন্ধুই ক'রে নিও।

—তা হয়না বৌদি, খাবার জিনিস পেলে তখন খেতেই হয়। পাতের ওপরে মাংস সাজিয়ে রেখে দাঁত সাম্‌লে কাব্য করতে বসা চলে না।

—বেশ তো দুটোই করো, একটা বন্ধু, একটা বৌ।

—আবার সেই ভাগাভাগি? ওতে রাজি নই।

—তবে বুঝি নিরামিষ বন্ধুত্ব ক'রেই তোমার চিরকাল চলবে? তোমরা পুরুষমানুষের জাত বুঝি এতটাই সোজা? বলি খিদেটা মিটবে কী দিয়ে?

—থাক থাক, ও আলোচনায় আর কাজ নেই। আমাদের খিদে মেটাবার আরো বহুৎ উপায় আছে, সে তোমরা বুঝবে না। কিন্তু বন্ধুত্ব করবার মাত্র একটি উপায়, হাতের তাসগুলো সব চিৎ ক'রে সোজা দেখিয়ে দেওয়া, যেমন আমরা তাসখেলার খেঁড়িকে দেখিয়ে দিই।

—বিয়ে করলে বুঝি তা হয়না ? আচ্ছা যদি একটা কোর্টশিপ ক'রে মেম বিয়ে করো ?

—সব সমান, ও বিয়ে করলেই বন্ধুত্ব বিগড়ে যায়।

—কিন্তু সত্যিকার প্রেম হ'লে তখন তো দুটোই একসঙ্গে পাওয়া যায় ?

—দেখ বৌদি, একদম বাজে কথা বলছো। ও সম্বন্ধে তুমিও কিছু জানোনা, আমিও কিছু জানিনা। নিজের চোখে দেখেছ কখনো ? তুমিও বলবে বইপড়া বিদ্যে, আমিও বলবো তাই। অতএব ও-কথা বাদ দাও। সত্যিকার জীবনে যা দেখছো তাই বলো।

—যাক বাপু, বিয়ে করো আর নাই করো, আপাতত আমার বন্ধু হ'য়েই থাকো। এতে আমি খুব রাজি আছি।

—রাজি আছো মানে ? আমাকে ভাগ্যিস পেয়েছিলে তাই বেঁচে গেলে, নইলে কী দুর্দশাই হতো তোমার !

—ইস্, ভারী আমার ত্রাণকর্তা এলেন। আমার আর কেউ নেই বুঝি ? তোমার দাদাই তো রয়েছেন।

—দেখ বৌদি, বেশি চালাকি কোরোনা, আমি সব জানি। পাশের ঘরেই আমি থাকতুম, কামান-গর্জনগুলো সবই আমার কানে আসতো।

—সে তোমার দাদা ঐ কাণ্ড করতেন, আমি তার কী করবো ?

—দাদা বেচারার বিশেষ দোষ নেই। জানোতো ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ। অনেক মেয়ে আছে যারা অত্যাচারী পুরুষদেরই পছন্দ করে।

—কক্ষনো না। তুমি বুঝি সবজান্তা ? মেয়েদের মনের কথা তুমি জানবে কেমন ক'রে ?

—কলকাতায় বাস ক'রে জানবার কিছু অভাব আছে ? পাশের বাড়ির জানলাগুলো আর জোরালো ইলেক্ট্রিক আলোগুলো রয়েছে কী করতে ? যার দেখবার চোখ আছে সেই দেখতে পায়। ছি ছি, লোকের সব ব্যাপার দেখে দেখে এই বিয়ে করা জিনিসটাতেই আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আর মজা এই, কোনো

বিয়েটাতেই দেখলুম না যে অন্তত ভুল করেও ঠিক-ঠিক মিলেছে। দুজনের মন দুটো থাকে যেন সাপে-আর নেউলে। এ রকম বিয়ে ক'রে লাভটা কী হয়?

—ঠিক বলেছ ঠাকুরপো, আমারও ঐ মত। বিয়ে করাটাই ভুল।

—একটা বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। আমি বলে রাখছি, বিয়ে আমি কখনই করবো না। এমনি ক'রে আড্ডা দিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দেবো।

আরো কত রকমের বিষয় নিয়ে যে আমাদের আলোচনা এবং তর্ক চলতো তার ঠিক নেই। এসরাজ ভালো না সেতার ভালো, ক্লাসিক গান ভালো না আধুনিক গান ভালো, ঘোড়া ভালো না মোটর ভালো, রবীন্দ্রনাথ বড়ো না মাইকেল বড়ো, এই সব নিয়ে ঘোরতর তর্ক। ঠাকুরপো যখন বলতো,—রবীন্দ্রনাথের আবার কাব্য নাকি? মাইকেলের একটা লাইন পড়ে দেখ কাব্য কাকে বলে, রবীন্দ্রনাথ তার কাছে মিনমিন্ করচে,—তখন আমি রেগে আগুণ হ'য়ে উঠতুম। কোনো একটা তর্ক উঠলে আমি তখন আমার বাবার কাছে শোনা মতামতগুলো জোর গলায় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতুম,—বলতুম যে আমার বাবা নিজেও এই কথা বলেন। সে তখন হো হো ক'রে হেসে উঠে বলতো,—তোমার বাবার কথা যখন বলছো তখন তো সেটা বেদবাক্য বলেই আমাকে মেনে নিতে হচ্ছে, যেহেতু পাথুরেঘাটার বিজ্ঞজনের কথা সিমলের অর্বাচীনরা মেনে নিতে বাধ্য। রাগের চোটে আমি তার সঙ্গে তখন কথা বলাই বন্ধ ক'রে দিতুম। এমনও হয়েছে যে অতিরিক্ত রাগের ফলে আমার খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হ'য়ে যেতো। কিন্তু সে দুচার দিনের বেশি নয়। কথা না ব'লে আমরা বেশিদিন থাকতে পারতুম না। হয়তো আমিই গিয়ে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করতুম যেন ঝগড়ার ব্যাপারটা কিছুমাত্র মনে নেই। সে বুঝতে পেরে হেসে ফেলতো, তখন আমিও হেসে ফেলতুম। কিংবা হয়তো সে নিজেই এসে ক্ষমা চাইতো, আমি তখন বাঁচতুম।

স্বামী বিলাত চলে যাবার মাসকতক পরেই আমার একটি ছেলে হলো। তখন ঐ ছেলে মানুষ করা হ'য়ে উঠলো আমার একটা নেশা। ছেলেকে নিয়ে

অনবরত নাড়াচাড়া, ঘড়ি ধরে তিনঘণ্টা অন্তর দুধ খাওয়ানো, তেল মাখানো, স্নান করানো, রংবেরংএর ফ্রক পরানো, সর্দি হ'লে নিজে নিজেই ডাক্তারি করা, রাতের পর রাত জাগা,—আমার তখন অনেক কাজ। এ ছাড়া আবার সংসারের কাজ তো আছেই।

অনেক সময় আমি সকল কাজ একসঙ্গে সামলে উঠতে পারিনা, ঠাকুরপোকে বলি,—ঠাকুরপো, ধরোনা একটু খোকাকে, দুধটা গরম ক'রে আনি। ঠাকুরপো নিতান্ত আনাড়ির মতো তাকে কোলে নিয়ে ভুলিয়ে রাখবার অনেক চেষ্টা করে। হাতটা ধরে জোর ক'রে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে,—বাঃ বাঃ, কী সুন্দর হাত ঘোরাচ্ছে! হাত ঘুরোলে নাড়ু দেবো,—ঘোরা ঘোরা, এমনি ক'রে হাতটা ঘোরা। ভয় পেয়ে খোকা আরো তারস্বরে কেঁদে ওঠে। আমি তখন ছুটে গিয়ে খোকাকে তাব কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বলি,—থাক থাক ঢের হয়েছে, ছেলে ভোলাবার মুরদ নেই, আছে কেবল বাক্যিব বড়াই। বলা বাহুল্য এটা আমাব দিদিমার ভাষা।

এই সব নিয়ে কিছুকাল বেশ একরকম কাটিয়ে দিচ্ছিলুম, এমন সময় আমার স্বামী ফিরলেন বিলাত থেকে। ব্যারিস্টারী পাস করে এসেছেন।

এবার আমার মন অনেকটা প্রস্তুত হ'য়ে উঠেছিল। যেটুকু গ্লানি জমেছিল সেটুকু অনেক দিনেব অদর্শনে মুছে গিয়েছিল। চেষ্টার ফলেই হোক আর যে জন্যেই হোক স্বামীর প্রতি একটু মোহ জন্মেছিল। এবার ওঁর চেহারাটাও একটু ফিরেছে, বিলাত ঘুরে এসে রুচিটাও হয়তো একটু বদলেছে, প্রথম কিছুদিন আমার বেশ ভালোই লাগলো। আমি খুশি হলুম, মনে করলুম আরো আমার ওঁকে ভালোই লাগতে থাকুক। নিজের থেকে অনেকটা অগ্রসর হ'য়েও গেলুম, কিন্তু যেমন ভাবে আমি নিজেকে দিতে গেলুম তেমন ভাবে তিনি কিছুতেই আমাকে নিতে পারলেন না। আবার শুরু হলো সেই পূর্ব-ব্যবহার। আমার মন উঠলো বিদ্রোহী হ'য়ে, নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আমাকে আবার ফিরে আসতে হলো।

শুধু পূর্ব-ব্যবহারগুলো হ'লেও একরকম মানিয়ে নিতুম, কিন্তু আমাকে তিনি সন্দেহ করতেও শুরু করলেন। সুরেন ঠাকুরপোর সঙ্গে কেন এত মিশি, তার ঘরে গিয়ে কেন এতক্ষণ গল্প করি,—এতই কিসের আলোচনা, এতই কিসের ঘনিষ্ঠতা? কেন ওঁর সঙ্গে বসেও ঐ রকম গল্প করিনা? এদিকে ওঁর কাছে যাওয়াও এক মুশকিল, যতক্ষণ উনি ঘরে থাকবেন ততক্ষণ ওঁর মা ওঁকে বরাবর আগলে আগলে থাকবেন। সেখানে যাওয়াও যায় না, আর গেলেও কিছু কথা বলা যায় না। ওঁর সঙ্গে কথা বলার সময় কেবল রাত্রে। কিন্তু তখন আমার ঘুম পায়, কিংবা খোকা জেগে ওঠে।

একদিন সন্ধ্যার সময় স্বামী আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি ছিলুম ঠাকুরপোর কাছে, বললুম যাচ্ছি। একটা কথা নিয়ে আমাদের তর্ক হচ্ছিল, সেটা শেষ ক'রে যেতে অল্প একটু বিলম্ব হলো।

উনি বললেন,—তোমায় আমি ডাকলুম, আসতে এত দেরী করলে কেন?

—ঠাকুরপো একটা কথা বলছিল, সেটা শুনে তবে তো আসবো।

উনি বললেন,—ওর সঙ্গে তোমার এতই প্রণয়?

আমার রাগ হ'য়ে গেল। বললুম,—তাই যদি হয়, তুমি কি আটকাতে পারবে?

—ও-সব বজ্জাতি এখানে চলবে না। আমি ঢের দেখেছি তোমার মতো বাঙালীর মেয়ে। বিলেতের মেয়েরা তোমাদের চেয়ে ঢের ভালো, তারা কখনো তোমাদের মতো একজন ছেড়ে দুজনের মন ভোলাতে যায় না।

—ছি ছি, কী বলছো তুমি? কিছু কাণ্ডজ্ঞান নেই তোমার?

—আমি ঠিকই বলছি। আজ থেকে ওর কাছে আর যেতে পাবেনা। গেলেই অপমান হবে, মেয়েমানুষ ব'লে কোনো খাতির করবো না।

এবার রাগ সামলাতে পারলুম না। প্রেম নেই প্রভুত্ব আছে, সে কতক্ষণ সহ্য করা যায়? আমি বললুম,—এখনই আমি যাচ্ছি, দেখি কী করতে পারো। ঘরে ছিল একটা ছড়ি। উনি সেইটে হাতে নিয়ে দরজা আড়াল

ক'রে দাঁড়ালেন। আমি প্রাণপণ জোরে ছড়িটা ওঁর হাত থেকে কেড়ে নিলুম। হঠাৎ চেয়ে দেখলুম—ওঁর চোখে একটা তীব্র হিংসার দৃষ্টি। দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে জেগে উঠলো একটা বিজাতীয় ঘৃণা। মনে হলো কে এই মানুষটি, কার সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দিয়েছিলেন? এ তো আমার আপন কেউ নয়, এ নিতান্তই একজন পর। এই পরের সঙ্গে আমাকে আজীবন বাস করতে হবে?

অবশ্য এই রাগারাগিটা কয়েকদিন পরে মিটে গেল। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া শেষ পর্যন্ত মিটেই যায়, কারণ মিটিয়ে নেবার প্রয়োজন হয়। এর পরেও আবার আমি হাসতুম, গল্প করতুম, মানিয়ে নিয়ে চলতুম। কেবল এক একদিন ওঁর গাত্রস্পর্শ লাগলেই কেমন গা ঘিন্‌ঘিন্‌ ক'রে উঠতো,—যদিও সেটা আমি ওঁকে জানতে দিতুম না, নিজের মনের জোরে নিজেকে তৎক্ষণাৎ অসাড় ক'রে নিতুম। তারপরে আর কিছুই বিকার ঘটতো না। চেষ্টা করলে মানুষ কী না বরদাস্ত করতে পারে?

তবু কখনো কখনো বিদ্রোহ ক'রে উঠতুম বৈকি। আমি চিরকালই বদমাইশ মেয়ে, ভালো মেয়েদের মতো মোটেই নই। তাদের মতন ক'রে মনোবৃত্তিকে নিঃশেষে চুকিয়ে দিয়ে নিতান্ত ভালোমানুষ সাজতে আমি পারিনে। চেপে রাখবার জিনিসটা বেমালুম চেপে রাখতে পারিনে, দরজা একটু আল্গা পেলেই সেটা ঠেলে বেরিয়ে আসে। সেই ছেলেবেলাকার দুষ্টুমি, সেই বাক্যের কামড় দেওয়া, সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা, সেটা কখনো কখনো জানান দেয়। তখন ভাবে ভঙ্গীতে এই কথাগুলোই আমার ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে যে স্বামীপুত্র নিয়ে ঘর করছি বটে, স্বামীর নির্যাতন সহ্য ক'রেও তাঁর বাধ্য হ'য়ে থাকছি বটে, সভ্যতার সব আইনকানুনগুলো যথাযথ পালন ক'রে চলছি বটে, ভদ্রঘরের স্ত্রীর উপযোগী ক'রেই নিজেকে লোকসমাজে প্রকাশ করছি বটে,—কিন্তু তবু এইটুকু নিয়ে আমার পোষাচ্ছে না। এ ছাড়াও আমার আরো কিছু চাই। আমার ভেতরে রয়েছে মরুভূমির তৃষ্ণা, ভেতরে রয়েছে খাণ্ডবদাহের জ্বালা,—

তাকে মেটাবার জন্যে আমার আরো কিছু চাই। এই আরো-কিছু-চাওয়ার কথাটা অনেক সময় বেরিয়ে পড়তো হয়তো আমার চোখের জ্বালার ভিতর দিয়েই।

অনেক সময় এ-কথাও মনে এসেছে যে স্বরেন ঠাকুরপো কি আমার সে তৃষ্ণা মেটাতে পাবেনা? কিন্তু আমার ভাগ্য ভালো, তখনি একটা ভ্রাতৃস্নেহের ভাব জেগে উঠে সে কথাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সত্যের কিছুই আমি লুকোতে চাইনা, তাই এটুকুও বললুম।

কিছুটা কাল ধরে আমার এমনি একটা জ্বালার যুগ চলেছিল। তারপরে এমন এক প্রবল শোকের আঘাত পেলুম যাতে আমার সমস্ত জ্বালাকে ডুবিয়ে দিলে। অকস্মাৎ আমার বাবার মৃত্যু হলো। তিন দিনের জ্বরে তিনি এমন অজ্ঞান হ'য়ে গেলেন যে কেউ আর তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে পারলে না। আমি ছুটে গেলুম বাবাকে দেখতে, গায়ে পড়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে অনেক ডাকাডাকি করলুম, তিনি একটিবার মাত্র রক্তবর্ণ চোখ মেলে আমার দিকে চেয়েই সেই যে চোখ বুজলেন, আর সে চোখ খুললেন না। চিনতে পেরেছিলেন কিনা তাও জানিনা। একটু সেবাযত্নও করতে পেলুম না, সেই দিনই তিনি চলে গেলেন। আমার বাবা যে আমার কাছে কী ছিলেন সে কথা কেউ বুঝবে না। আমি বিয়ের পর থেকে একেই অসাড় হ'যে গিয়েছিলুম, বাবার মৃত্যুর পরে আরো অসাড় হ'য়ে গেলুম। এর পরে কোনো কিছুর আঘাতই আর আমার গায়ে লাগতো না। আমার বাবাই যখন নেই তখন আর ভরসাও কিছু নেই।

লুকিয়ে লুকিয়ে আমি কাঁদতুম। সেটা আর কেউ টের পেতোনা, কেবল ঐ স্বরেন ঠাকুরপো কেমন ক'রে জানতে পারতো। অগোচরে কখন আমার পিছনে এসে হাজির হতো। বলতো,—আবার তুমি কাঁদছ বৌদি? না না, ওটা ঠিক হচ্ছেনা। তুমি তো নিজেই বলেছ যে আঘাত পেয়ে যারা কাঁদে তারা খুব সামান্য দরের মানুষ। তুমি কী তাই?

আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে বলতুম,—কৈ আর কাঁদিনি তো।

দুঃখে সহানুভূতি যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই মনটা একটু বেশি রকম ঝুঁকে পড়ে। বাবা চলে গেলেন, আমার মুখের দিকে চাইবার আর কে রইল? আমার মন যে সারাক্ষণ ধরে কাঁদছে তা আর কেউ দেখতে পায়না, ঐ স্থরেন ঠাকুরপো তবু একটু তার খোঁজ খবর রাখে। সেও যেমন আমাকে বুঝেচে, আমিও তেমনি তাকে একটু ভালো ক'রে বুঝতে চেষ্টা করি।

আমার কাছে সব কথাই সে খোলাখুলি বলে, কোনো কথাই লুকিয়ে রাখে না,—কিন্তু তবু এবার ক্রমশ ক্রমশ দেখলুম একটা কেমন যেন দ্বিধার ভাব। কিসের এই দ্বিধা? মাঝে মাঝে মনে হয় তার সহানুভূতির মধ্যেও যেন একটু অন্য কথা আছে। চোখের দৃষ্টিটা মাঝে মাঝে যেন কেমনতরো, যেন আমার মধ্যে কী একটা খোরাক খুঁজছে। এটা মনে হ'লেই আমার আবার তেমনি গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে, যেমন হয় ওর দাদার কাছে। হঠাৎ মনে হয়, দাদা আর ভাই কী একই ধাতুতে গড়া? ওর কথাগুলোও বেশ চমৎকার, ওর যুক্তিতর্কগুলোও বেশ সুন্দর। তবে আমি জেনেছি কিনা, নিজের যুক্তিকেও মানুষ নিজের বেলায় কাজে লাগাতে পারেনা, কাজে লাগায় আপন স্বভাবকে।

কিন্তু আমি যা চাই এ তো সে-জিনিস নয়। তাড়াতাড়ি এটা আমি কাটিয়ে দিতে চাই। আমি সর্বদা লক্ষ্য করতে থাকি, একটু কিছু সন্দেহের আভাস দেখলেই আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন একটা প্রসঙ্গ এনে ফেলি—হয় সাহিত্য না হয় কাব্য—যাতে সে ঝগড়া করবার জন্যে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে, ওটা আপাতত ভুলে যায়। ঠাকুরপোর সাহচর্য আমি ছাড়তে পারিনা, ওকে আমার নিতান্ত দরকার, কিন্তু ঐ দিকটা বাদ দিয়ে।

তারপরে আমি ভেবে দেখলুম যে এর একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। ছুঁই-ছুঁই মনোভাবকে ও লুকিয়ে রাখবে, আর আমার অস্পৃশ্যতাকে আমিও বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলবো, এতে বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ন হয়। একদিন স্পষ্ট ক'রেই

বললুম,—দেখ ঠাকুরপো একটা কথা বলি। কিছু মনে করোনা, তোমাদের পুরুষমানুষদের স্বভাবটা আমি বুঝতে পেরেছি, তাই বলছি। মাংসের লোভ করাটা তোমাদের দোষ নয়, ওটা তোমাদের স্বভাবেরই মধ্যে। নিরামিষ তোমাদের চলেনা। তাই বলছি, হয় তুমি বিয়ে করো, নইলে একটা অন্য ব্যবস্থা করো। তা হ'লে আর তোমায় নিজের মনের সঙ্গেও লুকোচুরি করতে হয়না, আমার সঙ্গেও লুকোচুরি করতে হয়না। এতে তোমার লাভটা কী হচ্ছে? তুমি নিজেই একদিন বলেছিলে না, মাংসের গন্ধ লাগলে বন্ধুত্ব উড়ে যায়?

ঠাকুরপো গম্ভীর হ'যে গেল, আমার কথার জবাব দিলেনা।

তখন আমার বয়সও খানিকটা হয়েছে, আর অনবরত ঘা খেয়ে খেয়ে বুদ্ধিতেও অনেকটা এগিয়েছি। পুরুষ চিনতে আমার দেরী হয়না। ইদানিং অনেক পুরুষের সঙ্গে মিশতে হয়েছে,—দেখতে পাই তারা হরেক রকমের। কেউবা দেখতে অতি কদাকার কিন্তু সেজন্যে কিছুমাত্র বিনয় নেই, কেউবা দেখতে ভালো কিন্তু আপন রূপের মদগর্বেই বিভোর, কেউবা অত্যন্ত বাজে বকে এবং অনবরত মিথ্যা বলে, কেউবা মুখের ভাষায় অতি ভদ্র কিন্তু চোখের ভাষায় অতি ইতর,—চোখের দিকে মোটে চাওয়া যায়না। কেউ কেউ আবার পুরুষই নয়, নিতান্তই নারী,—তাদের দেখলেই আমার হাসি পায়। কারো কারো গায়ে এমন গন্ধ যে কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় না, দূরে সরে গিয়ে কথা বলতে হয়। অনেক রকমের পুরুষ দেখলুম। আমার স্বামীর অনেক বন্ধু এবং বড়লোক মক্কেল আসেন আমাদের বাড়িতে, ভদ্রতার খাতিরে তাঁদের সঙ্গে আমাকে মেলামেশা করতে হয়েছে। স্বামীর ইচ্ছায় এই স্বাধীনতাটুকু আমাকে লোকসমাজে দেখাতে হয়েছিল। তাইতে ক'রে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেকের পরিচয় আমি পেয়েছি। মনে মনে ভাবতুম, এদের স্ত্রীরা এদের সহ্য করে কেমন ক'রে? কী আর করবে বেচারিরা, এদের নিয়ে সংসার চালানোই যখন তাদের একমাত্র কারবার।

ঠাকুরপোর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সে অন্তত এই সব লোকের চেয়ে অনেক ভালো। সামান্য যা একটু ত্রুটি হয়েছে বয়সের গতিকে, কিন্তু ও কিছু নয়। রাগ করে ঠাকুরপো আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করলে, তাই দেখে আমার মায়া হলো। দুএকবার চেষ্টা করলুম রাগ ভাঙাতে, তাতে কোনো ফল হলো না। তখন ভাবলুম রাগটা দিনকতক থাকাই ভালো, এর পরে আপনিই ও সহজ হ'য়ে ফিরে আসবে আমার কাছে। কিন্তু অপাতত ওর সঙ্গে কথা বলতে না পেয়ে কষ্টে আমার দিন কাটতে লাগলো।

একে বাবার মৃত্যুর শোকটা তখনো সম্পূর্ণ মেটেনি, তাতে আবার এই নিঃসঙ্গতা। আমার মনটাও তাই খারাপ যাচ্ছিল। এর ওপরে আবার সংসারের কাজও খানিকটা বেড়ে গেল। রান্নাঘরের ঝি ক'দিন থেকে কামাই করছিল, তার কাজটা আমাকে চালিয়ে নিতে হচ্ছিল। রান্নাঘর থেকে আমাদের কলতলা খানিকটা দূরে, সেখান থেকে রোজ রান্নার জল ভরে নিয়ে যেতে হয় কলসীতে। একদিন ভরা কলসী নিয়ে যেতে যেতে আমি পা পিছলে পড়ে গেলুম। পেটে একটা দারুণ আঘাত লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লুম। সেই থেকে আমার মূর্চ্ছা রোগের শুরু হলো। প্রায় প্রত্যহই ঘন ঘন মূর্চ্ছা যেতে লাগলুম।

মা এলেন, দিদিবা এলো, দাদাও রোজ এসে খবর নিতে লাগলো, সবাই মহা ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। ঠাকুরপো ভাবলে তার জন্যেই হয়তো এটা হয়েছে, একান্ত অনুতপ্ত হ'য়ে সে অনেকবার এসে আমার ক্ষমা চাইলে, কাছে বসে অনেক সেবা করতে লাগলো। আমার স্বামীও ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, নিজে গিয়ে তাঁর একজন ডাক্তার বন্ধুকে ডেকে আনলেন।

যথারীতি চিকিৎসা হতে লাগলো। কিছুদিনের মধ্যেই আমি সেরে উঠলুম, কিন্তু সে ঠিক চিকিৎসার গুণে নয়। মূর্চ্ছারোগ হওয়া আর হেঁচকি ওঠা বোধহয় কতকটা একই জাতের ব্যাপার,—একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঠাণ্ডাজল দিয়ে বা অন্য উপায়ে অন্যমনস্ক না করা যায় ততক্ষণ

চলতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ঠাণ্ডাজল নয়, কিন্তু এমন একটা অদ্ভুত জিনিস আমি আবিষ্কার করলুম যাতে একেবারে অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলুম।

পুরুষদের সম্বন্ধে আমার অভিমতটা আমি একটু আগেই বলছিলুম না? পুরুষমানুষ কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেই আমি বলে দিতে পারি,—মাথায় অনেকটা লম্বা হবে, মেরুদণ্ড সোজা ক'রে দাঁড়াবে,—ভেতরে থাকবে প্রচণ্ড তেজ, বাইরে থাকবে সৌম্য দৃষ্টি,—উঁচুদরের বিলাস থাকবে কিন্তু নিচুদরের ছ্যাবলামি থাকবে না। বাবা নেই, আর তেমন মনের মতো পুরুষ একটিও দেখতে পাবোনা। কালে কালে সবই বদলে যাচ্ছে। আজ-কালকার কাউকে যেন পছন্দই হয় না। আমার স্বামী যিনি হয়েছেন তিনি আমার পুরুষ আদর্শের ঠিক উল্টো। বাইরেই খুব তেজ দেখান, কিন্তু ভেতরে অনেক দুর্বলতা। দেওরটিকে আমার এক হিসেবে পছন্দ বটে কিন্তু তাকে তো আমি পুরুষ ভাবতে পারি না, সে যেন আমার দাদার মতো, প্রায় আমারই সমবয়সী।

কিন্তু এ প্রশ্ন এখানে এলো কেন? ঐ যে ডাক্তারটিকে দেখলুম, বেশ নিখুঁত পুরুষটি। আমার আদর্শের সঙ্গে অনেকটা মিলে গেল। ওঁকে দেখেই আমার বাবার কথা মনে পড়লো, বাবার জন্যে মন কেমন ক'রে উঠলো।

লম্বা চওড়া চেহারা, পিঠের মেরুদণ্ড বেশ সোজা, গায়ের রংটাও বেশ ফর্শা। আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো, কিন্তু তবু মুখখানি এখনো খুব নবম, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পেকে যায়নি। ঠোঁট দুটি বড়ো মজার, দুবার একরকম দেখায় না। সেই ঠোঁটে সিগারেট চেপে ধরে যখন উনি কথা বলেন তখন দেখা যায় আরো সুন্দর। টানা টানা চোখ দুটি যেন একটু বিষণ্ণ। স্নিগ্ধ চাউনিটা যেন কাছের জিনিস দেখতে দেখতেই অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায়। মাথার চুল সুবিন্যস্ত, কিন্তু ব্রাস করা সত্ত্বেও খানিকটা চুল অবাধ্য হ'য়ে একটা পাক খেয়ে নেমে আসে।

আর,—সব চেয়ে সুন্দর হাত দুখানি। সে হাতের বর্ণনা আমি কেমন ক'রে দিই? একটি মাত্র বিশেষণ আমার মনে আসে, যদিও এখানে সেটা খাটবে কিনা

জানিনা। আমি বলবো,—হাত দুটি সুকুমার। এর চেয়ে বেশি কিছু বলবার দরকার নেই। দেখলেই মনে হয় একবারটি ধরি। আঙুলগুলির গড়ন আরো চমৎকার। গ্রীক দেবতাদের প্রস্তরমূর্তির ছবি দেখেছি, তাদের আঙুলের গড়ন ঠিক এমনি। সেই আঙুল দিয়ে যখন কোনো কাজ করেন, কিছু লেখেন, তখন দেখা যায় তার অদ্ভুত সৌকুমার্য আর অপূর্ব ছন্দ। আঙুলের গড়ন দেখে মানুষের মনের গড়ন বোঝা যায় একথা আমি বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি।

গলার স্বরটাও সুমিষ্ট আর সুগম্ভীর,—কিন্তু কথাগুলো মাঝে মাঝে কর্কশ কেন? কেমন যেন একটা বিদ্রূপ আর তাচ্ছিল্য ওর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

সেদিন ঠাকুরপো আমার কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। মূর্চ্ছাটা সবেমাত্র ভেঙেছে, একটু জল খেয়ে নিতান্ত অবসন্ন হয়ে আমি চোখ বুজে শুয়ে আছি, সেই সময় উনি এসে আমার বিছানার পাশে বসলেন, নাড়ী ধরে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

আরো যে কী কী তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন তা আমি ঠিক জানিনা, অল্পক্ষণ পরেই তাঁর গলার ভারী আওয়াজটা আমার কানে এলো। তিনি বললেন—নাড়ী খুব ভালই চলেছে। বিশেষ কিছুই নয়, হিষ্টিরিয়া। কিন্তু সুরেন তো বেশ ভালো ছেলে দেখছি, কাছে বসে কেমন সেবাটি করছে। দুজনে খুব ভাব হয়েছে বুঝি?

আমার স্বামী বললেন,—ঠিক বলেছো, একেবারে অন্তরঙ্গ ভাব। আমার সঙ্গে আর কতটুকু সম্পর্ক বলো, আমি তো থাকি বাইরে বাইরে। মনের কথা যত কিছু হয় ওরই সঙ্গে। এই অসুখের মধ্যেও দেখনা, আমি যদি একটু ওষুধ খাওয়াতে যাই তাহ'লেই মহা মুশকিল হ'য়ে যাবে। কিন্তু সুরেন ওষুধ খাওয়ালে আর কোনোই আপত্তি নেই, তখনই ঢক্ ক'রে খেয়ে ফেলবে।

উনি বললেন—এ রোগে ওষুধের তো বিশেষ দরকার নেই, আসলে ঐটুকুই ওঁর দরকার। সেবা পাবার জন্যেই মেয়েদের এই রোগটা জন্মায়, পছন্দসই হাতের সেবা পেলেই সেরে যায়। দেওরের হাতের সেবাযত্ন যখন এত পাচ্ছেন

তখন তোমাকে আর বিশেষ কিছুই করতে হবেনা, ওতেই উনি সেরে উঠবেন।

কথাটা খট্ ক'রে আমার কানে লাগলো। এমন কথা উনি কেন বললেন? অকস্মাৎ কেন এই অহেতুক বিদ্রূপ? এমন চমৎকার মানুষটি, তাঁর মুখে এমন হৃদয়হীনের মতো কথা কেন? আমি কি মানুষ চিনতে ভুল করলুম?

রোগ থেকে তাড়াতাড়ি আমায় সেরে উঠতে হবে, মানুষটিকে ভালো ক'রে চিনতে হবে। একবার ভুল হ'তে পারে, বারে বারে ভুল করা চলবে না।

কিন্তু বারেবারেই আমার ভুল হ'তে লাগলো। কাছে গিয়ে আলাপ করতে অনেকবার লোভ হয়েছে, তবু ইচ্ছা ক'রেই আমি কাছে এগিয়ে যাইনি, বরাবর দূর থেকেই দেখতুম। রবীন্দ্রনাথ বলতেন,—ছবি বুঝতে হ'লে আগে একটু দূর থেকে দেখা উচিত, আর দেখবার পরেও কিছুক্ষণ তাই নিয়ে চিন্তা করা উচিত। আমিও সেই কথাই বলি। খুব কাছে গিয়ে নতুন মানুষকে তেমন চেনা যায়না, যেমন চেনা যায় একটু দূর থেকে।

মানুষটিকে বিভিন্ন সময়ে দেখতুম বিভিন্ন রকমের। এ কী প্রহেলিকা?

তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমি লক্ষ্য ক'রে গেছি। কী সুন্দর রূপ, কী হাসি হাসি মুখ, কী অমায়িক ব্যবহার! কোনো কাজে ক্লান্তি নেই, কোনো কথাতেই বিরক্তি নেই, যেন জলের মতো সহজ মানুষটি। দেখলে মনে হয় জীবনে কোনো দুঃখ পাননি, সুখেই জীবনটা কেটে যাচ্ছে। অনায়াসে এঁর কাছে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে, নির্ভয়ে এঁর ওপর নির্ভর করা যেতে পারে।

মনে করি, এবার একটু কাছে এগিয়ে দেখি। যাবো যাবো ভাবছি, হঠাৎ দেখতে পাই একেবারে অন্য মূর্তি। এ যেন এক স্বতন্ত্র মানুষ, আগের মানুষটির সঙ্গে কোনো মিল নেই। মুখখানা তখন সর্বদাই গম্ভীর, অন্যমনস্ক। কারো কথাই কানে যায় না, কোনো দিকেই ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করানো যায়না। সকলের মাঝখানে বসে কথা বলচেন কিন্তু সকলের থেকেই অনেক দূরে সরে গেছেন। আমার শ্বশুর যখন কোনো প্রশ্ন করছেন, তার জবাব উনি দিচ্ছেন, নিতান্ত

সংক্ষিপ্ত, এলোমেলো। আমার স্বামী কোনো প্রশ্ন করছেন, তার জবাবটা দিচ্ছে এমনই কাঠ-কাঠ রূঢ় ভাষায় যে শুনলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। তখন মনে হ এই রূঢ়ভাষী নীরস অভদ্র মানুষটি, এ কী সেই মানুষ? কিছুকাল এমনিভাবে দেখি, আবার দেখতে দেখতে ফিরে আসে আগেকার সেই সরল পরিচয়।

বুঝতে অনেক চেষ্টা করি, ওঁকে কিছুতেই বুঝতে পারিনা। যতই প্রহেলিব ঠেকে ততই আমার জানবার কৌতূহল আরো বেড়ে যায়।

নানারকম ভাবেই আমি ওঁকে যাচাই করে দেখি। খোকার অসুখ হ দু-তিন বার। স্বামীকে বলে আমি প্রত্যেক বারেই ওঁর ওপরে চিকিৎসার ভা দিলুম। দেখলুম একবার ভার দিলে আর ওঁকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজ হতোনা, উনি নিজেই আসতেন, যত্ন ক'রে দেখতেন, এবং নির্ভুল চিকিৎসা আরোগ্য ক'রে তুলতেন। চিকিৎসা করতে বেশ ভালোই জানেন, এট স্বীকার করতে হবে। কর্তব্যে যেটুকু নিষ্ঠা থাকা উচিত তা আছে, দায়িত্বজ্ঞান আছে। সুরেন ঠাকুরপো ওঁকে প্রশ্ন করে ডাক্তারি সম্বন্ধে, উনি অনেক ব্যাখ্য ক'রে তাকে বুঝিয়ে দেন। বুঝিয়ে দেবার ধৈর্যটুকুও আছে। স্ত্রীলোকের দিবে দৃষ্টিপাত সম্বন্ধে পুরুষলোকের যেটুকু দুর্বলতা অত্যন্ত সাধারণ, ওঁর তাও দেখি খুব কম। আমিই ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি, আমার মুখের দিকে উনি খু কমই চান। যেচে কথা বলতে আসা তো দূরের কথা, আমার সঙ্গে ওঁর যেন কোনো সম্পর্কই নেই। বন্ধুর কাছে আসেন, বন্ধুর সঙ্গেই কথা বলেন। ঘরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি আমি উপস্থিত থাকলেও উনি হয়তো সাব্যস্ত ক'রে নেন যেন কেউ নেই। কিন্তু তাই ব'লে ভদ্রতার কোনো অভাব হয় না। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখলেই তখন উনি উঠে দাঁড়াতেন, চা দিতে গেলে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে পিরিচ-পেয়ালা হাত থেকে নিয়ে নিতেন, বিদায় নেবার সময় হাত তুলে আমাকে নমস্কার করতেন। এই সব সৌজন্যের কিছুমাত্র ত্রুটি নেই।

খোঁজ নিতে লাগলুম ওঁর সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কিন্তু অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে। প্রথম জীবনে পশ্চিমে মানুষ হয়েছেন। কলেজের ছেলেদের অ্যানাটমি শেখান। বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। স্ত্রী খুব সুন্দরী। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হয়েছে। ছেলেটি বড়ো, মেয়েটি ছোটো। সংসারে মা আছেন, ঠাকুমা আছেন, জ্ঞাতি ভাইরা আছে। প্রত্যেক সপ্তাহে দেশে যান, আবার কখনো কখনো দু'তিন সপ্তাহ একেবারেই যান না। মেসে থাকেন একটি স্বতন্ত্র ঘর নিয়ে। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হয়, মাঝে মাঝে হোটেলে গিয়ে খান। প্রায়ই সিনেমা দেখেন। খেলা দেখার খুব শখ, নিজেও কলেজের ছেলেদের সঙ্গে খেলেন। কলেজের ছেলেরা ওঁকে খুব পছন্দ করে।

আমার স্বামী বললেন,—আড়াল থেকে তোমার এত পরিচয় নেবার কী দরকার, তুমি নিজেই ওর সঙ্গে কথা বলো না কেন? এদিকে তো আমার বন্ধুদের সঙ্গে আর অনেক বাজে লোকের সঙ্গেও বেশ কথা বলো। আর ও হলো আমার বাল্যবন্ধু, ওর সঙ্গে কথা বলতেই যত লজ্জা?

আমি বললুম,—লোকের গায়ে পড়ে কথা বলতে যাবো নাকি? অন্য লোকদের সঙ্গে কথা বলি, সে তোমার কাজের খাতিরে। কিন্তু ওঁর সঙ্গে তো আমার কিছু পরিচয় নেই। তুমি বরং এক কাজ করো। ওঁর স্ত্রীকে একদিন নেমন্তন্ন ক'রে এখানে আনাও, তার সঙ্গে একবার ভাব ক'রে নিলে তখন ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বাধবেনা। এ বাড়িতে ওঁর স্ত্রী কখনো তো আসেন নি, একদিন আনাও না।

আমার স্বামী এতে রাজি হলেন। বন্ধুকে ব'লে ক'য়ে একদিন তাঁর স্ত্রীকে আর ছেলেমেয়েকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা হলো আমাদের বাড়িতে। আমার শ্বশুর-শাশুড়ী খুব অভ্যর্থনা করলেন তাদের, দুদিন বাড়িতে রেখে যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করলেন।

দেখলুম ওঁর স্ত্রীকে। সুন্দরী বটে। উনি যে স্ত্রীর খুব বাধ্য, সে যখনই যা চাইছে তখনই তাই পাচ্ছে, তাও দেখলুম। নামটি শুনলুম চম্পারানী। দেখতে

শুনতে সবই ভালো, কিন্তু তবু এদিকে এমন বিশেষ কিছু শিক্ষিতা ন
সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের ঘরে যেমন হয় তাই। রূপের গর্বটুকু যথেষ্টই আছে, ম
করে যে স্বামী সে জন্যে তার বাধ্য হ'য়ে থাকতে অবশ্যই বাধ্য। স্বামীও
এটুকু স্বীকার ক'রে নিয়ে তাঁর কর্তব্যগুলো নির্বিবাদে পালন ক'রে যাচ্ছে
অবশ্য অল্প সময়ের মধ্যে এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায় না, কিন্তু স্বামী-স্ত্
সম্পর্কে এইটুকুই কী যথেষ্ট ?

ওঁর স্ত্রীকে দেখে আমি তেমন খুশি হলুম না, কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটিকে দে
খুবই খুশি হলুম। চমৎকার দেখতে, আদর করতে ইচ্ছে হয়।

ওরা আসার পর থেকে আমি অল্প অল্প ক'রে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে শু
করলুম। ইদানিং আমার শাশুড়ীর ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর হচ্ছিল, কয়েকদিন প্রায়
ওঁকে আসতে হচ্ছিল। কথা বলতে যখন শুরু করেছি তখন অনেক কথা
বলতে লাগলুম। উনিও আমার কাছে বসে অনেক গল্প করতেন। কেব
মাঝে মাঝে কেমন বিগ্‌ড়ে যেতেন, তখন কথা অসমাপ্ত রেখেই হঠাৎ উ
চলে যেতেন। বলতেন,—আমার কাজ আছে। আমিও সহজে তাঁকে ছাড়
চাইতুম না, নানা ছুতোনাতায় আরো কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখবার চেষ্টা করতুম
কখনো কৃতকার্য হতুম, কখনো হতুম না।

শাশুড়ীর জ্বর বন্ধ হলো, ওঁর আসাযাওয়াও বন্ধ হলো। আমি অস্থি
হ'য়ে উঠলুম, এ কেমন ক'রে চলবে ? ওঁকে একদিন মিথ্যামিথ্যাই ডেকে
পাঠিয়ে বললুম,—খোকার শরীরটা বড়ো খারাপ হচ্ছে, আজকাল কিছু খেতে
পারছে না। ওকে মাঝে মাঝে দেখা দরকার, একবার দেখে ফাঁকি দিয়ে গেলে
চলবে না। প্রত্যেক সপ্তাহে অন্তত একবার এসে দেখা চাই। উনি হাসলেন
কিন্তু আসতে স্বীকার হলেন।

অনেক রকম ভাবে ওঁর অনেক রকমের পরিচয় পেতে লাগলুম। আমি
প্রথমেই যা দেখেছিলুম সে দেখা আমার কখনই ভুল নয়। ওঁকে
আমার কেন এত ভালো লাগলো তার অনেক যুক্তিযুক্ত কারণও ছিল। ভা

লাগার কোনো হেতু থাকে না, কিন্তু ওঁর মধ্যে অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখলুম। যতই ভিতরে প্রবেশ করি ততই ওঁর অসাধারণত্ব দেখতে পাই। মনটি প্রকৃতই উদার, সেখানে কিছুমাত্র সংকীর্ণতা নেই। কেবল নিজেকে নিয়েই থাকেন না, পরের প্রতিও ওঁর সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে। আমার কোথায় অভাব রয়েছে সেটুকু আপনা থেকেই কেমন করে বুঝতে পারেন, আমাকে বলে দিতে হয় না। কোন মর্মব্যথার স্থানে কোন অভয় বাক্যটি প্রয়োগ করলে আমার সান্ত্বনা হবে সে উনি বেশ জানেন, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটি বলেন। আমি আশ্চর্য হ'য়ে ভাবি, এত উনি জানলেন কেমন করে?

কেবল থেকে থেকে ওঁর সেই একটা রূঢ়তা এসে পড়ে, আমাকেও তখন উনি যেন সহ্য করতে পারেন না। আমি যে একজন ভদ্রমহিলা সে কথাও তখন মনে থাকে না। সম্ভবত ওঁর মনে কোথাও একটা ব্যথা আছে। কিংবা হয়তো এটুকু ওঁর স্বভাবের মধ্যে একটা খামখেয়ালির ব্যতিক্রম। কিন্তু ওতে কিছু যায় আসে না, নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। যে ওঁকে চিনতে পেরেছে তার ওটুকু তুচ্ছ ক'রে নেওয়া উচিত। আর যখন যাকে ভালো লাগতে শুরু হয় তখন তার ত্রুটিটাও বেশ ভালো লাগে।

ক্রমে ক্রমে যেন আমার মনের ভিতর একটা সূর্যোদয় হ'তে লাগলো, আর একটু একটু ক'রে আমি জেগে উঠতে লাগলুম। আমার সারাজীবনের ঘুমটা যেন এতকাল পরে ভাঙলো। আগে এতদিন কেবল স্বপ্নগুলোই দেখে আসছিলুম, —শুধু স্বপ্ন নয়, দুঃস্বপ্ন। মনে হলো দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে, এবার যা দেখছি তা সমস্তই সত্য। এখন থেকে চলল আমার জাগা চোখের সত্যিকার দেখা। এবার আমি আলো পেয়েছি, এতদিনে আমি পরিপূর্ণ প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠেছি।

ধীরে ধীরে ধীরে আমার ভালো লাগা ক্রমশই বেড়ে যেতে থাকলো। কবি বলেছেন, ভালো লাগা জিনিসটা ফুল ফোটার মতোই রমণীয়। যখন আমার ওঁকে এতই ভালো লাগতে লাগলো তখন আমি বুঝতে পারলুম এই মানুষটিই আমার আপনার লোক। প্রকৃত আপনার লোক বলতে কী বোঝায় তা সকলেই জানে,

ইনিই আমার সেই আপনার লোক। যাকে সহস্র চেষ্টাতেও কিছুতেই পর মনে করতে পারা যায় না,—আমার সেই নিতান্ত আপনাব লোক হচ্ছেন ইনি।

এই আশ্চর্য কথাটি বলতে আজ আমার কিছুই বাধছে না, কিন্তু এই সংবাদটিকে মনের মধ্যে স্বীকাব করে নিতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। কত সংস্কার, কত বাধাবিঘ্ন, কত বিচার বিবেচনা কাটিয়ে তবে তো এই কথাটি মনের মধ্যে নির্ভয়ে স্থান পেয়েছে! একজন অনাত্মীয়কে আমি বলতে পারছি আপনার লোক, এ কী খুব সহজ কথা? যার সঙ্গে বিবাহেব পরেও প্রায় এক যুগ কেটে গেল, যার ঘরে থেকে সন্তানকে জন্ম দিয়ে প্রত্যহ লালন পালন করছি, তাকে একদিনও এমনভাবে বলতে পারিনি আমার আপনার লোক। আর এই অপরিচিত মানুষটিকে কিছুকাল মাত্র দেখেই অনায়াসে তাই বলতে পারছি, এ কী খুব সহজ কথা? কিন্তু আমি তাব কী কবতে পারি, আমার মন যে এই কথাই বারবাব বলতে শুরু করলে। মনের কথা তড়িতের চেয়েও দ্রুতবেগে অনেক দূবে চলে যায়, বুদ্ধিবিচার কিছুই তাব সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা এলো—অতঃপব কী হবে? ভুল মানুষকে জোর করে আপনার লোক ভেবে এখনও চালিয়ে যেতে হবে, অথচ সত্যিকার আপনার লোকটি এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার আয়ত্তের বাইরে,—এই কী হবে আমার জীবনের ট্রাজেডি?

এ ট্রাজেডি আমি ঘটতে দেবো না। সমাজ-সংসার, স্বামী-সন্তান সকলেই পায়। তাই নিয়ে সকলেই জীবনটা বেশ একরকম কাটিয়ে দেয়। আমিও তাই নিয়েই একরকম ভাবে কাটিযে দিতুম, মনের ঘুমিয়ে পড়া ক্ষুধা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মরে যেতো, আমার বলবার কিছুই থাকতো না। মনের মতো আপনার লোক পাওয়া নিতান্তই ভাগ্যের কথা, হাজারের মধ্যে হয়তো দৈবাৎ একজন পেয়ে যায়, নিতান্তই দেবতার অনুগ্রহে। আমিও নিতান্তই দেবতার অনুগ্রহে সেই লোকটিকে যখন পেয়েছি তখন কিছুতেই আর ছাড়তে পারিনি। ছাড়া অসম্ভব।

কিন্তু ছাড়া যেমন অসম্ভব, পাওয়াও তেমনি অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন আছে—'যা না-চাইবার তাই আজি চাই গো, যা না-পাইবার তাই কোথা পাই গো'—আমারও ঠিক হলো সেই অবস্থা।

কিন্তু তাহ'লে? তাহ'লে কিছুই আমার করবার নেই, মন যেটুকুতে তৃপ্তি পায় সেইটুকুই সে কোনোমতে কুড়িয়ে বাড়িয়ে সঞ্চয় ক'রে নিক।

মন কী চায়? মন কেবলই চায় মনকে আকর্ষণ করতে৷ আর কিছুই তার কাজ নেই। যতই বাধা দেওয়া হোক, ওর আসল ভাবার্থটা এই,—আমি যেমন ওঁর প্রতি একাগ্র হ'য়ে উঠেছি, ওঁর মনটিও তেমনি আমার প্রতি একাগ্র হ'য়ে উঠুক। সংসারে ওঁর আপনার লোক অনেক আছে, ঘরে আছে সুন্দরী স্ত্রী, ওঁর অভাব কিছুই নেই। সে কথা আমার জানতে বাকি নেই। কিন্তু যেখানে যতই থাক, আমিই যে ওঁর সবচেয়ে বেশি আপনার লোক, আমার চেয়ে বেশি কেউই নয়, এই কথা জানুক ওঁর অন্তরাত্মা।

এই কী প্রেম? হাঁ, তা তো নিশ্চয়ই। সাধারণ ভালোবাসা আর প্রেমে যে কতখানি তফাৎ এবার আমি বুঝেছি। কতই ভালোবাসতুম বাবাকে আর দিদিমাকে, কতই ভালোবাসি আমার খোকাকে, স্বামীকেও যে ভালোবাসি না এ কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তাঁর আশ্রয়ে রয়েছি, আমার সমস্ত জীবনের ভার নিয়েছেন তিনি, কত স্নেহ করেন, একটু অসুখ-হ'লে কত ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন,—এতে কিছুটা ভালোবাসা তো আপনা থেকেই আসে। কিন্তু এই প্রেমের সঙ্গে সেই ভালোবাসার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই, কিছুমাত্র বিরোধও নেই, এ একেবারে অন্য ধরণের জিনিস। দিনে রাত্রে কাজে অকাজে কেবল ঐ একই কথা ভাবছি, ঐ একটিমাত্র মূর্তি সর্বদাই চোখের ওপর ভাসছে, এক মুহূর্তও আর মনের আড়াল হবার উপায় নেই।

এ সেই প্রেম, মীরাবাঈ যার কথা বলেছিলেন, বাবা যার কথা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এ-প্রেম না থাকলে ঐ নন্দলালাকে কিছুতেই মেলেনা, কিন্তু থাকলে অবশ্যই মেলে। পাথরকেও মেলে, মানুষকে মিলবে না?

বহুদিন এমনিভাবেই কেটে গেল, ওদিক থেকে কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ এলোনা। ব্যর্থ হলো বুঝি আমার আকর্ষণ। কেমন ক'রে কোন ভাষাতে কোন ভঙ্গীর দ্বারা বোঝাই আমার অন্তরাত্মা কী চাইছে ওঁর কাছে ? আমি যদি কোনো বাহ্যিক ভঙ্গীর দ্বারা কিছুমাত্র প্রকাশ করি যে আমি ওঁকে চাইছি, তাহ'লে উনি কী ভাববেন ? সে যে কোনো হীন বস্তুর কামনা নয়, সে যে কেবলমাত্র ওঁর মনের স্পর্শটুকু, এ কথা আমি কেমন ক'রে বোঝাব ? এ কথা কোনোমতে বোঝানো যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনা থেকে এ বিষয়ে চেতনা না জাগে। উনি কী এতদিনে একটুও বুঝতে পারলেন না ? ভালোবাসার সম্বন্ধে কিছুই কী উনি বোঝেন না ? ওঁর বোধ হয় কোনো প্রয়োজন-বোধ নেই, ওঁর অন্তরাত্মা সুষুপ্ত। তবুও আমি প্রার্থনা করতে থাকলুম,—জাগুক জাগুক ঐ মানুষটির অন্তরাত্মা, একবার আমাকে ডেকে বলুক,—এসো আমার কাছে। না ডাকলে আমি কেমন ক'রে এগিয়ে যাই ?

অমরনাথের কথা

সংসারের সঙ্গে সম্পর্কটা তখন খুবই কম, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কও একরকম ত্যাগ করেছিলাম। কারো বাড়িতে গিয়ে অনর্থক আড্ডা দিতে আমার ভালো লাগতো না। নিরিবিলিতে থাকাটাই আমি পছন্দ করতাম। তা ছাড়া সর্বদাই আমি ব্যস্ত থাকতাম—হয়তো আমার কাজ নিয়ে, নয়তো আমার বন্দুক নিয়ে, কুকুর নিয়ে, বই পড়া নিয়ে, বেড়ানো নিয়ে।

দিন কাটাবার উপায় যথেষ্ট রকমের আছে। দেশ থেকে ট্রেণে যাতায়াত করতে করতে প্রায়ই লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, ট্রেণযাত্রার সুদীর্ঘ সময়টা লোকে কেমন ক'রে কাটায়। ওর মধ্যে যারা কিছু একটা নিয়ে তন্ময় হ'য়ে থাকে তাদের সময়টা বেশ ভালো ভাবেই কাটে। কেউ ডিটেকটিভের উপন্যাস খুলে বসে, কেউবা খোশগল্পে মেতে ওঠে, কেউবা তাস খেলতে লেগে যায়, কেউবা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গানের পরে গান গেয়ে যায়। আবার কেউ হয়তো দিব্যি ঘুমিয়ে কাটায়, কিংবা বসে বসেই সারাক্ষণ তন্দ্রায় ঢুলতে থাকে। কিন্তু যারা কোনো কিছুতে তন্ময় হ'তেও পারেনা ঘুমোতেও পারেনা, তাদেরই হয় সকলের চেয়ে মুশকিল। তারা অনবরত ছট্‌ফট্ করে, আর হাই তোলে, আর বারেবারে ঘড়ি দেখে। সময় তাদের কাটতে চায়না। সময়টা কতক্ষণে কাটছে এটা নিজেকে কোনোমতে বুঝতে না-দেওয়াই সময় কাটাবার একমাত্র উপায়।

তবে জীবনের সময় অনেকটাই লম্বা, সেখানে তন্ময়তাকে বরাবর বজায় রাখা কঠিন। একটা বিষয় নিয়ে তন্ময়তা বেশিদিন সমানভাবে বজায় থাকতে পারেনা। - নতুন একটা বিষয় পেলেই প্রথমে আসে বেশ উৎসাহ, কিন্তু কিছুদিন পরেই এসে যায় অবসাদ। তখন আবার বিষয়বস্তুর একটা অদলবদল করবার

প্রয়োজন হয়। এমনিভাবেই কখনো এটা কখনো ওটা নিয়ে আমি ব্যস্ত হ'যে থাকতাম। তখন কি জানতাম যে আমার অলক্ষ্যে এমন একটি তন্ময় রাখবার সামগ্রী আমার জন্যে বাছাই হ'য়ে আছে যার বিষয় এতাবৎ কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি!

যোগেনদের বাড়িতে যাওয়া অনেক কাল থেকেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। শুনেছি বটে যে সে বিলেত থেকে পাস ক'রে এসে এখানকার আদালতে প্র্যাক্‌টিস করছে, আজকাল নাকি তার খানিকটা পসারও জমেছে। অনেকবার ভেবেছি যে তার সঙ্গে অন্তত একবার দেখাটা ক'রে আসা উচিত। কিন্তু তারপরে যাওয়া আর ঘটে ওঠেনি। সময়ও কম, আব অতটা খেয়ালও থাকে না।

একদিন হঠাৎ যোগেন নিজেই এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে। ওর স্ত্রীব নাকি খুব অসুখ। দেখলাম আগের চেয়ে যোগেন এখন আবো একটু রোগা হয়েছে, আরো একটু বেশি বকমেব সভ্যভব্য, খানিকটা বিলেতিয়ানার চালও হযেছে। স্ত্রীটি দেখতে বেশ। ইতিমধ্যে একটি ছেলেও হযেছে। অসুখটা এমন কিছুই নয়, হিষ্টিবিযা। কিছুদিন চিকিৎসা করলাম, তাতেই বেশ সেরে উঠলো।

তার পর থেকেই উপর্যুপবি সেখানে আমাব ডাক পড়তে লাগলো। যোগেনের ছেলের অসুখ, নতুবা তাব মা'র অসুখ, কিংবা আর কারো অসুখ। গেলেই যোগেনের মা খুব পেট ভ'রে খাইয়ে দেন। তা মন্দ কি, উড়ে বামুনের হাতের অখাদ্য খাই, উপরি পাওনাটুকু পেলে ভালোই লাগে। তার ওপরে আবার যোগেনের স্ত্রী নিজের হাতে তৈরী ক'রে রোজ চা খাওয়াতে শুরু করলে। কলেজের রেস্তোরাঁর চাএর চেয়ে এখানকাব চা-টাও ভালো। যোগেনের বাবা বললেন,—দেখ বাবা অমরনাথ, তুমি ববং এক কাজ কবো। আমি বলি কি, তুমি বরং রোজ বিকেলে কলেজের পরে একবার ক'রে এসো। ঘরের তৈরী জলখাবার খেয়ে যাবে, ওতে কোনো অগুণ করবে না। তুমি আমাদের ছেলের মতো, এ-কথা তো বলতেই পারি। আর ঐ সুবেন্দ্রকেও এবার তোমার

কলেজে ভর্তি ক'রে নাও, বাড়িতে একজন ডাক্তার থাকাই বরং দরকার। অসুখ বিসুখ তো নিত্য লেগেই আছে।

আমি বললাম—মাঝে মাঝে আসবো বৈ কি, তবে রোজ আসতে হয়তো পারবো না। দরকার হ'লেই একটু খবর দেবেন, নিশ্চয় আসবো। আমি আবার অনেক রকম কাজে ব্যস্ত থাকি কিনা।

কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম বটে, কিন্তু তথাপি প্রায়ই আমাকে যেতে হোতো। জলখাবার এবং চা-এর নেশাটাও আমাকে ধীরে ধীরে পেয়ে বসেছিল।

আরো একটা আকর্ষণের বস্তু ছিল। সে ঐ যোগেনের স্ত্রী। প্রথমে ভেবেছিলাম এ একটা হিষ্টিরিযাগ্রস্ত যৌনসর্বস্ব অন্তঃসারশূন্য বিলাসিনী নারী,—পরে দেখলাম তা নয়। কলকাতার মেয়ে হ'লেও আমরা পথেঘাটে যেমন আজকাল দেখি তেমন নয়। এ একটু আলাদা রকমের। আভিজাত্য থাকলেও কোনো অহংকার নেই, তার বদলে আছে একটি সহজ শ্রী এবং সনম্র শালীনতা। রীতিমত ভাবেই শিক্ষিতা, কিন্তু সংযত এবং ভদ্র। প্রাণচাঞ্চল্য আছে, কিন্তু কোনো অনাবশ্যক চটুলতা নেই। প্রাচুর্যের যা-কিছু লক্ষণ দেখা যায় সে কেবল তার চোখ দুটির মৌনতার মধ্যে। চোখ দুটি আপন চাহনির ভাষায় অনেক কথা বলতে জানে, কিন্তু কণ্ঠ আমার কাছে একরকম নীরব। যেটুকু লজ্জা থাকা সঙ্গত সেটুকু হিসাবমত বজায় রাখে, কিন্তু সে লজ্জার কোনো বাড়াবাড়ি নেই। আমায় দেখলেই মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে একবার চেয়েই তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নেয়। মুখে কোনো কথা বলে না, কিন্তু আমায় দেখলে ঘর থেকে তৎক্ষণাৎ চলেও যায় না।

মেয়েটি দেখতে কেমন? মনে হয় বড় রুগ্ন। তবে তার রূপের দিকে আমি চাইনা। ও সব দিকে আর চেয়েও কাজ নেই, ও সব কথা আর বলেও কাজ নেই। রূপটা কিছুই নয়, আমি জেনেছি ওটা কিছুই নয়। ওটা হৃদয়ের একটা অন্তরায়,—এবং অন্তরালও বটে। স্ত্রীলোকের, অর্থাৎ যাদের যৌবন একেবারে গত হয়নি তাদের অনেকের রূপ তো প্রায় বেশ ভালোই হয় দেখতে

পাই। কিন্তু ওদের হৃদয়? আমি জানিনা তাও অধিকাংশই ভালো কিনা, কিন্তু আগেকার জ্ঞানী লোকেরা অন্য রকমের কথা বলতেন,—আরব্য রজনীর হারুণ-অল-রশিদ থেকে আমাদের চাণক্য পণ্ডিত পর্যন্ত। তবে যে বিষয়ে আমি নিজে কিছুই জানিনা সে বিষয়ে আমার কিছুই বলা উচিত নয়। মেয়েদের আমি চিনিনা, মেয়েদের মুখের দিকে আমি পারতপক্ষে আর চাই না। চাইলেই হয়তো অনেক কথা মনে হ'তে থাকবে, কাজ কি অত গণ্ডগোলে?

এরা কিন্তু বেশ আছে, যোগেন আর যোগেনের স্ত্রী। দেখলে একটা আনন্দ হয়। কোনো ঝগড়াঝাঁটি নেই, ঠাণ্ডা ভাবে পরস্পরে পরস্পরের মন রেখে চলে, দুজনে মিলে আপোষে ঘর করে। সংসারের যৌথ কারবারে দুই অংশীদারের মধ্যে মিলও আছে এবং পরস্পরকে যেন বিশ্বাসও আছে দেখতে পাই। অন্ততপক্ষে এ যা বলে ও তাই শোনে, ও যা বলে এ তাই শোনে। তাই যথেষ্ট, ক'টা লোকের ঘরেই বা এমন হয়?

দেখতে দেখতে ক্রমশ আমার ঐ মুখবোজা মেয়েটির সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে। ঐ যে এক ভিন্নজাতীয় দুর্বোধ্য প্রাণী আমার সুমুখ দিয়ে অসংকোচে ঘোরাফেরা করতে থাকে,—যাকে আমি একটুও চিনিনা, যার হৃদয়ের সম্বন্ধে কিছুই পরিচয় জানিনা, যার কণ্ঠস্বরও আমি সহজে শুনতে পাইনা, তারই ভিতরকার রহস্যটার সম্বন্ধে খানিকটা কিছু জানবার কৌতূহল আমার দিনে দিনে বেড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, স্বামীর ঘর করা ছাড়াও ওর মধ্যে যেন আরো অনেক কিছু জিনিস আছে,—আর বোধ হয় আমার সম্বন্ধেও যেন ওর আমারই মতো একটা কৌতূহল আছে।

ঐ মেয়েটি আমার কাছে যেন এক প্রহেলিকা। দেখলে মনে হয় আমাকে সে প্রসন্নভাবেই গ্রহণ করেছে, কারণ আমার চিকিৎসাকে সে পছন্দও করে এবং আমাকে শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু এদিকে আমার সঙ্গে পারতপক্ষে কোনো কথা বলে না কেন? এটা যে তার পক্ষে নিষেধ তা নয়, কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠতা না হওয়া পর্যন্ত কথা বলতে হয়তো তার নিজের থেকেই কোথাও বাধে।

অগত্যা আমাকেও তাই দেখাতে হয়, যেন আমারও ওর সম্বন্ধে কোনোই কৌতূহল নেই। কিন্তু একটা আশ্চর্যের কথা। এক একবার হঠাৎ ওর চোখের দিকে চাইলেই দেখতে পাই যেন আমার অগোচরে আমার দিকেই এতক্ষণ ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল, হঠাৎ চোখ পড়তেই অপ্রস্তুত হ'য়ে নিজের চোখটা নামিয়ে নিলে। এমন অনেকবার হয়েছে।

আমি যখনই ওদের বাড়িতে যাই, তখনই যোগেনের স্ত্রী এক কাপ্ চা তৈরী করে এনে খাওয়ায়, কোনোদিন ব্যতিক্রম হয়না। বুঝতে পেরেছে যে আমি ওদের বাড়ির চা-টা পছন্দ করি। একদিন চা দিয়ে গেল, অন্যমনস্কতা বশত আমি সেটা খেতে ভুলে গেছি, চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। ও তখন আবার এক কাপ্ গরম চা এনে আমার সুমুখে রাখলে, ঠাণ্ডা চাএর কাপ্‌টা সরিয়ে নিয়ে গেল। সংসারের কাজেই নিযুক্ত ছিল, তার মধ্যেও এটুকু ক'রে গেল নিঃশব্দে। চাএর কথাটা আমি ভুলে গেলেও ও ভোলেনি।

কৌতূহল বেড়ে যেতে থাকে, ঘনিষ্ঠতা করবার বাসনা হয়। রহস্যের আবরণ উন্মোচন ক'রে দেখতে ইচ্ছা হয় ঐ মেয়েটির মন কেমনতরো ধাতুতে গড়া। আবার ভাবি, কাজ কি আমার এত কৌতূহলে? পরের স্ত্রীর মনের খবর নেবার আমার এতই বা কি দরকার?

একদিন দুপুরে কলেজে ক্লাস করতে করতে অফিস থেকে খবর এলো, টেলিফোনে কেউ আমাকে ডাকছে। এই অসময়ে আমাকে হঠাৎ কার এমন দরকার হোলো? কোনো মন্দ খবর নয় তো? তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোনটা ধরলাম। খানিকটা ব্যস্ত খানিকটা বিরক্ত হ'য়ে চেঁচিয়ে বললাম—হ্যালো, কে আপনি? কাকে চান?

উত্তর এলো অতি মধুর স্ত্রীলোকের কণ্ঠে,—ডাক্তার চৌধুরীকে চাই, দয়া ক'রে একবারটি তাঁকে ডেকে দিন না। বিশেষ দরকার।

—আমিই ডাক্তার চৌধুরী। কে আপনি? কোথা থেকে বলছেন?

—আমাদের বাড়িতে একবার আজ আসতে হবে, বাবার অসুখ।

—চিনতে পারলাম না কে আপনি। কোথা থেকে বলছেন? নাম কি আপনার?

—আমার নাম মীরা।

আশ্চর্য আমার স্মৃতিশক্তি, নামটা শুনেছিলাম নিশ্চয়ই, কিন্তু বেমালুম ভুলে গেছি। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না কে মীরা, কোথাকার মীরা। তখন অগত্যা আবার আমাকে প্রশ্ন করতে হোলো—

—মাপ করবেন, নাম শুনেও আমি ঠিক চিনতে পারলাম না। কাদের বাড়িব মীরা বলুন তো? আপনাদের বাড়ির পুরুষদের কারো নাম বলুন, তাহ'লে বুঝতে পারবো।

—কার নাম বলি? উনি কোর্টে চলে গেছেন, ঠাকুরপো গেছে কলেজে। বাবার অসুখ কবেছে, আমি আর মা ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। বাবা বড়ো ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন। আপনি যেমন কলেজের পরে আসেন, তেমনি আজ নিশ্চয় আসবেন।

আমি কত বড়ো ইডিযট, এত কথার পরেও ঠাহর করতে পারলাম না কে বলছে, এবং কোথায় যাবার কথা বলছে। তখন আমি মরিয়া হ'য়ে বললাম—

—দেখুন, আপনি বাড়ির নম্বর আর বাস্তার নাম স্পষ্ট ক'রে বলুন, নইলে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমি সিম্‌লে থেকে বলছি,—নম্বরের বাড়ি। আমার স্বামী ব্যারিস্টার।

—ও, বুঝেছি বুঝেছি। আচ্ছা, বিকেলে নিশ্চয় যাবো।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কে আমাকে ডাকলে। পরিচিতিবোধটা আমার স্বভাবতই একটু দেরীতে আসে। প্রকৃতিটা হয়তো আমার এমনিই অন্যমনস্ক যে চেনা লোকের নাম শুনলেও বুঝতে বিলম্ব হয়। কিংবা হয়তো ঐ কণ্ঠস্বরটাই আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিয়েছিল। এমন চমৎকার কণ্ঠস্বর কার হবে, কে আমাকে ঐ মধুর কণ্ঠে এমন অসময়ে ডাকবে? দিশাহারা হ'য়ে আমি এই কথাই শুধু ভাবছিলাম। এ যে আমার চেনা লোকেরই কণ্ঠস্বর! যার

কথাগুলি টেলিফোনে আজ নতুন শুনলাম সে যে সাক্ষাতে আগে কখনো আমার সঙ্গে কথাই বলেনি! এ কথা যখন মনে হোলো তখন কেমন যেন একটা খুশির ঢেউ উঠলো আমার সারা অঙ্গে। ঠিক ঠিক, নামটি মীরাই তো, আমার মনেই ছিল না। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর এত মধুর? টেলিফোনে হয়তো মেয়েদের গলা একটু বেশি মধুর শোনায়? সেদিন সারাক্ষণ আমি কেবল এই কথাই ভেবেছি।

সেদিন যোগেনদের বাড়ি গেলাম চাকরির পোষাকপরা অবস্থাতেই। যোগেনের বাবার সেই চির আতংকের পেটের অসুখ, খুব সাবধানে থাকা সত্ত্বেও আজ হঠাৎ মারাত্মক রকমে দেখা দিয়েছে। তখনই সেটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার, নতুবা আরো ভীষণ আকার ধারণ করবে। এমন কি কলেরাও দাঁড়িয়ে যেতে পারে, কিছুই বলা যায় না। যোগেনের বাবা কাতর ভাবে বললেন,—তুমি বরং আজ রাত্রে এখানেই থাকো বাবা, তুমি থাকলে আমি বরং নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

অন্য সময় হ'লে নিশ্চয়ই আমি রাত্রে সেখানে থাকতাম না। একটু পেটের অসুখ হয়েছে, তাতে আমার হাজির থাকার কি প্রয়োজন? কিন্তু যোগেনের স্ত্রী—মীরা সেখানে দাঁড়িয়েছিল আমার মুখের দিকে চেয়ে। তৎক্ষণাৎ বললাম—আচ্ছা না-হয় এখানেই আজ আমি থাকছি, আপনি ভয় পাবেন না।

আসা-যাওয়া হ'তে থাকলো, ওদের সঙ্গে পুরোনো ঘনিষ্ঠতা আবার নতুন ক'রে জমে উঠলো। অন্যান্য সকলের সঙ্গে আগের থেকেই ছিল, নতুন ঘনিষ্ঠতা হ'তে থাকলো এবার যোগেনের স্ত্রীর সঙ্গে। একবার ওরা আমার বাড়ির মেয়েদের নিমন্ত্রণ ক'রে আনিয়ে দিনকয়েক রাখলে ওদের বাড়িতে, তার পর থেকেই মীরা আমার সঙ্গে অসঙ্কোচে কথা বলতে শুরু করলে। যখন থেকে কথা বললে তখন থেকেই দেখলাম, সকল রকমের কথাই ও বলতে জানে, এবং আশ্চর্য এই, সব কথাই চমৎকার গুছিয়ে বলতে পারে। কোথাও আটকায় না।

একটা কথা বললে যে তৎক্ষণাৎ সেটা বুঝতে পারে, গুরুতর বিষয়ে প্রশ্ন করলে যে তৎক্ষণাৎ তার জবাব দিতে পারে, তার সঙ্গে কথা বলতে কার না ইচ্ছা হয়?

দেখলাম এ মেয়েটির সকল বিষয়ে বেশ শিক্ষা আছে, বর্তমান পৃথিবীর সব খবরই রাখে। রাজনীতি বোঝে, সমাজনীতি বোঝে, দেশের কথা বোঝে, সাহিত্য বোঝে, গান বোঝে, কাব্য বোঝে, রবীন্দ্রনাথ বোঝে। আবার তর্কও করতে জানে। একবার তর্ক উঠলো, মানুষটার চেয়ে মানুষের কথাটা বেশি বড়ো কিনা। সে তর্কের মধ্যে সুরেন ছিল, আমিও ছিলাম।

সুরেন বললে,—বুঝতে পারছো না বৌদি, মানুষের নিজের স্বভাবের মধ্যে হয়তো অনেক ছোটো জিনিস থাকতে পারে, কিন্তু তাব বলবার কথাটা সে প্রাণপণ শক্তিতে খুব বড়ো ক'রেই বলে যায়। কালিদাস যত ভালো কাব্য বচনা ক'বে গিয়েছেন, তিনি নিজে কি তত ভালো লোক ছিলেন?

নীবা বললে,—তাঁর বাইবের স্বভাবটা ছেড়ে দাও, কিন্তু অন্তরে তিনি নিশ্চয় ততটাই ভালো ছিলেন। তুমি তো আর দেখনি।

আমি সুরেনকে একটু সমর্থন করবার জন্যে বললাম,—নেপোলিয়ন কিন্তু বলেছিলেন তাঁর একজন সেনাপতিকে, যে তাঁর নিজের কাজের চেয়ে তাঁর কথাকেই বড়ো ব'লে মানতে হবে। অবশ্য নেপোলিযনের এই কথাটা যে আমাদেবও মেনে নিতে হবে তা আমি বলছি না।

নীবা বললে,—মানুষটা নিজে বড়ো না হ'লে তার কথাগুলো বড়ো হ'তেই পাবে না। আপনি ববীন্দ্রনাথকে দেখেছেন কখনো?

—না, ওঁকে কখনো দেখিনি, আর দেখতে আমি চাইও না। ওঁর লেখাগুলো আমি ছেলেবেলা থেকেই পড়ে আসছি। আমার সারাজীবনের চেতনা, তাতেই ভবে আছে, সেইজন্যে মানুষটিকে আর আমাব চোখে দেখবার ইচ্ছে নেই। কাছে গিযে জীবন্ত মানুষটিকে দেখলে পাছে আমার অনেক কালের সঞ্চিত ধারণা একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়, সেই ভযে আমি যেতে চাইনা। হয়তো কেমন অবস্থায় দেখতে পাবো, নয়তো কি একটা হঠাৎ বলে ফেলবেন, কিছুই বিশ্বাস নেই।

—আপনি আগের থেকেই এতটা আশঙ্কা করছেন কেন? চলুন, একবার আপনাকে যেতেই হবে। দেখে আসবেন, তাঁর লেখার চেয়ে তিনি নিজে

আরো কতটাই বেশি বড়ো। ওঁকেও বলে রাখছি, চলুন এবার ছুটি হ'লে সকলে মিলে একবার বোলপুর বেড়িয়ে আসি। কবি অনেকবার বলেছিলেন বোলপুরে যেতে, কখনো আমি সেখানে যাইনি। এবার সকলে মিলে যাই চলুন, গেলে নিশ্চয় তিনি খুব খুশি হবেন। আজই আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

সত্যই যে সেখানে যাওয়াটা স্থির হ'যে গেল একথা আমি ভাবিনি। মনে করেছিলাম তর্কচ্ছলে কথাটা উঠলো, এই পর্যন্ত।

কিছুদিন পরেই ছিল গুড্ ফ্রাইডের ছুটি। দুদিন আগে যোগেন আমাকে বললে,—বোলপুরে যাওয়া স্থির হ'য়ে গেছে, সেখানে খবর দেওয়া হ'যে গেছে, বিছানাপত্র বাঁধাছাঁদা সব তৈরী।

তখন ভাবলাম, কি সর্বনাশ! ভালো কাপড়চোপড় কিছুই সঙ্গে নেই। মেসে থাকি, চাকরির পোষাক পরে'ই একরকম ভাবে সারা সপ্তাহটা কাটিযে দিই। ভালো তোয়ালে, সাবান, চিরুণি, ব্রাশ, টুথব্রাশ, গায়ে দেবার চাদর, বালিসের ফর্শা ওয়াড়, কিছুই আমার নেই। এমন কি বিছানা বাঁধবার হোল্ড-অল্‌টি পর্যন্ত নেই।

যোগেন বললে,—কিছুই তোমাকে ভাবতে হবেনা। মীরা ওসব কথা আগের থেকেই জানে, সে তোমার সমস্ত ব্যবস্থাই ক'রে নিয়েছে। কিছুই তোমাকে সঙ্গে নিতে হবেনা, তুমি শুধু ঝাড়া হাত-পায়ে যাবে আর ঝাড়া হাত-পায়ে আসবে।

—তার পরে? কবির কাছে যাচ্ছি, একটু সভ্যভব্য হ'য়ে যাওয়া চাইতো?

—সবই হবে, সেখানে গেলেই দেখতে পাবে।

উদ্বিগ্ন মনে যাত্রা করলাম। কে জানে কোথায় গিয়ে উঠবো, কত অসুবিধায় পড়তে হবে। নিতান্ত অপরিচিতের মতো যাচ্ছি।

যে বাড়িতে গিয়ে উঠলাম তার নাম নিচুবাংলা। যোগেনের ছেলেটি আছে সঙ্গে, ওরা স্বামী স্ত্রীতে তাকে নিয়ে ব্যস্ত হবে, ঘরকরণা গোছানো নিয়ে ব্যস্ত হবে, আবার আমাকে নিয়েও ব্যস্ত হবে,—এতে আমার বাধো-বাধো ঠেকতে

লাগলো। যদিও তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছিল তবু চারিদিকটা একবার দেখে আসি ব'লে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে পড়লাম।

তখন অন্ধকার হয়েছে তবু তার মধ্যেই দেখা যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোটো ছোটো বাড়িগুলি, মাঝে মাঝে গাছপালাগুলি। কাঁকর বিছানো পরিচ্ছন্ন রাস্তা, অনেকটা যেন পশ্চিমের মতো। সন্ধ্যা বেলাকাব স্নিগ্ধ হাওয়া বইছে। খানিকটা পরেই রাস্তা থেকে ডেকে নিয়ে গেল ওদের চাকর,—খাবার প্রস্তুত। ইতিমধ্যেই সমস্ত সুবন্দোবস্ত করা হ'যে গেছে। স্নানের জল প্রস্তুত ছিল, স্নান করলাম। টেবিলে খাবার প্রস্তুত ছিল, সকলে মিলে খেলাম। আমার জন্যে স্বতন্ত্র মশারি দেওয়া ধব্‌ধবে বিছানা প্রস্তুত ছিল, আরামে নিদ্রা দিলাম।

পবেব দিন সকালে উঠেই শুনলাম কবি সকলকে চাএর নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন। বিব্রত হ'য়ে উঠলাম, কিন্তু বিশেষ বেগ পেতে হোলো না। দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম এসে পড়লো, কোঁচানো ধুতি এলো, গিলে করা পাঞ্জাবি এলো। সুতরাং সন্তুষ্টচিত্তে কবিসন্দর্শনে যাত্রা করলাম।

গেরুয়া রংএব আলখাল্লা পরিহিত কবিকে এই প্রথম দেখলাম। একটি ঈজিচেয়াবে হেলান দিয়ে বসে আছেন খোলা বারান্দায়। একটি টেবিলের ওপর নানাবিধ লোভনীয় খাদ্যসম্ভার সাজানো, চা প্রস্তুত। কবির পাশে ছোট টিপয়ে রেকাবিতে রাখা আছে কতকগুলি মল্লিকা।

কবি আমাদের চেনেন না। মীবাকে দেখেই বললেন,—এসো এসো, রাজকন্যে এসো। রাত্রে কিছু খেতে পেয়েছিলে তো? কাল থেকেই ভাবছি, এরা তোমাদের উপোস করিয়ে রাখলে নাকি। তারপরে, এতদিনে বোলপুরে আসবার সুযোগ হোলো বুঝি? সঙ্গে দুটি বাহন জুটে গেছে দেখছি, তাই তোমাব এত সাহস। ওঁদের সঙ্গে পরিচয়টা করিযে দাও, আমি তোমাকে ছাড়া কাউকেই চিনিনা।

মীরা বললে,—ইনি আমার স্বামী, আর উনি একজন ডাক্তার, আমাদের বন্ধু।

—তাহ'লে দেবীর আগমন দ্বিচক্রযানে!

—কেন, দ্বিচক্রযান কোথায় দেখলেন?

—ঐ যে, একজনের ওপরে দিয়েছ সেবার ভার, একজনের ওপরে আরোগ্যের ভার। গৃহস্বামীটি তো সম্পূর্ণ হাতের মধ্যে, ডাক্তারটিও দেখছি করতলগত। রোগ হ'লে আর ওষুধের ভাবনা নেই। বুঝেসুঝেই ব্যবস্থা করেছ।

—ওষুধ বুঝি এমনই লোভনীয় জিনিস? যেমন দুর্গন্ধ তেমনি বিশ্রী ওঁদের ওষুধগুলো খেতে। অসুখ হ'লেও আমি কিছুতে ওষুধ খেতে চাইনা, উনি তো তাই নিয়ে কত রাগ করেন।

—ঠিক কাজ করো। আমিও তাই করি। অসুখ হ'লে ডাক্তারকে ডেকে দেখাবে, কিন্তু ওঁদের ওষুধ কিছুতেই খাবে না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে নর্দমায় ঢেলে ফেলে দিয়ে বলবে খেয়েছি। আমি কি করি জানো তো? রোগ হ'লেই ডাক্তার দেখাই, কারণ ব্যারামটা কি তা তো বুঝতে হবে। ওষুধ কিন্তু খাই আমার নিজের। এঁরা রোগটি ঠিক চিনতে পারেন, তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু চিকিৎসার বেলাতেই একেবারে রুদ্রমূর্তি, যুদ্ধং দেহি বলে রোগকে বিষম তাড়া করবেন, তাতে রোগী বাঁচুক আর মরুক। যুদ্ধ ছাড়াও যে আপোষে ঝগড়াটা মিটিয়ে নেওয়া যায়, এটা ওঁদের মাথায় ঢোকে না। ওঁদের জানা নেই যে, সকল রকমের ঝগড়াই আপোষে মিটতে পারে। কিন্তু ঐ দেখ, তোমাদের ডাক্তারের সমুখেই এত কথা বলে ফেললাম। উনি হয়তো মনে মনে বেজায় চটছেন।

কবি হাসতে লাগলেন। মীরাও হাসছিল তাঁর সঙ্গে।

আমি অবাক হ'য়ে কবিকে দেখছিলাম। এই সেই রবীন্দ্রনাথ,—যিনি 'কাবুলিওয়ালা' 'কঙ্কাল' 'ক্ষুধিত পাষাণ' লিখেছেন, যিনি 'গীতাঞ্জলি' 'বলাকা' লিখেছেন, যিনি লক্ষ লক্ষ কবিতা আর সহস্র সহস্র গান রচনা করেছেন, যিনি আমাদের হতভাগ্য ভারতের ভাগ্যবিধাতার বন্দনাসঙ্গীত গাইতে গিয়ে

গোড়াতেই তাঁকে সমগ্র জগতের জনগণমনের অধিনায়ক ব'লে সগর্বে সম্বোধন করেছেন,—এই সেই রবীন্দ্রনাথ !

কবির বারান্দার কড়ির খাঁজের মধ্যে একটি চড়াই পাখির বাসা ছিল। পাখিটি তার বাসা থেকে উড়ে এসে কবির সামনাসামনি রেলিংএর ওপর বসলো। তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পাঁউরুটির টুকরো নিয়ে ছুড়ে ফেলতে লাগলেন পাখির দিকে। পাখিটি নির্ভয়ে রেলিং থেকে নেমে এসে সেগুলো খুঁটে খেতে লাগলো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—পাখিটা বুঝি রোজই আসে ?

কবি বললেন,—হাঁ। তোমরা আমার কাছে কেবল কবিতাই চাও, কিন্তু ও চায় রুটি। যে যা চায় তাকে তাই দিতে হবে। ওকে কবিতা শুনিয়ে কোনো লাভ নেই, ওর মতে কবিতার চেয়ে রুটি অনেক ভালো জিনিস।

আবার তিনি হাসতে লাগলেন। আমি অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলাম তাঁর হাসি। পাকা গোঁফদাড়ির ভিতর থেকে এমন শিশুর মতন কচি হাসি বেরুতে আমি এর আগে কখনো দেখিনি। যাঁর এমন প্রতিভা তাঁর একটুও গর্ব থাকবে না, একটুও গুরুত্ববোধ থাকবে না, এতটা আমি আশা করিনি। আমি হেরে গেলাম, মীরার কাছে আমি হেরে গেলাম। এক শিশুরাই কেবল এমন হাসি হাসতে পারে, কারণ তাদের মনে কোনো গুরুভার বোঝা নেই, সর্বদাই হাল্কা মন নিয়ে আছে। উনিও যে তেমনি হাসতে পারেন, তার কারণ অসাধারণ প্রতিভাও ওঁর মনের মধ্যে গুরুভার বোঝা হ'য়ে দাঁড়ায়নি। তাই সহস্র রকমের সৃষ্টি করতে করতেও ওঁর মনটা শিশুর মতো হাল্কা আছে। মীরার কথাই সত্য হোলো।

বোলপুরে থেকে আমরা পাঁচটা দিন খুব ঘুরে বেড়ালাম, হৈ হৈ করলাম, পিক্‌নিক্ করলাম। আমাদের ঘনিষ্ঠতা এই অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকটা ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে উঠলো। বিদেশে কিছুদিন একত্রে কাটালে অনেকের মধ্যেই তাই হয়, অপরিচিতও দ্রুতগতিতে অত্যন্ত পরিচিত হ'য়ে ওঠে।

কলকাতায় ফিরে আসবার পরেও এটুকু বজায় রইল। আমি যে মনে মনে হার স্বীকার করেছি সে কথা আমি মীরাকে বলিনি। মীরাও আমাকে ও বিষয়ে আব একটিও কথা জিজ্ঞাসা করেনি। সম্ভবত সেটা সে ইচ্ছাপূর্বকই করেনি, মনে মনে হয়তো বুঝেছিল আমার অবস্থাটা। কিন্তু সে না জিজ্ঞাসা করলেও এ কথা আমার মাঝে মাঝে স্মরণ হয়েছে। তখন জানতাম না যে আরো কতবার আমাকে ওর কাছে হাব মানতে হবে।

আমার চিত্তের মধ্যে মীরার সম্বন্ধে তখনো কোনো চাঞ্চল্য ঘটেনি, অন্তত আমার জ্ঞানত ঘটেনি। ভালো মেয়ে, বুদ্ধিমতী মেয়ে, কথা বলতে আলাপ করতে লাগে ভালো, এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়। যোগেনের ভাগ্যটা ভালো, মনে মনে এই কথাই ভাবি, কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'যে থাকি।

কিন্তু যে পৃথিবীতে মানুষ নিয়ে কাববার সেখানকার মাটি অত্যন্ত উর্বরা। অনাযাসেই সেখানে শিকড় লাগে, অনায়াসেই গাছ গজায়। শুধু তাই নয়, গাছ গজাবার পূর্বে ঐ মাটির মধ্যে অদৃশ্য বীজ নিযে এমন সব গোপন প্রক্রিয়া চলতে থাকে যেটা তখন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে না।

ইতিপূর্বে আমার ধারণা ছিল যে আমাব শিকড় কোনো মাটিতেই লাগবে না। নিশ্চিন্তই ছিলাম। ভিতরে ভিতরে আমার কি হচ্ছিল তা কেমন ক'রে জানবো ? একদিন একটা সামান্য ঘটনায় আমার যে পবিমাণে মনশ্চাঞ্চল্য হ'তে লাগলো তাতেই প্রথমে টের পেলাম, ভিতরে কিছু ঘটেছে।

এমন কিছুই উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয। সেদিন সকাল সকাল কলেজের ছুটি হ'য়ে গেল, ভাবলাম একটু ওদের বাড়ি বেড়িয়ে চা খেযে সন্ধ্যাব় সময সিনেমা দেখতে যাবো। অসময়ে গিয়ে পড়েছি, তখন ওরা আমাকে প্রত্যাশা করেনি। অতর্কিতে ঘরের মধ্যে ঢুকতে গিয়ে দেখি সুরেন আর মীরা কি একটা কথা নিয়ে মহা তর্কাতর্কি করছে, দুজনের মুখেই প্রবল উত্তেজনার ভাব। উত্তেজনার প্রাবল্যে আমার উপস্থিতি প্রথমে কেউ টের পেলেনা। মীরার মাথাব কাপড়টা খোলা, চুলগুলো অবিন্যস্ত। কতকগুলো আল্গা চুল এলোমেলো হ'য়ে

মুখের ওপব উড়ছে, খোঁপাটা খুলে গিয়ে বেণীর মতো ঝুলছে, তার বিনুনির সঙ্গে জড়ানো রয়েছে সরু একগাছি সোনার লিক্‌লিকে হার। কালো চুলের পরতে পরতে সেটা ঝিক্‌মিক্ করছে। তর্কের উত্তেজনার চোটে একদিকের কাঁধের কাপড়টা খসে গিয়ে আঁচলের চাবিটা মাটিতে লুটোচ্ছে। মুহূর্ত সময়ের মধ্যেই আমি এই সব দেখে নিলাম। সম্ভবত কিছু একটা গুরুতর বিষয় নিয়ে তর্ক চলছিল, তাতে মীরাই জিতেছে। উল্লসিত হ'য়ে সে বলে উঠলো —'আর চালাকি কোরোনা বাপু, এইবার স্বীকাব করো যে তোমার হার হয়েছে।' সুরেন ততক্ষণে আমাকে দেখতে পেয়েছে, সে মৃদু মৃদু হাসছে দেখে মীরা ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখতে পেলে। একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে তাড়াতাড়ি সে মাথার চুলটা জড়াতে গেল। কিন্তু যতবাব জড়াবার চেষ্টা করে ততবারই খুলে যায়, হাতের চুড়িগুলো অনর্থক শুধু বাজতে থাকে। এতে ওর বিশেষ দোষ ছিল না। হাত দুখানি স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি লম্বা। আঙুলগুলো পিছন দিকে গিয়ে লক্ষ্যস্থান পার হ'য়ে চলে যায়, তাড়াতাড়ি কাজ সাফাই করতে পারে না। দুএকবার বৃথা চেষ্টা ক'রে মুক্তবেণী অবস্থাতেই সে মাথায় কাপড় তুলে দিলে। যথাসম্ভব লজ্জা সম্বরণ ক'বে নিয়ে বললে—আপনি একটু বসুন, আমি চা ক'রে আনি।

ফিরে এলো অনেক পরে। চুলটা তখন ভালো ক'রে আঁচড়ে এসেছে।

সিনেমায সেদিন যাওয়া হোলোনা, রাত্রে ওখান থেকেই বাসায় ফিরলাম। রাত্রে বিছানায় শুয়ে চোখ বুজতেই চোখের ওপর ভেসে উঠলো সেই চকিতের দেখা ছবিটা। তর্ক করতে করতে লম্বা চুলের বেণীটা খসে পড়লো, তার কালো চুলের বিনুনির পরতে পরতে সোনার হার ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠলো। হাত দুটো উঁচু ক'রে খোঁপা বাঁধতে যাচ্ছে, কিছুতেই পারছে না। অদ্ভুত এক গ্রীবাভঙ্গী সহকারে হাসতে হাসতে বলছে—'স্বীকার করো বাপু, স্বীকার করো যে হার হয়েছে, স্বীকার করো।'• অকারণে বারে বারে আমিও যেন সেই ভাবে বলতে চেষ্টা করলাম—'স্বীকার করো।' কিছুতেই অনুকরণটা ঠিক

হচ্ছে না, অনর্থক নিজের খেয়ালে ঐ এক কথা আবৃত্তি করতে লাগলাম। খানিক পরে আমার সম্বিত ফিরে এলো,—এ আমি কি পাগলামি করছি? চুপ করলাম বটে, কিন্তু মনে মনে আরো কত কি ভাবতে থাকলাম···

আচ্ছা, স্থরেনের সঙ্গে মীরা যেমন ভাবে কথা বলে, আমার সঙ্গে তেমন তো নয়! আমার চেয়ে স্থরেন আরো বেশি অন্তরঙ্গ, তাই। বেশ, তাই যদি হয়, সে কথা ভেবে আমার এত বুক চড়্‌চড়ানি কিসের? আবার সেই ঈর্ষা? পরের বাড়ি, পরের স্ত্রী, এখানেও সেই ঈর্ষা?

কিন্তু ওর হাসিটা বড়ো স্থন্দর। উত্তেজিত হ'যে উঠলে মীরাকে বড়ো স্থন্দর দেখায়। মীরার এমন রঙ্গরহস্যময়ী চটুল বালিকাস্থলভ আলুথালু আটপৌরে মূর্তি আমি কখনো দেখিনি, চিরদিন দেখে এসেছি ওর সভ্য সংযত পোষাকী রূপ। ওর খোঁপাবাঁধা চুলের চেয়ে বেণীদোলানো চুল অনেক ভালো। আর ওর কোঁকড়ানো চুলগুলো কেমন মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল, ঠিক যেন আমাদের সেই দুষ্টু খুকীটার মতো। ছবিটা মনে পড়ছে আর আনন্দে আমি তন্ময় হ'য়ে যাচ্ছি। চোখ বুজেও আমার মুখ হাসিতে ভরে যাচ্ছে। সেটা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে স্থরেনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তঃকরণ বেদনায় ভরে উঠছে। আনন্দ আর ঈর্ষা,—ঈর্ষা আর আনন্দ,—এটার পরে ওটা পর্যায়ক্রমে চলেছে।

মোটে ঘুম এলো না। জোর ক'রে চোখ চেয়ে আমি উঠে পড়লাম। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে ঢক্‌ঢক্ ক'রে একগ্লাস জল খেয়ে ফেললাম। ইলেক্‌ট্রিক আলোটা তখনও জ্বলছে, অনেক দূরে তার স্থইচ্। অত দূরে গিয়ে সেটা নেবানোর মতো এনার্জি নেই, আলোটা জ্বলতেই থাকলো, আলস্যভরে আবার আমি শুয়ে পড়লাম।

এবার চোখ বুজে স্থির করলাম মীরার কথা আর ভাববো না, অন্য বাজে কথা ভাবি। যা হোক একটা কিছু ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে যাবে। আচ্ছা,

ঐ যে আলোটা জ্বলতে থাকলো, মিছিমিছি ওর কারেণ্ট পুড়ছে। তা হোক্, ওটা এ. সি. কারেণ্ট—না ডি. সি. কারেণ্ট? এ দিকের সবই ডি. সি. কারেণ্টে চলে, বালিগঞ্জের দিকে কেবল এ. সি. কারেণ্ট। কিন্তু কারেণ্ট যেখানে যেমনই হোক, আলোগুলো কিন্তু ঠিক একরকম ভাবেই সর্বত্র আলো দিতে থাকে। এ. সি. কারেণ্টকে বাংলায় কি বলা যেতে পারে? পরিবর্তী তাড়িত-প্রবাহ,—অর্থাৎ পরা আর অপরাশক্তি এতই তাড়াতাড়ি ওখানে পরিবর্তিত হ'য়ে চলতে থাকে যে সেই পরিবর্তনটা মোটে বোঝাই যায় না। দরকার হ'লে এ. সি. কারেণ্টকে ডি. সি. ক'রেও নেওয়া যায়, একটা শুধু কন্‌ভার্টার লাগিয়ে দিলেই হোলো।······এখন চোখ বুজেও কিন্তু মীরাকে বেশ দেখা যাচ্ছে, যদিও চোখ বোজার জগতে কোনো ইলেক্‌ট্রিক্ আলো নেই। কিন্তু ওখানেও দেখছি একটা এ. সি. কারেণ্টের মতো খেলা। কালো চুলের অন্ধকারের মাঝে মাঝে ঝিলিক মারছে সোনার হারের ঝিকিমিকি। অন্ধকার আর প্রদীপ্তি, ঈর্ষা আর ঈপ্সা,—কত তাড়াতাড়ি বদলে যায় একটার পরে একটা।···আবার সেই কথাই ঘুরে ফিরে এসে পড়লো? মনের ভিতরকার কারেণ্টের মেশিনটায় এ. সি.-কে ডি. সি. ক'রে নেওয়া যায়না বুঝি? হাঁ তাও করা যায়, এরও এ করকম কন্‌ভার্টার আছে বৈকি। আমরা তার কোনো সন্ধান জানিনা, সে সন্ধান কেবল মহাজনরাই জানে।

ঘড়িতে তিনটে বাজলো। ওঃ এত রাত্রি হয়েছে? চুপ চুপ, এবার তুমি একটু চুপ করো। কেবল যত আবোল তাবোল কথা আর কথা। মনে মনে এত কথা বলতে তো তুমি কখনই এর আগে জানতে না। বিছানায় শুলেই তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়তে, আজ সেই মোষের মতো ঘুম কোথায় গেল?

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। অনেক বেলায় ছট্টু আমার ঘুম ভাঙিয়ে এক কাপ্ চা দিয়ে বলে গেল,—বাবু, চা খেয়ে নিন, অনেক বেলা হ'য়ে গেছে। তখনো কিন্তু ঘুমটা আমার সম্পূর্ণ ভাঙেনি, চোখে জড়িয়ে রয়েছে। আমি চোখ বুজেই চাএর কাপে মাঝে মাঝে চুমুক দিতে থাকলাম আর বসে বসে

হাই তুলতে থাকলাম। ঢুলতে ঢুলতে মাতালদের মতো জড়িতকণ্ঠে শুরু ক'রে দিলাম একটা অদ্ভুত গান,—'ফোটে ফুল শুক্‌নো ডালে দেখিবি যদি আয়—'

ছু-একবার গাইতে গাইতেই আমার চৈতন্য হোলো। আজ এ কি গান আমি গাইছি? সেকালেব থিয়েটারের একটা নিতান্ত থার্ডক্লাস রদ্দি গান, কবে কোথায ছেলেবেলায শোনা, সেই গানটা আজ হঠাৎ আমি চেঁচিয়ে গাইতে শুরু ক'রে দিয়েছি কেন? আমি যে শিক্ষিত সভ্য একজন ডাক্তারি কলেজের ডিমনস্ট্রেটর, লোকে শুনলে কি বলবে?

ভালো ক'রে চোখ চেয়ে জানলার বাইরে দৃষ্টিক্ষেপ করলাম। স্বন্দর সোনালি রোদে চারিদিক ঝল্‌মল্‌ কবছে। সোনাব রংএব মতো কোনো রং নেই। দূরে কার্নিশের ওপরে একটা বটগাছের চারা দেয়াল ঠেলে উঠেছে। তার শিকড়গুলো সিমেণ্ট বাঁধানো ইটের গাঁথনি ফাটিয়ে তার মধ্যে অবাধে ঢুকে চলে গেছে, সেখানে সেই শুকনো ইটের স্তূপের ভেতবে কোথায রস পাচ্ছে কে জানে। -গাছটা কিন্তু ওতেই খুব খুশি আছে, পাতাগুলো আনন্দে সবুজ হ'যে বাতাসে ঝির্‌ঝির্‌ ক'বে কাঁপছে।

ছুটি গোলা-পায়রা উড়ে এসে বসলো ঐ কার্নিশের ওপর। মুখোমুখি হ'য়ে তারা চঞ্চুতে চঞ্চু দিযে পরস্পরকে চুম্বন করতে লাগলো। একটুকুতে ওদের চঞ্চুপানের আশা মেটে না। থেকে থেকে গলা ফুলিযে এক পাক ঘুরে আসে, আবার মুখোমুখি হ'য়ে চুম্বন করতে থাকে। এমনি চললো অনেকক্ষণ, তারপরে ওরা ছুটিতে একসঙ্গেই উড়ে গেল। কি নিশ্চিন্ত ওদের জীবন! কোনো সংকোচ নেই, সংস্কার নেই, বাধাবিপত্তি কিছুমাত্র নেই।

আবার আমি চমকে সচেতন হ'য়ে উঠলাম। সকালবেলায় ঘুমিয়ে উঠে ফের সেই মীরার কথাটাই এনে ফেলেছি? এ আমার কি কাণ্ড হচ্ছে? বন্ধুর স্ত্রীকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভালোবাসা? আজকালকার নাটকে আর নভেলে যা আকছার দেখা যাচ্ছে তাই? মনকে শাসিয়ে বললাম,—চুপ চুপ, যা চেঁচিয়ে বলাও দোষ তা চেঁচিয়ে ভাবাও দোষ। ও সব কথা মন থেকে একদম ছেঁটে ফেলতে হবে,

নির্মূল ক'রে ফেলতে হবে। এবার থেকে ওদের বাড়িতে যাওয়াই বন্ধ ক'রে দেওয়া যাক। সেই ভালো। কাজ কি হাঙ্গামায়? কিন্তু,—তাই বা কেন করতে যাবো কাপুরুষের মতো? পালিয়ে আসবো কিসের ভয়ে, নিজের প্রতি কিছুমাত্রও কি আস্থা নেই? ঐ যে নিরীহ ধরণের জীবন, ও কেবল নিম্ন জাতীয় প্রাণীদের জন্যে, আমাদের জন্যে নয়। আমরা মহৎ প্রাণী, আমাদের জীবন হচ্ছে যুদ্ধের, দ্বন্দ্বের, জয়-পরাজয়ের,—তাই নিয়েই আমাদের মহত্ব। গোপন প্রবৃত্তিকে জয় করবো, লোভাতুর বৃত্তিগুলোকে পদদলিত করবো,—পালিয়েও যাবো না, কিংবা গ্রাহ্যও করবো না এই সব নরম-নরম রোমান্টিক মনোভাবকে।

সেই থেকে নিজেকে সপ্রতিভ করবার জন্যে নির্লজ্জভাবে জোর ক'রে চাইতে লাগলাম মীরার মুখের দিকে। সংকোচের কোনো প্রয়োজন নেই, সেও হয়তো আমার সংকোচ দেখলে কিছু ভাবতে পাবে। এত লুকোচুরি কিসের? আর,—চোখে দেখতেই বা দোষ কিসের? চোখ চেয়ে দেখার অধিকার সকলেরই আছে।

ভালো ক'রে ওর দিকে চোখ চেয়ে দেখতে গিয়ে আবার আমার মনে হোলো, মীরা ভয়ানক রুগ্ন। গায়ে মোটে রক্ত নেই, যেন ফ্যাকাশে। দেখলেই মনে হয় একটা মারাত্মক রোগের বীজ ওর দেহের মধ্যে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কোথায় লুকিয়ে আছে। এখন আপাতত তার কোনো লক্ষণ নেই বটে, কিন্তু আরো দু-একটা ছেলেপুলে হ'লেই তখন সেটা প্রকাশ হবার সুযোগ পাবে। আমি ডাক্তার, স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে এ মেয়েটি বেশিদিন বাঁচবে না, শেষ পর্যন্ত থাইসিস হ'য়ে মারা যাবে। এমন চমৎকার বুদ্ধিমতী মেয়ে, অথচ বাঁচবে না, বড়ো মায়া হয়। যত্ন করলে হয়তো কিছুকাল টিঁকে থাকতে পারে, কিন্তু কেই বা ওর যত্ন করবে!

সুরেন আর শঙ্কর দুজনকেই ইতিমধ্যে আমাদের কলেজে ভর্তি ক'রে দিয়েছি। ওদের সঙ্গে প্রত্যহই দেখা হয় কলেজে, ওরা আমার কাছে আসে নানা বিষয়ে উপদেশ নিতে। একদিন কথায় কথায় সুরেনকে বললাম—দেখ হে, তোমার বৌদির সঙ্গে তোমার তো খুব ঘনিষ্ঠতা চলছে দেখতে পাই। কিন্তু

একটা বিষয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখেছ কি, উনি দিন দিন কত রোগা হ'য়ে যাচ্ছেন ? ভেতরে ভেতরে কোনো অসুখবিসুখ হচ্ছে না তো ? চেহারাটা দেখলেই মনে হয় যেন বড্ডো এনিমিক্‌। নয় কি ?

স্বরেন চুপ ক'রে রইল। শঙ্কর আমার কথার জবাব দিলে। বললে,—ও চিরকালই ঐরকম। খায় না তো বেশি, বোধ হয় স্লিমিং করবার ইচ্ছে। মা সেইজন্যে ওকে কত বকেন। কিন্তু রোগা দেখালে কি হবে, গায়ে বিলক্ষণ জোর আছে। ছেলেবেলায় আমি ওর সঙ্গে গায়ের জোরে পেরে উঠতাম না।

স্বরেনকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম—উনি তোমাদের বাড়ি রোজ দুধ-টুধ খান তো ?

—আমি অত খবর রাখি না। খায় না বোধ হয়।

—তুমি ব'লে দিও, প্রত্যহ ওঁর অন্তত একসের দুধ খাওয়া উচিত।

—আমি বললে শুনবে না। আপনিই বরং বলবেন।

এ কথা আমি যোগেনকেও বলেছিলাম, মীরাকেও বলেছিলাম, কিন্তু ওরা কেউ গ্রাহ্যই করলে না। হেসে উড়িয়ে দিলে।

রুগ্ন দেখালেও মীরার রূপের মধ্যে একটা ভাসন্ত মেঘের মতো আল্গা শ্রী আছে। মুখখানি যেন অপূর্ব একটা ক্ষণভঙ্গুরত্বের মোহজালে মণ্ডিত হ'য়ে আছে বলেই অমন অপরূপ। গাল দুটি অতি নরম, হাসলে টোল খায়। গলায় পাতলা চামড়ার স্বচ্ছ আবরণটির নিচেই নীলবর্ণ সরু সরু শিরা দেখা যায়। মুখের খুব কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ ক'রে দেখবার মতো সুস্পষ্ট রেখায় ঘেরা সে রকম সুস্থির সৌন্দর্য নয়। দূর থেকে কাছে আসতে দেখলেই ওকে বেশি সুন্দর দেখায়, মনে হয় ওর মধ্যে সর্বসমেত কোথায় একটা লাবণ্য আছে, আর সে লাবণ্যে প্রাণ আছে। চুপ ক'রে বসে থাকলে ততটা ভালো দেখায় না, কথা বললে যতটা ভালো দেখায়। দাঁড়িয়ে থাকলে তেমন দেখায় না, চললে যেমন দেখায়। চাঞ্চল্যের মধ্যেই ওর চমৎকার জৌলুষ খোলে, নিশ্চলতার মধ্যে নয়। ওর কতকগুলো বিশিষ্ট রকমের ভঙ্গী আছে, সে ভারী সুন্দর। কারো কথা মনঃপূত না হ'লে

চকিতে ঘাড় বেঁকিয়ে নেবার ভঙ্গী, উত্তেজিত হ'লে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলার ভঙ্গী, পেয়ালাতে ছাপাছাপি চা নিয়ে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে সাবধানে আসার ভঙ্গী। আর—সবার চেয়ে সুন্দর ওর রহস্যপূর্ণ চোখের সেই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী।

মাঝে মাঝে ওর সেই দৃষ্টিটা যেন করুণ হ'যে উঠতো। সে যেন কি এক স্নেহের আহ্বানের ভাষায় বলছে—তুমি এমন বেহুঁশ কেন? একবারটি আমার দিকে চাও; আমার অনেক কথা চুপিচুপি বলবার আছে, একবারটি শোনো। ঐ দেখলেই তখনই অকারণে আমি বিশ্রী একটা রূঢ় ব্যবহার ক'রে ফেলতাম। সে রূঢ়তা ওর প্রতি নয়,—সেটা আমার নিজেরই মোহের প্রতি একটা আকস্মিক কশাঘাত। ঐ দৃষ্টি আমাকে অজান্তে স্নেহ জানিয়ে মুগ্ধ করতো, আর সেই মুগ্ধতাকে ভয় করতাম। এদের স্নহ কখনো পাইনি, তাই দেখলেই ঘাব্ড়ে যাই।

মীরা বেশ সাজতে জানে। কোন কাপড়টি পরলে ওকে ভালো মানায়, কোন রকম ভাবে খোঁপা বাঁধলে ওকে আরো চমৎকার দেখায়, এ সব ওর অজানা নয়। যেদিন কোথাও যেতে হবে এবং যেদিন আমিও সঙ্গে যাবো, সেদিন ও মুহূর্তমধ্যে পরিপাটিরূপে কেমন একরকম সেজে নিতো। আমি অবাক হ'য়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম সেই সজ্জিত পরিবর্তিত রূপশ্রী।

ইতিমধ্যে যোগেনের বাবার অসুখটা আবাব বেড়ে উঠলো। কখন কি হয় বলা যায় না। অতিরিক্ত অতিসার হ'য়ে নাড়িটা দমে যেতে পারে, রাত্রেই সেলাইন কিংবা গ্লুকোজ ইন্জেকশন দেবার প্রযোজন হ'তে পারে। অতএব সমস্ত যন্ত্র-সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে আবার কিছুদিনের জন্যে রাত্রে আমাকে ওখানেই বাস করতে হয়। এবার আমি এটা ইচ্ছাপূর্বকই করি। নিজেই থাকবার প্রস্তাব করি, আমাকে সাধাসাধি করবার প্রযোজন হয় না।

রাত্রে যে ঘরে আমি শুই তার পাশের ঘরেই শুয়ে থাকে যোগেন আর তার স্ত্রী। দেয়ালের আড়াল থেকে ওদের গুঞ্জনধ্বনি আমি শুনতে পাই। শুয়ে শুয়ে ছটফট করতে করতে আমি ভাবি, পৃথিবীতে এমন অবিচার কেন? একজন পাবে

অপর্যাপ্ত, আর একজন কিছুই না! ভাবতে ভাবতে আমি উন্মত্ত হ'যে উঠি, সংযম কিংবা সুযুক্তির বাঁধ আমার কিছুই তখন থাকে না। আমি অ্যানাটমি জানি, ফিজিওলজি জানি, হ্যাভেলক এলিস জানি। এও জানি যে আমি চৌধুরী-বংশের বংশধর, আর ঐ মীরা এক অভিজাত বংশেব বধূ। কিন্তু আজ আমি তৃষ্ণার্ত, আমি ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার কাছে জানাজানি কিংবা বোঝাবুঝি কিছুই খাটে না। ক্ষুধার যুক্তি সব যুক্তির ওপরে। দেখনি কখনো ক্ষুধার্তের আচবণ কেমন হয়, কতখানি তারা নির্লজ্জ, অবুঝ, অমানুষ হ'য়ে ওঠে? একজন কেউ খেতে বসেছে দেখলে অসঙ্কোচে তার সুমুখে গিয়ে হাত পেতে দাঁড়ায়। বলে,—আমাকে চারটি ভাত দাও। পাতের তলায় কিছুমাত্র উচ্ছিষ্ট পড়েছে দেখলে তাব রাগ হয়। ভাবে,—যেটুকু ঐ ব্যক্তি হেলায় ছড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে, সেটুকু আমাকে দিলে আমি কৃতার্থ হই। ভাবে,—ভাতের ঐ থালাটা আমি ওব কাছ থেকে কেড়ে নিই।

ওদের ঘবে শুয়ে শুয়ে নিজেব মনে আমি এমনি কত কি ভাবতে থাকি। ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের দ্বারা কেনই বা নিজেকে চিরদিন বঞ্চিত ক'বে রাখবো? পাঁকের পথে অনবরত পা বাঁচিয়ে চলাব জীবন এবাব ঘুচে যাক, কণ্টকে পথে রক্তাক্ত পায়ে চলবার দিন একবাব আসুক। নিশ্চিন্ত নির্বিবোধী নিরাপত্তার জীবন এবার ঘুচে যাক, বিপদসঙ্কুল অনিশ্চিত জীবনেব মারাত্মক সুখেব সন্ধান ক'রে একবাব দেখি। এই ধবণের জীবনে সর্বনাশের সম্ভাবনা আছে, ক্ষত ক্ষতি এমন কি অকস্মাৎ অপমৃত্যুও ঘটতে পারে, কিন্তু তিলে তিলে পলে পলে ক্ষয় হওয়ার মতো জঘন্যতা নেই।

নিদ্রাবিহীন উষ্ণ মস্তিকে কত রকমের অসম্ভব ক্রিয়া-কল্পনার উদয় হয়, ভেবে দেখি তার কোনোটাই কার্যকরী নয়। তাব চেয়ে মীরাকেই সরাসরি আমার মনের কথা খুলে বলি না কেন? আমার ব্যর্থ জীবনের কাহিনীটা ওকে জানিয়ে বলি না কেন যে এখন তোমাকেই আমার একান্ত প্রয়োজন?

কিন্তু এগুলো কেবল রাত্রের মনোভাব, দিনের বেলা কিছুই থাকে না। দিনের বেলা ভাবি,—এখানে রাত্রে অনিদ্রা হচ্ছে, যত দুঃস্বপ্ন আর দুশ্চিন্তা হচ্ছে, এতে

আমার অনিষ্ট হবে, শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে। পরের বাড়িতে অনভ্যস্ত বিছানায় শুয়ে ঘুম না হওয়াই স্বাভাবিক। এর একটা বিহিত করতে হবে।

যোগেনের বাবা একটু সুস্থ হ'য়ে উঠতেই আমি বললাম, এখানে আমার ঘুম হচ্ছে না। আমি সর্বদাই আপনাকে দেখতে আসবো, কিন্তু রাত্রিটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। যোগেনের বাবা ফ্যালফ্যাল্ ক'রে আমার দিকে চেয়ে নিতান্ত ক্ষীণস্বরে বললেন,—বেশ, তাই বরং ভালো। যোগেন একটু আপত্তি করলে। মীরা শুধু নির্বাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু তবু কি করি, নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে আমাকে একটু পেশাদারীর মতো আচরণই করতে হোলো। কাঁহাতক রাত্রে শুয়ে শুয়ে ঐ সব বেমক্কা চিন্তার যন্ত্রণা সহ্য করা যায়?

রাত্রে শোবার দায় থেকে মুক্তি পেয়ে অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে বেশ সামলে নিলাম। মীরাকে রোজ দেখতে পাই, তার সঙ্গে দিনান্তে একবার আলাপ করতে পাই, এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। এর বেশি কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

এমনি ভাবেই হয়তো বহুকাল কেটে যেতো, কিন্তু ইতিমধ্যে একদিন আমরা গেলাম উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে। কথা ছিল যোগেন মীরা আর আমি তিনজনে যাবো, তিনখানা টিকিট কেনা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যোগেন কি একটা কাজে আটকে পড়লো, ওর বদলে গেল সুরেন। আমাদের দুজনকে দুপাশে বসিয়ে মীরা বসলো মাঝখানে, কারণ তাহ'লে ওকে কোনো অপর দর্শকের পাশে আড়ষ্ট হ'যে বসতে হবে না। আমাদের দুজনের মাঝে ও স্বচ্ছন্দেই বসলো, কিন্তু আমাকে থাকতে হোলো আড়ষ্ট হ'য়ে। যদি দৈবাৎ ওর গায়ের সঙ্গে আমার গা ঠেকে যায় তাহ'লে মীরা হয়তো মনে মনে কি ভাববে। কিন্তু যতই আমি আড়ষ্ট হ'য়ে বসি, কিছুতেই ওর স্পর্শ বাঁচাতে পারিনা। মীরা অনবরত হাত নাড়ে, আমার গায়ের দিকে ঘেঁষে আসে, আমার কানের কাছে মুখ এনে নিম্নস্বরে বলে, —ঐ নাচটার মানে আমি বুঝতে পারছি না, একটু বুঝিয়ে দিন না। আমি নিজেও যদিও কিছু বুঝিনা, তবু যথাসম্ভব ওকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করি।

এতে বারে বারে আমাদের অঙ্গস্পর্শ ঘটে যায়,—কাঁধের সঙ্গে কাঁধের, হাতের সঙ্গে হাতের, চুলের সঙ্গে চুলের। ওর চুলে একটা মিষ্টি মিষ্টি সৌরভ পাওয়া যায়, সেই সৌরভযুক্ত চুলের সামান্যমাত্র সূক্ষ্মতম স্পর্শে আমার সারা অঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ওর বাহুমাংসের কোমলতা দুই প্রস্থ কাপড়ের আবরণের ভেতর থেকেই আমি অনুভব করতে পারি। ভালো লাগে সেই আকস্মিক স্পর্শটি, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সচেতন হ'য়ে আমি খানিকটা তফাতে সরে যাই। মীরা নিজেই আবার কখন একটু একটু ক'রে আমাব দিকে সরে আসে, কানেব কাছে মুখ এনে অসঙ্কোচে নানারকমের প্রশ্ন করে। সুবেন ওপাশে নির্বিকার হ'য়ে বসে থাকে, মীরা তাকে কোনো প্রশ্ন করেনা। সম্ভবত মনে কবে যে সুরেনেব চেয়ে নাচের আর্টটা আমি বুঝি ভালো।

এর পরে আরো একদিনের কথা। সেদিনও একত্রে আমাদের সিনেমা দেখতে যাওয়া স্থির হয়েছিল। দৈবক্রমে সেদিন আমিই সময়মতো উপস্থিত হ'তে পারিনি। কিছু বিলম্বে ওদের বাড়িতে গিয়ে শুনি যোগেন আমার দেরী দেখে একাই মীরাকে নিয়ে সিনেমায চলে গেছে। অগত্যা আমার আর সেদিন ওদের সঙ্গে যাওয়া হোলো না। যোগেনের ঘরেই ঈজিচেযারে হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পড়তে শুরু ক'রে দিলাম। ভারী সুন্দর একটি প্রেমের গল্প ছিল তাতে, লেখকের স্পষ্ট কথা বলার সাহস আছে। তারিফ ক'রে ক'রে আমি পড়তে লাগলাম।

নির্দিষ্ট সময়ের পরে ওরা দুজনে ফিরে এলো,—যোগেন আর মীরা। সমস্ত ঘটনাই এখনো আমার নিখুঁত ভাবে মনে আছে। জুতোর শব্দ করতে করতে ওরা দুজনে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। বইটা রেখে আমি উঠে বসলাম। মীরা আজ কি চমৎকার সেজেছে! ঘোর রক্তবর্ণ একটি সিল্কের শাড়ি পরেছে। সেই শাড়ির রক্তিম আভায় আর সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার পরিশ্রমে ওর গৌরবর্ণ মুখখানা আরো টক্‌টকে লাল হ'য়ে উঠেছে। দূর থেকে দেখাচ্ছে যেন জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর থেকে উঠে আসছে একটা ঊর্ধ্বমুখী চলন্ত অগ্নিশিখা।

সেই মুখ দেখে সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর পিছনে পিছনে আসছে যোগেন, নিতান্তই নিষ্প্রভ।

ঘরের ভেতরে ঢুকেই যোগেন বললে,—এই যে অমর, অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হয়েছে তো? দাঁড়াও ভাই, একটা লোক আমাকে ডাকছে, আগে তার সঙ্গে কথাটা এই ওপর থেকেই সেরে আসি। মীরা, তুমি ততক্ষণ আমাদের চা তৈরী ক'রে ফেল।

যোগেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বাইরে গিয়ে ওপরের সেই পাশের বারান্দা থেকেই মুখ বাড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো।

তখন সেই রক্তমুখী মীরা আমার কাছে এগিয়ে এলো,—অত্যন্ত কাছে, তার সুগন্ধি কাপড়টা ঠেকলো আমার চেয়ারে, তার চুলের সৌরভ উড়ে এসে লাগলো আমার নাকে।

তখনো তার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার ক্লান্তিটা দূর হয়নি। একটু হাঁপাতে হাঁপাতে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বললে,—একা একা অনেকক্ষণ বসে আছেন, খুব কষ্ট হোলো তো? দেখছি একটু চাও খেতে পাননি, কারো সঙ্গে কথাও বলতে পাননি। মাকে কিংবা অন্য কাউকে বললেই পারতেন, চা-টা অন্তত কেউ ক'রে দিত।

আমি কোনো জবাব দিইনি। বিস্মিত হ'যে শুধু দেখছিলাম ওর হাঁপিয়ে কথা বলার তালে তালে উন্নত বক্ষের স্পন্দন, ওর দুই গালে টোল খাওয়া হাস্যময়ী রক্তবর্ণ মুখখানা।

মীরা আবার বললে—মুখের দিকে চেয়ে দেখছেন কি? চাএর কথা বুঝি ভুলেই গিয়েছিলেন, আমাকে দেখে এখন স্মরণ হচ্ছে? আমি যদি দুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি চলে যাই তাহ'লে আপনি এখানে এসে একটু চাও পাবেন না দেখছি।

মীরা এক অপরূপ ভঙ্গীতে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছিল, যেমন তার অভ্যাস। ওর সেই হাতখানা হঠাৎ আমি ধরে ফেললাম। মীরা তাতেও বিস্মিত

হোলোনা, বরং হাসতে হাসতেই বললে—ছাড়ুন, এবার আপনার চা ক'রে আনি।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম। তখন একেবারেই ভুলে গেছি যে ও একজন পরস্ত্রী, ও আমার বন্ধুর স্ত্রী। ভুলে গেছি যে যোগেন দাঁড়িয়ে আছে মাত্র বিশ ফুট দূরে ঐ পাশের বারান্দাতেই, চোখ ফেরালেই সব দেখতে পাবে, এমন কি আমি যা কথা বলবো তাও ওখান থেকে শোনা যাবে। একবার ভেবেও দেখলাম না যে আমার সম্ভ্রম, আমার সুনাম, আমার অতীত, আমার ভবিষ্যৎ, সমস্তই এক মুহূর্তের একটিমাত্র ভুলে ছারখার হ'য়ে যেতে পারে। মীরার মন আমি জানিনা, সে যে কি ভাবে গ্রহণ করবে সে সম্বন্ধেও আমার কোনো ধারণা নেই। যদি সে জোরে চেঁচিয়ে ওঠে, যদি যোগেনকে জানিয়ে দিয়ে একটা কাণ্ড ক'রে বসে,—কিন্তু এত কথা ভেবে দেখবার শক্তি আমার ছিল না। ভাবনা চিন্তা ভয় সমস্তই ভুলে গিয়ে আমি উন্মাদের মতো মীরাকে চুম্বন ক'রে ফেললাম। সম্ভবত তখন আমি খুব কাঁপছিলাম। চুম্বনটা ঠিক জায়গায় পড়লো না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পড়লো গিয়ে কপালের ওপরে।

সজ্ঞান হ'য়ে মীরার দিকে চেয়ে দেখি, সে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেন কাঁপছে। মুখে কোনো সাড়াশব্দ নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বারান্দায় চটিজুতোর শব্দ শোনা গেল। তৎক্ষণাৎ আমি চেয়ারটার ওপরে বসে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে যোগেন ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

মীরাকে সে বললে,—কৈ চা করতে গেলেনা, এখনও দাঁড়িয়ে আছ?

মৃদুস্বরে মীরা বললে,—এই যাচ্ছি। তৎক্ষণাৎ সে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে শান্তপদে এসে মীরা টেবিলের ওপর চা রেখে গেল। অন্যান্য দিন সে আমার হাতে হাতেই চা দিয়ে যায়, এ দিন দূর থেকে রেখে গেল টেবিলের ওপর। আমার দিকে চাইলে না, কোনো কথাও বললে না। মুখখানা যেন শ্রাবণের মেঘের মতো থমথমে।

সারা রাত আমার অনিদ্রায় কাটলো। আমি নিজেই কখনো কল্পনা করিনি যে এমন কাণ্ড আমাব দ্বারা সম্ভবপর হ'তে পারে, অথচ আজ তাই আমার দ্বারাই ঘটেছে। কিসের প্রেরণায় কেন আমি হঠাৎ এমন অবিবেচনার কাজ করলাম? ভাবতে ভাবতে আমার অনুশোচনার অন্ত রইল না। মীরা কি ভাবছে? কেমন ক'রে আব ওব কাছে মুখ দেখাতে পারবো?

পরদিন সকালে উঠেই ছুটে গেলাম ওদের বাড়িতে। মীরার কাছে ক্ষমা চাইবো। বলবো যে নিতান্ত ভুলক্রমে যা ক'রে ফেলেছি সে দোষটাকে যেন ও নির্দোষ স্নেহ বলেই মনে করে। অন্ততপক্ষে যোগেনকে এ সম্বন্ধে যেন কিছু না বলে।

গিয়ে শুনলাম, মীরা গেছে গঙ্গাস্নানে। যোগেন হাসতে হাসতে বললে,—আজ ভোরে উঠেই ওব কি খেয়াল হোলো, বললে গঙ্গাস্নান ক'রে আসি। মেয়েদের যেমন কাণ্ড।

শুনেই আমার অন্তরে দারুণ একটা ধাক্কা লাগলো। আমার মুখের স্পর্শ লাগলে গঙ্গাস্নানের প্রয়োজন হয়? আমি কি এতই অশুচি, এতই ঘৃণ্য?

সেদিন কলেজে লেক্‌চারের বিষয় ছিল আমাদের বক্ষপিঞ্জরের ক্রিয়া। আমরা যে অনবরত নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করি ও গ্রহণ করি, সেটা আমাদের ইচ্ছা অনুসারে হয় না। মাংসপেশীর অদম্য ক্রিয়াতে বক্ষপিঞ্জর স্ফীত হ'লে সেই শূন্যস্থানে বায়ু আপনা আপনি প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। যদিও মনে করি বটে যে আমার নিজের ইচ্ছাতেই ওগুলো হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। এই সহজ কথাটা ছেলেদের সেদিন কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না।

মীরার কথা

ভোরবেলাকার গঙ্গা বড়ো সুন্দর। সেই ছেলেবেলায় দেখেছিলুম, অনেকদিন পরে সেদিন গঙ্গার ধারে গিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি ভালো লাগলো। দেখলুম, সূর্যোদয় এখনও হয়নি, কিন্তু এখনই হবে। গঙ্গার স্থির জলে এক একবার কিছু চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে, যেন জলকুমারীদের একটু একটু ক'রে ঘুম ভাঙচে। তখনো স্নানার্থীর ভিড় হয়নি, দু একজন মাত্র জলে নেমেছে। ঐ সেই ওপার দেখা যাচ্ছে, তখনকার দিনে যেমন দেখা যেতো, আর আমি ভাবতুম ওপারে না জানি কত কী আশ্চর্য সামগ্রী আছে। সেই জানকীমায়ীর সময়কার গঙ্গা, যেমন তখন ছিল এখনো ঠিক তেমনি আছে। জানকীমায়ীর জন্যে সেদিন বড়ো মন কেমন করেছিল। তিনি বলেছিলেন একজনের হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে যাবেন, তার কত আগেই চলে গেলেন।

রাত্রের সেই অত্যাশ্চর্য ঘটনার সম্বন্ধে অনেক ভেবেচিন্তে দেখলুম যে আমারই অপরাধে সব ঘটেছে, ওঁর দোষ নেই। মানুষকে প্রলুব্ধ করাটাই আমাদের জাতের চিরকেলে স্বভাব। অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের প্রলুব্ধ করবার প্রবৃত্তিটা এসে পড়ে, ওতে আমাদের একটা বিজাতীয় উল্লাস আছে। নিশ্চয় তেমনিভাবেই আমি ওঁকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলুম, তা না হ'লে কী ওঁর পক্ষে এমন কাজটা করা সম্ভব? শুধু স্বপ্নেই যা ঘটে, বিনা কারণে বাস্তবে কী তাই সম্ভব? কিন্তু এ যে নিজের অনিষ্ট আমি নিজেই করেছি। যে বন্ধুত্ব আমাদের মধ্যে দিনে দিনে প্রগাঢ় হ'যে উঠছিল সে বন্ধুত্ব আর কেমন ক'রে থাকবে? এর পরে মুখের দিকে চাইলেই মাথাটা হেঁট হ'য়ে যাবে, কথা বলতে লজ্জা করবে, কাছে যেতে সঙ্কোচ হবে, তেমন সহজভাবে আর কিছুতেই মিশতে পারবো না। এমন একটি মধুর বন্ধুত্ব আমি নিজের দোষেই নষ্ট করলুম?

কিন্তু কী দোষ যে আমার হয়েছিল সেটুকু এখনো বলা হয়নি, তা কেবল আমিই জানি আমার মনে মনে। সেটুকু এখানে প্রকাশ করা দরকার।—

দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে হয় সৌন্দর্যের দর্শনী দিয়ে, পুরুষকে চমকিত করতে হয় নারীবৈচিত্র্যের বাছা বাছা ঝকমকি দিয়ে, এ কথা বোধ হয় সকল মেয়ে আপনা থেকেই শেখে। অন্তত এ বিদ্যাটা আমাকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি। ওঁকে দেখবার পর থেকেই আমি নিজে নিজে আবিষ্কার করতে লাগলুম, কোথায় আমি দেখতে সুন্দর, কোথায় অসুন্দর। স্নানের ঘরে স্নান করতে গিয়ে আয়নার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি, চিত্রকরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে নিজেকে নিরীক্ষণ করি আর নিজের মনে ভাবতে থাকি,—কোথায় কোন সজ্জাটির সন্নিবেশ করলে কমনীয়তা আরো বেড়ে উঠবে।

আমি দেখলুম, সামনের চুলগুলোকে মাথার ওপরে সটান পাট ক'রে দিয়ে কপালটিকে মরুভূমির মতো করলে আমায় ভালো দেখায় না। তার চেয়ে আল্গা বিনুনি ক'রে ঘাড়ের কাছে নিম্নমুখী খোঁপা বাঁধলে, আর সামনের চুলে ঢিল দিয়ে কপালটা একটু ছায়াযুক্ত করলে অনেক ভালো দেখায়। আমি অনেক বারের বদলাবদলির পরে চুল বাঁধবার একটা নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার ক'রে নিয়েছিলুম, যেটা আমার মৌলিক গবেষণার ফল। চুলের সঙ্গে কালো ফিতের বদলে সোনার বিছে দিয়ে বিনুনি করা, এটাও আমার আবিষ্কার। আমি দেখলুম ওতে চুলের বাহার খোলে। তেমনি আরো দেখলুম, হাতাওয়ালা জামা আমাকে মানায় না, হাতা-কাটা টাইট্ জ্যাকেট পরলেই আমাকে বেশ মানায়। কঙ্কন কিংবা বালা পরলে আমার হাতখানা যেন ঢন্‌ঢন্ করে, তার চেয়ে সরু সরু এক গোছা পল-কাটা চুড়ি পরলে হাত দুটিকে অনেক ভালো দেখায়। কানে বড়ো বড়ো কানপাশা পরলে আমার ছোটো মুখখানা যেন তাতেই চাপা পড়ে যায়, তার চেয়ে সবুজ পাথরের দুটি ছোটো দুল পরলে অনেকটা মানানসই হয়।

এ সব কী আমি শুধু নিজের চোখ দিয়েই দেখতুম? তা নয়, দেখতুম আমি ওঁর চোখ দিয়ে। আমার স্বামীর জন্যে এ সবের কখনো প্রয়োজন হয়নি। চারুকলার মর্ম তিনি কিছু বোঝেন না, তাঁর পছন্দ উল্টো রকমের। সুতরাং তখন এই দিক দিয়ে কোনো চর্চাই আমার হয়নি, যেমন মায়ের কাছে শিখেছিলুম তেমনি করতুম। হঠাৎ দেখলুম যে আর ওতে চলবে না, নতুন দুটি চোখ আমার দিকে চেয়ে আছে। সেই দুটি চোখকে মুগ্ধ করবার জন্যে আমাকে নতুন ভাবে সাজতে হবে। প্রত্যহই নতুন নতুন সাজ বদল করতুম আর চেয়ে চেয়ে দেখতুম তাঁর চোখ দুটির দিকে। প্রশ্ন করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, ওঁর চোখের দিকে একবার চাইলেই বুঝতে পারতুম, খুশি হয়েছেন কিনা। খোকার দ্বারাও আমার পরীক্ষা চলতো। রংবেরংএর জামা তার গায়ে দিতুম পরিয়ে, ঠিক সেই অনুসারেই দেখতুম কোনোদিন বা উনি খোকাকে আদর ক'রে ডাকতেন, বলতেন—বাঃ কী চমৎকার মানিয়েছে,—আর কোনোদিন বা কাছে গেলেও মোটেই গ্রাহ্য করতেন না। তাতেও বুঝতে পারতুম রংএর দিকে ওঁর নজর আছে, আর কোন রংটা উনি বেশি পছন্দ করেন। ঘোর নীল আর টক্‌টকে ঘোর লাল রং ওঁর খুব পছন্দ, এটা না বললেও আমি জানতুম। চাঁপা রংটাও ওঁর পছন্দ ব'লে আমার মনে হয়েছিল, কিন্তু চাঁপা রংটা আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনা, তাই ইচ্ছে ক'রেই ও রংএর শাড়ি কখনো পরিনি। আসমানি রং অতটা উগ্র নয়। ওটা আমারও পছন্দ, আর দেখেছি ওঁরও বেশ পছন্দ। ও রংটা আমি প্রায়ই ব্যবহার করতুম। ঘোর নীল কিংবা টক্‌টকে লাল রংএর শাড়িগুলো সর্বদা ব্যবহার করতুম না, পাছে অতিব্যবহারে সেগুলো পুরোনো দেখায়। সেগুলো স্বতন্ত্র ক'রে তুলে রাখতুম বিশেষ বিশেষ সময়ের জন্যে। কয়েকদিনের ছুটির পরে যেদিন হয়তো দেশ থেকে ফিরে উনি বিকেলে আমাদের বাড়িতে আসবেন তখনকার জন্যে, কিংবা যেদিন হয়তো ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কোথাও যেতে হবে সেদিনকার জন্যে।

এ গুলোকে যে ছলাকলার কৌশল বলা হয় তা আমি জানি। কিন্তু ওঁকে একটু মুগ্ধ ক'রে মনে মনে একটু তৃপ্তি পাওয়া ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলনা। আমি চেষ্টা করচি ওঁকে খুশি করতে, উনি তাতে খুশি হচ্ছেন, এই টুকুতেই আনন্দ। আমিও তা বুঝতে পাবচি, আর উনিও তা বুঝতে পারচেন, এইটুকুতেই আনন্দ।

সারাদিন ধরে প্রত্যাশিত দিনান্তটুকুর জন্যে ঐ সব নিয়ে ছিল আমার নৈমিত্তিক কাব্যরচনা। সারাদিন ধরে কত কথাই মনে জমে ওঠে, কতই কিছু দেখাবার এবং শোনাবার সামগ্রী মনে মনে সংগ্রহ ক'রে রাখি, কিন্তু সময়ের অভাবে সব সংক্ষেপে সাবতে হয়, আগের থেকে তাই প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হয়। সুদীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দুএকটি ঘণ্টা কতটুকুই বা সময়, দেখতে দেখতেই কেটে বায়। অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী আমার শ্রোতা, তাই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আমার কাব্য। শ্রোতা শুনে যায় নিঃশব্দে, আমারও কাব্যরচনা সার্থক হয নিঃশব্দে।

এই শ্রোতাকেই আমি আগে কিছু দেখাতে শোনাতে পারছিলুম না। আগে উনি আমার মুখের দিকে চাইতেন না, ক্রমশ দেখলুম উনি চেয়ে দেখছেন এবং ওঁর দৃষ্টি নিতান্ত নিরাসক্ত নয। এইটুকুই আমার পুরস্কার। আমি যা চেয়েছিলুম তাই পেয়েছি, আহ্বান ক'রে সাড়া মিলেছে, এইটুকুই আমার যথেষ্ট। এতে কারো কিছু ক্ষতি করা হচ্ছে না, কাউকে কিছু থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না, সুতরাং আমিও এর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'তে চাইনা।

অনেক সাধনার পরে যেটুকু পাওয়া সেটুকু আমার অব্যাহত থাক। মানুষ বড়ো অনিশ্চিত, মানুষের মতিগতি অনিশ্চিত, সময় সুযোগ সমস্তই অনিশ্চিত। এখানে অনবরতই চলেছে যে অদলবদল আর ভাঙাগড়ার হট্টগোল, পুরুষের মনেব মধ্যে অনবরতই পড়ছে তার প্রতিচ্ছায়া। এর মধ্যে আমার ঐ যৎসামান্য পাওয়াটুকু অক্ষুণ্ণ থাক।

ঐ সময়ের একটা দিনের কথা আমার মনে আছে। ওঁদের কলেজে চারদিন ছুটি ছিল, চারদিন দেশে থেকে সেদিন উনি কলকাতায় ফিরেছেন।

জানি যে বিকেলে নিশ্চয় আমাদের বাড়িতে আসবেন। সুরেন ঠাকুরপোর সঙ্গে কলেজে দেখা হয়েছে, তাকেও বলে দিয়েছেন আসবেন, সে কলেজ থেকে ফিরেই আমাকে জানিয়ে গেল। আমি সব চেয়ে পছন্দসই রংএর শাড়িখানা পরে' ওঁর জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। বিকেল গিয়ে সন্ধ্যা এসে পড়লো, তবুও উনি এলেন না। যতই সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায় ততই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠি, স্থির থাকতে পারিনা। বাইরের বারান্দাটা আমাদের গলির ধারে, সেখান থেকে লোক চলাচল দেখা যায়। আমি ঘরে আর টিঁকতে পারলুম না, সেই বারান্দায় গিয়ে গলির মোড়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বসে রইলুম। সেদিক থেকে অনেক লোক আসে, দূর থেকে অনেককে দেখলেই মনে হয় বুঝি উনি আসচেন, কিন্তু একটু কাছে এলেই নিজের ভুল বুঝতে পারি। এমনি ক'রে দেখে দেখে যখন চোখ দুটো ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো তখন আর মোটে চাইলুম না, চোখ বুজে সেখানেই বসে রইলুম। ভাবলুম, মিথ্যা চেয়ে থেকে কোনো লাভ নেই, আমি আর চাইবো না। উনি আজ আর আসবেনই না। দারুণ অভিমানে আমার সমস্ত বুকটা যেন ফেটে যেতে লাগলো। কেনই বা উনি আসবেন, সবেমাত্র আজই ফিরেছেন ওঁর সুন্দরী স্ত্রীর কাছ থেকে? কিন্তু কেন তবে এমন ক'রে বলে পাঠালেন? সে হয়তো ইচ্ছে ক'রেই, আমার অভ্যর্থনার আয়োজনকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে। আমার সজ্জা ব্যর্থ, আমার প্রতীক্ষা আর আকিঞ্চন আজ সবই ব্যর্থ, এই আমার উপযুক্ত শাস্তি। পরকে আপন করতে চাইলে এমনি শাস্তি পেতে হয়। বেশ, এই শাস্তি যদি উনি দিয়ে থাকেন, তা মাথা পেতে নিলুম। আর আমি চাইবো না। উনি নিজে এসে ডাকলেও আর আমি চাইবো না। প্রতিজ্ঞা করলুম এ চোখ আমি আর খুলবো না,—কিছুতেই না, কিছুতেই না।

উনি যখন এলেন তখন রাত্রি প্রায় ন'টা। চোখ বুজে বসে থাকতে থাকতে আমার তখন তন্দ্রা এসে গেছে। ঘরে-ঢুকে কাউকে দেখতে পাননি, খুঁজতে খুঁজতে বারান্দায় এসে দেখতে পেয়েছেন যে বসে বসে আমি ঢুলছি। দূর থেকে

ডেকে আমার সাড়া পাননি, তখন কাছে এসে ডেকেছেন। যদিও ওঁর ডাক শুনেই আমার তন্দ্রা ছেড়ে গেছে, তবু অভিমানটা তখনো মনের মধ্যে প্রচণ্ড হ'য়ে আছে। আমি বললুম,—না না, আমি কিছুতেই চোখ খুলবো না। উনি তখন ঝুঁকে পড়ে আমার চোখের দিকে চেয়ে বললেন,—একি সত্যিই আপনি চোখ বুজে রয়েছেন, বসে বসেই ঘুমোচ্ছেন নাকি? উঠবেন না? আমায় একটু চা ক'রে দেবেন না? তৎক্ষণাৎ চোখ চেয়ে অপ্রস্তুত হ'য়ে বললুম,—ঘরে চলুন, এখনই আমি যাচ্ছি। ভাগ্যিস বারান্দাটা অন্ধকার ছিল, আমার চোখের জলটা উনি দেখতে পাননি। পরে শুনলুম, কলেজে রিহার্সাল ছিল, তাই উনি বিকেলে আসতে পারেন নি। স্থরেন ঠাকুরপোকে উনি এ কথাও বলে দিয়েছিলেন, সে হয়তো ইচ্ছা ক'রেই আমাকে বলেনি।

আমার শ্বশুরের অসুখ বাড়ার পর থেকে উনি রোজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে থাকতে লাগলেন। তাতে আমার আরো স্থবিধা হলো। সন্ধ্যার সময় আসতেন, রাত্রে খেতেন এবং শুতেন, সকালে চা-টা খেয়ে চলে যেতেন। এবার তাই অনেকক্ষণের জন্যে আমি ওঁকে দেখতে পেতুম। ঐ সময় দেখতে পেলুম ওঁর বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রকমের মূর্তি,—প্রত্যেক সময়েই যেন রকম-রকমের রূপ বিকাশ। মেয়েদের যেমন সাজলেই ভালো দেখায়, পুরুষদের তেমনি না-সাজলেই ভালো দেখায়। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরেই দেখি কালকের সাজাগোজা সেই মানুষটি আর নেই, ঘুমের মধ্যেই ওঁর আশ্চর্য রকমের রূপান্তর ঘটে গেছে। মাথার চুলগুলো যেমন ভাবে এলোমেলো হ'য়ে গেছে তাও অতি চমৎকার। বোতাম খোলা জামাটার ফাঁক দিয়ে বুকটা যেন মনে হচ্ছে অনেকখানি, গলার কাছটা টক্‌টকে লালবর্ণ, কাপড় চোপড়গুলো ঢিলেঢালা, চলনে বলনে একটু শৈথিল্য, কণ্ঠস্বরে জড়িমা। ওঁর এই আটপৌরে মূর্তি আমার ভারী ভালো লাগে।

তারপরে কামিয়ে স্নান সেরে ফর্শা পোষাক পরে' যখন বেরিয়ে যান তখন সে এক স্থদীর্ঘ দৃঢ়তাব্যঞ্জক মূর্তি,— গম্ভীর, আত্মপ্রতিষ্ঠ, কর্তব্যমুখর,—দেখলে আমার শ্রদ্ধা জাগে, গর্ব হয়। কলেজ থেকে যখন ফিরে আসেন তখন ক্লান্ত মূর্তি,

মলিন মুখ, কপালে ঘাম,—তখন আমার মায়া জাগে, ইচ্ছে হয় নিজের আঁচলটি দিয়ে ওঁর মুখ মুছিয়ে দিই, নিজে হাতে জল এনে পা ধুইয়ে দিই। আর এক রকমের অভিনব মূর্তি দেখি মধ্যরাত্রে, যখন আমাব শ্বশুরের অসুখ বাড়লে সবাইকে ঘুম থেকে উঠে আসতে হয়। তখন দেখি কাঁচা ঘুম থেকে উনি উঠে এসেছেন, ঢুলুঢুলু চোখ দুটি অত্যন্ত লালবর্ণ হ'যে উঠেছে। মাঝে মাঝে হাই তুলছেন, মাথার চুলের ভেতর বারে বাবে আঙুল চালিয়ে দিচ্ছেন। শ্বশুরেব বিছানার পাশে বসে নাড়িটা ধরে জড়িতকণ্ঠে বলচেন—'সব ঠিক আছে, আপনি একটু ঘুমিযে পড়ুন দেখি,'—তখনই আমাব ওঁকে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে। তখন যদি আমার দিকে একটিবার ঐ ঢুলুঢুলু চোখ মেলে চান, তৎক্ষণাৎ আমার মনে হয় আমায় বুঝি উনি ডাকচেন। তারপরে আরো কত কী যে মনে হয় সে আমি ভাষা দিয়ে বলতে পারবো না।

এমনি ভাবেই আমাব দিনগুলো পরমানন্দে কাটছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। শ্বশুরের মুখে যেমনি একটু হাসি দেখা গেল অমনি উনি বললেন, রাত্রে আর ওঁর এখানে থাকাব কোনো দরকার নেই। শ্বশুরেব মুখটা তৎক্ষণাৎ শুকিয়ে উঠলো। আমিও বুঝতে পারলুম না কেন উনি আমাদের বাড়িতে থাকতে অনিচ্ছুক হলেন।

আমার শ্বশুর আমাকে চুপি চুপি ডেকে বললেন,—দেখ বৌমা, দেখতে পাচ্ছো তো আমার অবস্থাটা, এখনও আমি তেমন সেরে উঠতে পারিনি। আমি বুঝি সব, অমরনাথ ডাক্তাব মানুষ, রাত্রে ওদেব একটু স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়, কারো বাড়িতে রাত্রে আবদ্ধ হ'য়ে থাকা ওদের পোষায় না। কিন্তু যদি আরো কয়েকটা দিন রাখা যেতো তাহ'লে রাত্রে নিশ্চিন্ত হ'যে ঘুমিয়ে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারতুম। আমি বললে আর শুনবে না। তোমার কথাই বরং একটু মানে, তুমি বরং ব'লে ক'য়ে একটু চেষ্টা ক'রে দেখতে পাবো।

শ্বশুর বলেছেন, আমার কথাই নাকি উনি মানেন। শুনে আমি ভারী খুশি। বললুম,—আচ্ছা আমি চেষ্টা ক'রে দেখচি।

মনে মনে এক ফন্দি আঁটলুম। রোজ রাত্রে এখানেই ওঁকে খেয়ে যেতে বলবো। নিশ্চয় তাতে রাজি হবেন, কারণ খাবার লোভটি ওঁর পূরামাত্রায় আছে। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে গল্পগুজবে যখন অনেক রাত্রি হ'য়ে যাবে তখন নিশ্চয় ওঁর খুব ঘুম পাবে। তখন বলবো, আজকের রাত্রিটা এখানেই থেকে যান। তবুও কি উনি চলে যেতে পারবেন?

অভিসন্ধিটা আমার খাটলো না। খাবার নিমন্ত্রণ খুব সন্তুষ্ট চিত্তেই গ্রহণ করেন, গল্পগুজবেও বেশ মেতে ওঠেন, কথায় কথায় বেশি রাত্রি হ'লে তখন হাই তুলতেও শুরু করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানে থাকতে কিছুতেই রাজি হন না। মাঝে মাঝে ঘড়িটার দিকে নজর পড়ে, তখন ব্যস্ত হ'য়ে বলেন,—এবার আমি উঠি। আবার কিছুক্ষণ ছুতোনাতায় ভুলিয়ে রাখি, কিন্তু আবার ওঠবার জন্যে তাড়া করেন। শেষ পর্যন্ত উনি চলেই যান, একটা দিনের জন্যেও ধরে রাখতে পারি না। তখন আমার শ্বশুরের মন্তব্যের কথাটা মনে হয়,—রাত্রে ওঁদের একটু স্বাধীনতার দরকার। কিন্তু কিসের জন্যে ওঁর এই রাত্রিকালীন স্বাধীনতার দরকার? মনে একটা খট্‌কা লাগে। ওঁর ভিতরকার খবর কতটুকুই বা আমি জানতে পারি? কত কাজের মানুষ উনি, কত দিকে ওঁর মন পড়ে আছে, আমার এই অল্প একটুখানি মন নিয়ে আমি কোথায় তার নাগাল পাবো? কিন্তু নাগাল পাচ্ছিনা বলেই আমার ধরে রাখবার লোভটা আরো বেড়ে ওঠে। যতক্ষণ পারি ওঁকে ধরে রাখবার চেষ্টা করি, যতটুকু পারা যায় ততটুকুই লাভ। ওঁর দিকটা কিছুই দেখতে পাইনা, নিজের দিক দিয়েই সব কথা ভাবি। চলে তো যাবেনই, সর্বক্ষণ ধরে রাখবার উপায় নেই, দেখিনা তবু কতক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। গল্পে ভুলিয়ে ওঁকে অন্যমনস্ক রাখবার কৌশলে আমি অদ্বিতীয় হ'য়ে উঠলুম,—আর আমার স্বামীও এতে আমাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

ওঁকে আকৃষ্ট করবার জন্যে অনেক রকমের বিদ্যাই আমি খাটিয়েছি। তারপরে হঠাৎ সেদিন বুঝতে পারলুম আমার এই সকল আকর্ষণের ফল কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো। বুঝতে পারলুম যে আমার নিজের অজ্ঞাতে আমি

এমনভাবেই ওঁকে জয় করেছি, যে-রকম জয়লাভের জন্যে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। কিন্তু জয় ক'রে তার পরে আর তো কিছু ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। জয় করার উল্লাসটুকু তখন আপনিই এসে পড়ে, সহস্র দ্বিধাসংকোচ আর অপরাধ-বোধের ভিতর দিয়েও আপন অন্তরে-অন্তরে গোপনে-গোপনে অতি সুমিষ্টভাবে সেটুকুর উপভোগ হ'তে থাকে। আর প্রস্তুত ছিলুম না যে বলছি, কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে বলি? যতটুকু আমি নিজে বুঝতে পারি ততটুকুই কী আমার সব? নিতান্ত আমোদের ছলেই যা আমি করছি ব'লে মনে মনে ভেবে নিয়েছিলুম, যা নির্দোষ ব'লে এ পর্যন্ত আমার খুব ভালোই লাগছিল,—সেই খেলা আমার অন্তর্যামীই অন্তরাল থেকে আমায় শিখিয়ে দিচ্ছিল কিনা, এবং তার ফলাফল আগের থেকেই কিছুটা অনুমান ক'রে রেখেছিল কিনা, এত খবর আমি কী জানি?—

যাই হোক, সেদিন জয়লাভও করলুম, নিজের দ্বিধা কাটাতে গঙ্গাস্নানও ক'রে এলুম, তবুও যেন অপরাধের ভাবটা কিছুতেই আমার কাটছিল না। অভাবনীয় একটা ঘটনা ঘটে গেছে, কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারছি না, স্থির করতে পারছিনা আজই বিকেল থেকে ওঁর সঙ্গে কেমন ভাবে আমার চলা উচিত,—এত রকমের জটিলতা নিয়ে শান্ত হ'য়ে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য। ঠাকুরপো এসেছিল আমাকে ঠাট্টা করতে, কথায় কথায় সেদিন তার সঙ্গে খুব একচোট ঝগড়া হ'য়ে গেল। ভিতরকার রুদ্ধ আবেগটা তাতেই অনেক বেরিয়ে গেল। খানিকটা ঝগড়া ক'রে আমি বাঁচলুম।

জলযোগ সেরে সংসারের কুটনো কুটে দিয়ে সবেমাত্র বাংলা দৈনিক পত্রখানা নিয়ে বসেছি, এমন সময় দাঁতে ব্রাশ ঘষতে ঘষতে মুখে একমুখ টুথ-পেষ্টের ফেনা নিয়ে ঠাকুরপো এলো আমার ঘরে। ওর কয়েকটা কথায় বুঝলুম যে আগেকার সেই অপমানটা ও ভোলেনি, আজ একটা সুযোগ পেয়ে সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে এসেছে।

ঘরে ঢুকেই পেষ্ট মাখানো দাঁতগুলো বের ক'রে হাসতে হাসতে সে বললে,—ইস্, গঙ্গাস্নানে গিযে খুব ফোঁটা তিলকের বাহার ক'বে আসা হযেছে দেখচি। একজনেব যতই ভক্তিব মাত্রা বেড়ে উঠছে, আর একজনের ততই ছুটোছুটির মাত্রা বেড়ে উঠছে। তোমাদের এই লুকোচুরির ব্যাপাবটা কী চলছে বলতো?

একে তো অমনভাবে দাঁতে ব্রাশ করতে করতে কথা বলতে আসাই মহা অসভ্যতা, ওতে আমার অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয। তার ওপরে ওর ঐ চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠলো। বললুম—যাই চলুক না, তাতে তোমাবই বা এত গাযের জ্বালা কিসের? গঙ্গাস্নানে গিযেছিলুম, আমার খুশি। তাও কী তোমার কাছে বিদ্রূপের বিষয় নাকি? ভারী যে রুচিবাগীশ দেখচি!

—না না, কথাটা ঘুরিযে নিলে চলবে কেন? একজন ভোবে উঠেই চলে গেলেন গঙ্গাস্নানে, আর একজন ভোবে উঠেই ছুটে এলেন তার খবর নিতে, সেই কথাই বলচি। এতে আমাদের গায়ের জ্বালা তো একটু হ'তেই পারে।

—আহা, কে আবার এসেছিল খবর নিতে?

—আবাব কে আসবে, আমাদের হিবো, ডক্টর অমর চৌধুরী!

—কেন, আমাকে তাঁব এখন কিসেব দরকার?

—তোমাকেই তো তাঁর আসল দরকাব। কিসের দরকার সে কথা কী আমরা বলতে পাবি, বলতে পাবো কেবল তুমি আর তিনি। আমরা হচ্ছি বাইবের লোক, নিতান্ত থার্ড পার্সন। তবে যেমন ভাবে তিনি হন্তদন্ত হ'য়ে এলেন আর হন্তদন্ত হ'য়ে চলে গেলেন, বাবার সঙ্গে একবার দেখাটা পর্যন্ত করতে পারলেন না, তাতেই কতকটা অনুমান করতে পারি, তোমাদের ভিতরকার কোন কলটা বিগ্ড়েছে।

—যাও যাও, বাজে ঠাট্টা করতে হবেনা। ঠাট্টারও একটা সীমা আছে। আমি তোমার বৌদি হই, ভুলে গেছ বোধ হয়? মুখটা আগে ধুয়ে সভ্য হ'য়ে এসো দেখি।

—যাচ্ছি যাচ্ছি, কিন্তু এটা ঠাট্টা নয়, সীরিয়াস্‌লি বলছি। তোমাদের একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে বৌদি। ওঁর সঙ্গে তোমার এতটা ঘনিষ্ঠতা কিসের বলতো শুনি?

—সে তুমি বুঝবে না। তুমি যাও যাও, এখন যাও, আমাকে চটিয়ো না।

—ঠাট্টা করতে গেলেও চটে উঠছো, এ তো ভালো কথা নয়। ঐ রাগটাই হচ্ছে সব চেয়ে খারাপ লক্ষণ।

—এতে রাগ হয় বৈকি। একে বুঝি ঠাট্টা বলে? তুমি কি আমার গার্জেন যে আমার কাজের কৈফিয়ৎ চাইতে এসো? তোমার দাদা কিছু বলেন না, বাবা কিছু বলেন না, তোমার এত মাথাব্যথা কিসের? যিনি তোমার দাদার বন্ধু তিনি আমারও বন্ধু, এই তো সোজা কথা। এতে' তোমার কী বলবার থাকতে পারে?

—বন্ধুত্ব হয় সমবয়সীর সঙ্গে। দাদার উনি বন্ধু হ'তে পারেন, কিন্তু তোমার চেয়ে উনি অনেক বড়ো, ওঁর সঙ্গে মাঝের থেকে তোমারই এত ঘনিষ্ঠতা হয়, এর মানে কী?

—বন্ধুত্বের তুমি কতটুকু বোঝো? ওঁকে আমি আন্তরিক ভক্তি করি, শ্রদ্ধা করি, বিশ্বাস করি, এই হচ্ছে ওর মানে। সামান্য বন্ধুত্বের চেয়ে অনেক বড়ো জিনিস এটা, কিন্তু তোমাকে ব'লে কোনো লাভ নেই, তুমি কিছুই বুঝবে না।

—বুঝি বৈকি একটু একটু। ভেতরে রয়েছে সেই মাংসের গন্ধ, শুধু একটু সাত্ত্বিক স্টাইলের চন্দনের ছাপ মেরে পবিত্রতার গন্ধ মাখিয়ে লোককে দেখানো।

—তোমার স্পর্ধা তো কম নয়! যেমন ইতর মন তেমনি কথাই তো বলবে। যার নিজের চোখ হল্‌দে সে সব জিনিসই দেখে হল্‌দে। ও ছাড়া যে আরো অন্য রকমের রং থাকতে পারে সে তোমার পোড়া চোখে লাগবে কেন?

—ঠিক বলেছ বৌদি, এত রংএর নজর আমি পাবো কোথায়? তোমরাই হচ্ছো রংএর সমজদার, তাই তো তুমি রোজ বিকেলে রংবেরংএর শাড়ি পরো।

আবার উনিও পরেন রকমারি শৌখীন নেক্‌টাই। আজকাল কতই বাহার খুলচে,—হপ্তায় হপ্তায় হেয়ার-কাটাবের দোকানে চুল ছাঁটা হয়, রুমালে সেন্ট্ লাগানো হয। আবার কলেজে পর্যন্ত আমাকে ডেকে বলা হয়,—তোমার বৌদি বড়ো রোগা হ'য়ে যাচ্ছে, তাকে একটু দুধ খেতে বোলো। আমি কেবল মনে মনে হাসি। আমরা যত্ন জানিনা, উনি আমাদের শিখিয়ে দেবেন। তোমাদের দুজনেরই চোখে কিসের রং লেগেছে সে তো স্পষ্ট দেখতেই পাচ্ছি। যাক্, এ সব কথায আমার থাকবার দরকারই নেই।

ঝগড়াটা অবশ্য দুদিন পরেই মিটে গেল। আমিই শেষ পর্যন্ত নরম হ'য়ে মিটিয়ে নিলুম। আমার ভালো লাগাব কথাটা আমি খোলাখুলি ওকে জানিয়ে দিলুম। ভাবলুম যে এতে গোপন করবার কিছুই নেই, গোপন করতে গেলেই বরং আবো খারাপ দেখায। আর এই সব মনের কথা চেপে রাখাও কঠিন, শোনাবার জন্যে একজন বন্ধুর দরকার, ঠাকুরপো আমার সেই বন্ধুই হোক।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত ঝগড়া করলুম তিনিই হ'য়ে উঠলেন বিমুখ। সেদিন বিকেল থেকেই উনি আমাব সঙ্গে অত্যন্ত অদ্ভুত রকমেব নিষ্ঠুর আচরণ করতে শুরু কবলেন। এটা আমি মোটেই প্রত্যাশা করিনি। সেদিন বিকেলে যখন উনি আমাদেব বাড়িতে এলেন তখন প্রাণপণে সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে আমি নিজের হাতে ওঁকে চা দিতে গেলুম। উনি চায়ের পেযালাটা আমার হাত থেকে নিলেনই না, বললেন,—বেখে দিন ঐ টেবিলে, একটু পরে খাবো। কণ্ঠস্বরে একটা অমানুষিক রূঢ়তা।

এও বরং সহ্য করা যায়,—কিন্তু এব পর থেকেই অতিমাত্রার সৌজন্য আর মৌখিক ভদ্রতার বাড়াবাড়ি দেখিয়ে যে নির্মম আচরণটা উনি আমার সঙ্গে করতে লাগলেন, সে মোটে সহ্য করা যায় না। এতে বাইরের লোকের চোখে কিছুই বিসদৃশ দেখায় না বটে, কিন্তু যিনি অত্যন্ত অন্তরঙ্গ, তিনি যদি একান্তই পরের মতো অনবরত একটা লোক-দেখানো ভদ্রতার মুখোস নিয়ে সৌজন্যের কাঁটা বিঁধিয়ে কথা বলেন তাহ'লে সেটা কেমন লাগে? উনি যেন আমার কাছ

থেকে অনেকটা তফাতে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, মনের ভাবটা যেন এই যে নিজেও আর কাছে আসবেন না, কিংবা আমাকেও কাছে ঘেঁষতে দেবেন না।

সে কয়েকটা দিন যে আমাব কী কষ্টে কেটেছে তা বলতে পারি না। অপরাধ যদি কিছু ঘটেও থাকে, তবু যা ঘটেছিল তা স্বয়ং উনিই করেছেন, অথচ তার শাস্তিটা পাবো আমি? বিচার মন্দ নয়। কিছুতেই বুঝতে পারিনা কেন উনি আমাকে এমন দুঃখ দিচ্ছেন। পুরুষ মানুষের মন যেন জটিল গোলকধাঁধা। সোজা পথ ভেবে যেদিক দিয়েই অগ্রসব হই সেদিক থেকেই আঘাত পেয়ে ফিরে আসি।

কিন্তু আমার প্রিয়ব্যক্তিকে আমি পেয়েছি, তাঁকে আমি একদিনেব জন্যেও জয় করতে পেবেছি, এ কথা তো মিথ্যা নয়। এই আনন্দটুকু বুকে নিয়ে এখন আমি সকল রকমের নির্যাতন গ্রহণ করতে প্রস্তুত। এখন আর আমার কিছুই গায়ে লাগবে না। সেই আনন্দটুকুব কাছে সকল আঘাতই তুচ্ছ হ'যে যাবে।

সৃষ্টিকর্তা বোধ হয় আমার এই কথাগুলো শুনে খুব হেসেছিলেন।

আমার নির্যাতন যথেষ্টই হ'তে থাকলো। কলেজে পূজোব ছুটি পড়লো, উনি দীর্ঘ দেড় মাসের জন্যে দেশে চলে গেলেন। যাবার আগের দিন আমাকে বললেন,—দেশে যাচ্ছি। শুধু এইটুকু, আব কিছু না। কবে যাচ্ছেন, কোন ট্রেণে যাচ্ছেন, কতদিনের জন্যে যাচ্ছেন, কিছুই না। যেন ও বিষয়ে জানবাব আমার কোনো অধিকার নেই, কোনো প্রযোজন নেই। আর সেখানে যতদিন থাকবেন ততদিন যে আমার কাছ থেকে একেবারে লুপ্ত হ'য়ে থাকবেন, এ তো জানা কথা। আমরা ওঁর কাছে নিতান্তই পর। মুহূর্তেব জন্যে হযতো ভুল ক'বে ভেবেছিলেন আপন, এবার সেটা সংশোধন ক'বে আসবেন। এবার হয়তো ফিরে আমাদের বাড়ির দিকেই মোটে আসবেন না।

কিন্তু উনি যে ডাক্তার, এইটুকুই আমার সুবিধা। অসুখবিসুখ হ'লে না এসে ওঁর উপায় কী? আমার যদি খুব দারুণ অসুখ হয়? তখন ওঁকে আসতেই

হবে। যতই উনি পর ভাবুন, যতই ওঁর সুন্দরী স্ত্রীর নিষেধ থাক, তবুও আসতে হবে। তখন না এসে ওঁর উপায় কী?

এবার তবে তাই হোক, খুব মারাত্মক রকমের একটা অসুখ হোক আমার। হয় নিউমোনিয়া, না হয় টাইফয়েড, না হয় থাইসিস,—যাতে অনেক দিন পর্যন্ত ভুগতে হয়, রোগের যন্ত্রণায় যাতে আমাকে অনেকদিন ছট্‌ফট্‌ করতে হয়। এখন থেকেই রোগটা ধীরে ধীরে পেকে উঠুক, ওঁর যখন দেশ থেকে ফেরবার সময় হবে তখন খুব বাড়াবাড়ি হ'য়ে উঠুক, উনি এসেই যেন তাই দেখে খুব ভয় পান, রাত্রেও যেন মেসে ফিরে যেতে না পারেন। তখন আমি দেখবো, আরো কতখানি নিষ্ঠুরতা করতে পারেন।

কায়মনোবাক্যে তাই প্রার্থনা করতে লাগলুম, প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলুম যাতে আমার ঐ রকম একটা রোগ হয়। দুষ্টবুদ্ধির প্রয়োজন হ'লে অনেক রকম ফন্দি আমার মাথায় খেলে। দুবেলা গায়ে জল ঢেলে ভিজে মাথায় ভিজে কাপড়ে বসে থাকি, বাড়ির খাদ্য নর্দমায় ফেলে দিয়ে অখাদ্য এবং কুখাদ্য খেয়ে পেট ভরাই, গরম লাগছে ব'লে ভিজে মাটিতে শুয়ে থাকি, ট্যাঙ্কের জলের কল থেকে জল নিয়ে খাই, রাত্রি জেগে জেগে বই পড়ি। অনিয়ম এবং অত্যাচার যত রকম করা সম্ভব সমস্তই করতে থাকি।

শুনেছিলুম যে সৃষ্টিকর্তা আমাদের কারো কথাই শোনেন না। কিন্তু কেন জানিনা, আমার এই ঐকান্তিক ইচ্ছার কথাটা তিনি সেবার শুনে ফেললেন।

প্রায় পাঁচ ছয় মাস আগের থেকেই শরীরটা আমার একটু একটু খারাপ যাচ্ছিল। খাওয়াতে রুচি ছিলনা, পেটে একটা ভার বোধ করতুম, সিঁড়ি দিয়ে অনায়াসে ওঠানামা করতে পারতুম না, একটুতেই যেন হাঁপ লাগতো। তার পরে আমার অযত্নে আর অত্যাচারে ক্রমশ এইগুলো আরো বেড়ে উঠতে লাগলো, শেষে এমন হলো যে প্রায় শয্যাগত হবার উপক্রম। আমার শাশুড়ী বললেন, ও কিছু নয়, পেটে আবার একটি সন্তান এসেছে, এখন তো শরীর খারাপ হবেই। পেটে ভারবোধ হচ্ছে দেখে আমিও অনেকটা তাই অনুমান করেছিলুম, এখন

শাশুড়ীর কথা শুনে লজ্জায় এবং দুঃখে আমার কান্না পেতে লাগলো। রোগ নয় কিছু নয়, সময় বুঝে আবার একটা সন্তান? উনি এলে আমি মুখ দেখাবো কেমন ক'রে? কোনো রকম একটা রোগ হ'লে যে বাঁচি। সন্তান হ'লেও কী আর রোগ হ'তে পারে না?

উনি এলেন দেশ থেকে ফিরে। তখন আমি বিছানা থেকে প্রায় উঠতেই পারি না। আমাকে দেখেই বললেন,—এ কী, আপনি এমন ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলেন কেন? শরীরে যে একফোঁটা রক্ত নেই।

আমার স্বামীকে বললেন,—এখনই একজন বড়ো ডাক্তার এনে দেখাও।

স্বামী বললেন,—তুমিই দেখনা। বোধ হয় প্রেগ্ন্যানসিতে এমন হয়েছে।

উনি বললেন,—না না, দেখছো না, একটা শক্ত ব্যারাম হয়েছে। আর অবহেলা করলেই এর থেকে থাইসিস দাঁড়িয়ে যাবে, তখন সর্বনাশ হবে।

বড়ো ডাক্তার আনা হলো। তিনি বললেন,—থাইসিস নয়, একটা স্ত্রীরোগ বলে মনে হচ্ছে। ঐ বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞকে এনে দেখাও।

আবার একজন বড়ো ডাক্তার এলেন কলেজ থেকে। তিনি এসে বললেন,—সন্তান নেই, পেটে টিউমার হয়েছে। অপারেশন করা দরকার।

পেটের যন্ত্রণায় তখন আমি আর্তনাদ করছি। তবুও আমি মনে মনে খুব খুশি, যেহেতু এটা সন্তান নয়, সত্যসত্যই একটা কঠিন রোগ হয়েছে। তখন আর না এসে ওঁর উপায় কী? প্রত্যহই ওঁকে আসতে হচ্ছে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে, আমার কাছে বসে আমার সঙ্গে গল্প করতে হচ্ছে, আমার কষ্ট দূর করবার জন্যে ওঁকে অনেক চেষ্টা করতে হচ্ছে। এতেই আমার আনন্দ। এবারেও আমার জয়।

অপারেশনের ব্যবস্থা হ'তে লাগলো। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেছিলেন যে বাড়িতে অপারেশনের চেয়ে হাসপাতালে করাই সুবিধা, কারণ সেখানে যেমন ব্যবস্থা আছে বাড়িতে তেমন হ'তে পারে না। আমার স্বামী অনেক ইতস্তত করতে লাগলেন, কিন্তু আমি বললুম,—আমি হাসপাতালেই যাবো, সেখানে

অমর বাবু আছেন, সর্বদাই আমার কাছে থাকতে পারবেন, দেখাশোনা করতে পারবেন, বাড়ির চেয়ে সেখানে অনেক ভালো হবে।

পেটের ভিতরে অপারেশন হবে এতে জীবনের আশঙ্কা আছে। বাঁচবো কী মরবো তার কোনো স্থিরতা নেই। কবিকে চিঠি লিখে এই খবরটা জানিয়ে দিয়ে লিখলুম, যদি মরেই যাই, তাঁর আশীর্বাদটুকু যেন নিয়ে যেতে পারি। তিনি তার উত্তরে লিখলেন,—আমি আশীর্বাদ করছি, তুমি সেরে উঠবে। কষ্টভোগ কিছু আছেই, কিন্তু কষ্টকে তুমি ভয় পেওনা। তুমি দেখো, প্রিয়ব্যক্তি কেউ কাছে থাকলে রোগের কষ্ট অনায়াসে সহ্য করা যায়। সকল কষ্টকে তুচ্ছ ক'রে রোগ থেকে সেরে ওঠো, এই আশীর্বাদ আমি করছি।

তিনি অবশ্য কিছুই জানতেন না, কিন্তু কবির কথা যে কতদূর সত্য হ'য়ে যায় তাই ভেবে আমি আশ্চর্য হ'য়ে গেলুম। সত্যি কথাই বলছি, কষ্ট সহ্য করতে আমি একটুও ভয় পাইনি। যখনই ভয়ের কথা মনে হয়েছে তখনই ভেবেছি, আমার প্রিয়ব্যক্তি রয়েছেন এত কাছে, আমার আবার ভয় কী?

হাসপাতালে একটি স্বতন্ত্র কেবিন নেওয়া হলো, নার্স নিযুক্ত করা হলো, কয়েকদিনের মধ্যেই আমার অপারেশন হলো। আগের থেকেই বলে রেখেছিলুম অপারেশনের সময় যেন আমার কাছে উনি দাঁড়িয়ে থাকেন। যখন ক্লোরোফর্ম করবার সময় হলো, উনি এসে দাঁড়ালেন আমার মাথার কাছে। আমি ওঁর হাতখানা জোর ক'রে চেপে ধরে চোখ বুজলুম। সম্পূর্ণ অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত হাতখানা আমি ছাড়িনি।

অপারেশনের পরে কয়েকদিন পর্যন্ত সর্বশরীরে যে কী ভীষণ যন্ত্রণা! ওষুধ খেয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ঘুমোই, আবার সেই অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকি। ছটফট্ করবারও উপায় নেই, হাত পা বাঁধা। কিন্তু যে যন্ত্রণার কিছুতেই একটুও লাঘব হয়না, সে যন্ত্রণা একেবারে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে যায়,—যখন উনি আমার কাছে এসে বসেন। কষ্ট দূর ক'রে দেবার এমন আশ্চর্য শক্তি যে ওঁর আছে, এটা কে জানতো?

যখন শরীরের যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর, তখনই ওঁকে আমার সকলের চেয়ে বেশি রকম ভালো লাগে। উনি যেন কোনো মন্ত্র জানেন। কাছে বসে যেমনি নাড়ী পরীক্ষা করতে থাকেন, ওঁর সেই রিষ্টওয়াচ-বাঁধা সুকুমার হাতখানির স্পর্শ পেয়ে আমার সমস্ত কষ্ট সেরে যায়, সব ব্যথা তৎক্ষণাৎ জুড়িয়ে জল হ'য়ে যায়। ঐ স্পর্শটুকু পেয়েই আরামে আমার চোখ বুজে আসে, আমি তখন চোখ বুজে সমস্ত দেহমন দিয়ে সেই সুখটুকু নিবিড় ভাবে অনুভব করি। কিন্তু এ কথা আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে দিইনা, চোখ বুজে মিছিমিছি যন্ত্রণার অভিনয় করতে থাকি। নাড়ী দেখা শেষ হ'তে না হ'তেই আমি সজোরে ওঁর হাতটা চেপে ধরি, যেন আমার নিদারুণ যন্ত্রণার কতকটা আক্ষেপের মতো। আসলে কিন্তু তা নয়, আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল ঐ হাতখানি ধরবার, সেই আকাঙ্ক্ষাটুকু তখন প্রাণভরে পূরণ ক'রে নিই। যদিও জানি, যন্ত্রনা যা ছিল তা আর নেই, কিন্তু উনি চলে গেলেই আবার তো হবে। তার আগে যতক্ষণ সম্ভব ওঁর হাতের স্পর্শটিকে দুহাত ভরে পেয়ে নিতে চাই। চোখ দুটো ততক্ষণ বুজেই থাকি, চাইলে পাছে অনুভূতি আমার কমে যায়। চোখ আমার আপাতত বন্ধই থাক, দেহের ভিতর থেকে মনের ভিতর পর্যন্ত কেবল এই স্পর্শটুকুর মাদকতা কানায় কানায় প্লাবন জাগিয়ে তুলুক।

উনি আমার যথেষ্টই যত্ন নিচ্ছেন, দিনের মধ্যে অনেকবার আসাযাওয়া করছেন, অনেকক্ষণ আমার কাছে বসে গল্প করছেন, কিন্তু তবুও ক্রমশ বুঝতে পারলুম উনি আমার স্পর্শকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে চলছেন। যেন আমার খুব কাছে ঘেঁষতে চান না, একটু দূরত্ব বজায় রাখতে চান। এই জন্যেই আরো আমাকে যন্ত্রণার ভান করতে হয়। একটু যখন সেরে উঠে হাত পা খানিকটা নাড়াচাড়া করবার অধিকার পেয়েছি, তখন একদিন ওঁকে বললুম,—পিঠে বড়ো যন্ত্রণা হচ্ছে, আমাকে একটু বালিশে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিন না। উনি তৎক্ষণাৎ বললেন,—নার্সকে ডেকে আনছি। আমি বললুম,—নার্স পারবে না, হয়তো কোথাও লাগিয়ে দেবে, আপনি আস্তে আস্তে একটু ধরুন, তাহ'লে আমি নিজেই উঠে

বসতে পারবো। অগত্যা ওঁকেই ধরতে হলো। ওঠবার সময় আমার মাথাটা ওঁর বুকের কাছে একবার ঠেকেছিল, সে অবশ্য কতক আমার নিজের ইচ্ছাতেই। তাড়াতাড়ি উনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। হঠাৎ একটা নাড়া খেয়ে আমার একটু ব্যথা লাগলো, মুখখানা সেই আঘাতে হয়তো বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি কিছুই বলিনি, চোখ বুজে খানিকক্ষণ শুয়ে রইলুম। তবু উনি সেটা বুঝতে পারলেন, খুব দুঃখিত হয়েছেন তাও দেখলুম, অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। একটু আঘাতের বদলে পেলুম অনেকটা আরাম!

হাসপাতালে সর্বসমেত আমাকে থাকতে হয়েছিল প্রায় দুই মাসেরও কিছু বেশি। এই সময়টাতে ওঁকে একলা অনেকক্ষণ আমার কাছে পাবার সুবিধা হয়েছিল। প্রত্যহ তিন চার বাব আসতেন, ছুটি থাকলে দু-তিন ঘণ্টা বসে বসে নানা রকমের গল্পই করতেন। আমাব স্বামী বিকেলে কেবল একবার মাত্র আসতে পারতেন, কিন্তু ওঁর পক্ষে সর্বক্ষণই ছিল অবারিত দ্বার। যতদিন আমি হাসপাতালে ছিলুম ততদিন একবারও উনি দেশে যান নি। সবই ভালো, কিন্তু ঐ দূরত্বটুকু কেন রাখলেন? যত্ন করেন, স্নেহ করেন, আমার কাছে এলে খুশি হন, খানিকটা যে ভালোবাসছেন এটুকুও বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু তবু কেন একটু দূবত্ব রাখতে চান? ঐ যে মিস্ রোজ ব'লে যে মোটা নার্সটা ঢং ক'রে ওঁর সঙ্গে যেচে আলাপ করতে আসে, কথা বলতে না বলতেই হেসে এমনি গড়িয়ে পড়ে যে দেখলে আমার আপাদমস্তক জ্বালা করে, ঐ ওর সঙ্গে যেমন ভাবে মুখের হাসিটা বজায় রেখে উনি দূরত্ব বাঁচিয়ে চলেন,—আমি তা দেখলেই বেশ বুঝতে পারি ওঁর ভিতরে ভিতরে কতটা তাচ্ছিল্যের ভাব রয়েছে,—আমার সঙ্গেও কী উনি অমনি ধরণের ব্যবহার করবেন? ওতে আর আমাতে কোনো তফাৎ নেই? তবে কেন উনি আমাকে—

ওঁর স্ত্রীকেই নিশ্চয় উনি খুব ভালোবাসেন? সেইজন্যেই বুঝি উনি মেয়ে জাতের অন্য সকলকে এতটা তফাৎ ক'রে রাখতে চান? আমার সম্বন্ধেও বুঝি

তাই? একবার ভুল ক'রে খানিকটা আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেছিলেন, তাই বুঝি এখন সাবধান হ'তে চান? কিন্তু কেন? আমি তো ওঁর স্ত্রীর অধিকারে কোনো হাত দিতে চাইনি, আমি চেয়েছিলুম শুধু একটু অন্তরঙ্গতা, একটু ভালোবাসা। তাও কী ওঁর দেবার কোনো উপায় নেই? জানতে ইচ্ছা করে, ওঁর স্ত্রীকে উনি সত্যিই কতখানি ভালোবাসেন।

একটু একটু ক'রে আমি ওঁর কাছেই জানবার চেষ্টা করতে লাগলুম অত্যন্ত সাবধানে, যেন উনি আমার উদ্দেশ্য একটুও বুঝতে না পারেন। জানতেই হবে যে উনি কেমন মানুষ, ওঁর ভালোবাসার বহরটা কতখানি, স্ত্রীকে উনি হৃদয়ের কতখানি দিয়েছেন।

কিন্তু ওঁর ভেতরের কথা খুঁজে বের করা অত্যন্ত কঠিন, সাঁড়াশি লাগিয়ে টেনে আনতে হয়। তবুও তাতে টুকরো-টুকরো মাত্রই পাওয়া যায়। আমি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেবল এই কাজ করি, কথায় কথায় ঐ প্রসঙ্গ এনে ফেলি। কিন্তু একটু কিছু বলতে বলতেই উনি সাবধান হ'য়ে যান, অন্য কথা এনে ফেলেন।

একদিন এমন একটা জায়গায় আমি ঘা দিলুম যাতে সব কথাই বেরিয়ে পড়লো। তখন দেখলুম যে কী ভুলই আমি করেছিলুম।

সে দিন কথায় কথায় বললুম,—খোলাখুলি ভাবে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? যদি একটুও লুকিয়ে না রেখে সত্যি কথা বলেন তাহ'লেই প্রশ্নটা করি, নইলে দরকার নেই।

—করুন আপনার প্রশ্ন, সত্যি কথাই বলবো।

—মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার আসল মনোভাবটা কী তাই জানতে চাইছি। মেয়েদের সকলের সঙ্গেই কী আপনি একই রকমের ব্যবহার করেন? দেখতে পাই কিনা, এই আমার সঙ্গেও আপনি বরাবরই যেন একটু দূরত্ব রেখে চলেন, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—তা দেখুন, আমরা আর আপনারা একেবারে স্বতন্ত্র জাতের প্রাণী, একটু দূরত্ব রেখে চলতে হয় বৈকি। আপনাদের মনের ভেতরে যে কী আছে তা তো আমি জানিনা। সেইজন্যেই একটু সাবধান হ'তে হয়।

—সত্যি আমাদের সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, না জানতে চান না, আমাদের কেবল দূর থেকেই পরিহার করেন? বিশ্বাস করেন না বুঝি আমাদের জাতকে? আপনার নিজের স্ত্রীকে তো খুব বিশ্বাস করেন? তিনিও কিন্তু আমাদেরই জাতের। তাঁর বেলাতে বুঝি একটুও ভয় করেন না?

—সত্যি কথা শুনতে যখন চাইলেন তখন বলি, আপনাদের কাউকেই আমি চিনি না, এবং কাউকেই আমি বিশ্বাস করি না। আপনারা যেন কেমন দুর্বোধ্য। সকলকেই তাই খানিকটা ভয় ক'রে চলি।

—কেন কেন, বিশ্বাস করেন না কেন?

—বিশ্বাস করা ঠিক চলে না। অন্তত আমার যেমন মন, তেমন মন নিয়ে বিশ্বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। ওর জন্যে হয়তো স্বতন্ত্র রকম মনের দরকার, আমার তা নেই। আপনাদের একটা হৃদয় আছে নিশ্চয়ই, দেখতে পাই যে তার গতিবিধির কোনো ঠিকানা নেই। কোনো একটা নির্দিষ্ট সাধারণ নিয়মে সে চলে না, চলে কেবল নিজের খেয়ালে। যদি একটা সোজা নিয়মে চলতো তাহ'লে খুবই ভালো হতো, কিন্তু বোধ হয় তার কোনো উপায় নেই। অগত্যা একটু সাবধান হ'তেই হয়।

—মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার এমন চমৎকার ধারণা? আগে তা জানতুম না। সংসারে কতগুলো মেয়েকে আপনি পরীক্ষা ক'রে দেখেচেন, যাতে এমন কথা বলতে পারচেন?

—অনেক মেয়েকে পরীক্ষা ক'রে দেখবার আমার সুযোগ হয়নি, আর তার প্রয়োজনও নেই। নিজের জীবনে একজনকে মাত্রই দেখেছি, তার থেকেই যতটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে আর বেশি দেখতে আমার অভিরুচি নেই। কিন্তু ও কথা থাক, আপনি এবার অন্য কথা বলুন।

—না না, আজ ঐ কথাই বলতে হবে। কী আপনার অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলুন। আমি শুনতে চাই।

—সে আপনার শুনে কোনো লাভ নেই।

—নিশ্চয় আমার লাভ আছে বৈকি। দেখুন, আমি যে আপনাকে কতখানি অন্তরঙ্গ মনে করি সে কথা কী আপনি জানেন? আমি যতই আপনাকে কাছে আনতে চাইছি ততই আপনি কেন দূরে সরে যেতে চান বলুন তো? এখন আমি বুঝতে পারচি, যেটা আপনি গোপন করতে চাইছেন সেটা যেন আপনার নিজেরই স্ত্রীর সম্বন্ধে। কিন্তু ঐ কথাই আমি শুনতে চাই, আমাকে বলতে কোনো দোষ নেই। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আমি আপনার মঙ্গল চাই, মনের মধ্যে যদি লুকোনো কোনো ব্যথাও থাকে সেটাকে আমি দূর ক'রে দিতে চাই। এবার বলুন সব কথা, কিছুই দ্বিধা করবেন না। আপনাব সব কথাই আমার শোনবার অধিকার আছে।

পুরুষের মন চায় মেয়েদের একটু আন্তরিক সহানুভূতি। তাহ'লেই ওরা একেবারে গলে যায়। ঐটুকু যে উনি কোথাও পাননি এ আমি জানতুম না। আমার কাছে আশ্বাস পেয়ে উনি ধীরে ধীরে ওঁর সমস্ত কথাই বললেন। সেদিন যেমন ভাবে বলেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই আমি ওঁর কথাগুলো বলছি—

—"আপনি যা জানতে চাইছেন সে কথা সব দিক থেকে গুছিয়ে বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, কারণ আমি নিজেই সব কথাটা এখনো ভালো ক'রে বুঝি না। কিসেব দোষে যে কী হয় আমি জানি না, হয়তো আপনি চেষ্টা করলে আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। অন্যান্য মেয়েদের সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না, কখনো জানবার চেষ্টাও করিনি। কেবল আমার স্ত্রী ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমি কখনো অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিনি। ছেলেবেলায় দুএকজন আত্মীয়ার সঙ্গে খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়, নিতান্তই ছেলেমানুষির ব্যাপার। অল্প বয়সেই আমার বিয়ে হলো, স্ত্রীকে পেয়েই

একেবারে মোহিত হলুম, তার ওপরেই দেখতে দেখতে অত্যন্ত অনুরাগ জমে উঠলো। বাস্ ঐ পর্যন্ত। বিয়ের পর আর কোনো মেয়ের দিকে মুখ তুলে চাইবার কখনো প্রযোজন বোধ করিনি, কারণ আমি জানতুম যে স্ত্রীলোকের কাছে যা প্রয়োজন তা সবই আমি পেয়েছি। ওকে নিযেই আমি পরম পরিতৃপ্ত। ওর কাছেই পেযেছি আনন্দ, তাই কিসে ওকে খুশি করা যায় এই ছিল আমার সতত চেষ্টা। একবার যা চাইবে তা যতক্ষণ পর্যন্ত না দিতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মনে কোনো শান্তি নেই। এতটাই কেন করতুম জানেন? আমার মনে হতো যে ওর মতো সরল মেয়ে এই পৃথিবীতে নেই। যেমন নিখুঁত ওব দেহেব গঠন, তেমনি নিখুঁত ওব স্বভাবটি। ভালোবাসতে আমি জানতুম, কিন্তু শুধু তার দ্বারা ওর উচিত মূল্য কতটুকুই বা দেওয়া সম্ভব?

"তারপরে হঠাৎ একদিন কী হলো বলি শুনুন। সে এক অতি যন্ত্রনাদায়ক ইতিহাস, এ পর্যন্ত কাউকে বলিনি, আজ আপনাকে বলছি। তখন আমার একটি ছেলে হ'য়ে গেছে, সুতরাং বিয়ে হবাব অনেকদিন পরেব কথা বলছি। তখনও আমি প্রত্যেক সপ্তাহে দেশে যাতায়াত কবি, ছুটির দিনগুলো দেশে থেকেই কাটাই। যখনকাব কথা বলছি তখন চলেছে জ্যৈষ্ঠ মাস। ঐ সময় পাড়াগাঁয়ে কী ভযানক গরম পড়ে জানেন তো? দিনের বেলাটা তবু একরকম কাটে, কিন্তু রাত্রিটা হ'যে ওঠে অসহ্য। একটুও বাতাস থাকেনা, গরমটা যেন গুমোট হ'যে বুকেব ওপর চেপে বসে। সারাবাত ঘুম হয় না, হাতপাখা নাড়তে নাড়তে হাতে ব্যথা হ'যে যায়। সেবার কিসের উপলক্ষে দিন কতকের ছুটি ছিল। প্রথম দুটো রাত্রি ঘরে শুয়ে একেবারে অনিদ্রায় কাটালুম, তৃতীয় রাত্রে একটা মাদুর নিয়ে বাড়ির ছাদে গিয়ে শুলুম। ছাদে শুয়ে প্রথমে খানিকটা বেশ ঘুম হলো, তার পরেই ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। উঠে দেখি যে ঘামে সমস্ত শরীর ভিজে গেছে, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। ভাবলুম নিচে নেমে যাই, ঘরের কুঁজো থেকে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে আসি। নিচে আমার ঘরের কাছে গিয়ে দেখি দরজায় খিল দেওয়া। অনেক ডাকাডাকিতেও কোনো

সাড়া পাওয়া গেল না। ভাবলুম যে ও খুব ঘুমিয়ে পড়েছে, দেখি যদি অন্য কোথাও জল পাই। খাবার ঘরে, রান্নাঘরে, সর্বত্র খুঁজলুম, কোথাও একটু জল নেই। আবার শোবার ঘরের দিকে ফিরে যাচ্ছি, দোরের কাছাকাছি গিয়ে শুনতে পেলুম খিল খোলার শব্দ। চেয়ে দেখি,—আমার সেই ঘরের দরজা খুলে কে একজন বেরিয়ে এলো। সে স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। অবাক হ'য়ে দেখি,—সে আমার খুড়তুতো ভাই সুবল। সেও আমাকে নিশ্চয় দেখতে পেয়েছিল, কারণ তখন চাঁদের আলো ফিন্‌ফিন্ করছে। কিন্তু এমন ভাবে সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল যেন কাউকে দেখতেই পায়নি। বুঝতে পারলুম, সে তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে চলে গেল আমাদের নিমগাছটার তলা দিয়ে, পাকা নিমফলগুলো তার পায়ের চাপে ফট্‌ফট্ ক'রে ফাটতে লাগলো। আমি আশ্চর্য হ'যে গেলুম। ঘরে ঢুকে দেখি আমার স্ত্রী অসাড়ে ঘুমোচ্ছে, গভীর নিদ্রায় তার নাক ডাকছে। চাঁদের আলো পড়ে কানের দুটি দুল জ্বল্‌জ্বল্ কবছে। একেবারে অকৃত্রিম নিদ্রা। গা ঠেলে ওর ঘুম ভাঙালুম, তখন ও বললে,—কেউই ঘরে ঢোকেনি।

"সেই রাত্রি থেকে আমার সব কিছুই লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেল। প্রথমত কিছুতেই এই কথাটাব একটা মীমাংসা করতে পারিনা যে আমি যা চোখে দেখেছি তা সত্যি দেখেছি না ভুল দেখেছি। তারপর চোখ যখন খুলে গেল তখন ক্রমে ক্রমে সবই বুঝতে পারলুম। কিন্তু বুঝলেও কথাটা মেনে নেওয়া কত কঠিন! আমার প্রতি ওর যে প্রেম নেই, তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু সেই সুন্দর, সেই সরল মেয়েটি, কবে সে এমন বদলে গেল, কবে থেকে এমন প্রবঞ্চনা শিখলে? কেন যে এমন হয তাই এখনো বুঝতে পারিনি, আপনি আমাকে বলতে পারেন? এক একবাব মনে হয়, এটা আমার দোষেই হয়েছে। নিশ্চয় আমার মধ্যে সেই জিনিসটারই অভাব আছে, যা আপনাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আবাব ভাবি, তা নয়, আপনাদেরই মধ্যে সেই জিনিসটার অভাব, যা আমার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এখনও এ সমস্যার কোনো মীমাংসা করতে পারিনি।"—

এই পর্যন্ত বলে উনি স্তব্ধ হ'য়ে গেলেন। আমিও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলুম। তারপরে আর থাকতে না পেরে হঠাৎ আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—সেই স্ত্রীকে নিয়ে এখনো আপনি ঘর করছেন, এখনো আদরযত্ন করছেন, এখনো সব কিছুই করছেন ?

—তা কেন করবো না ? তার সঙ্গে আমার সাংসারিক সম্বন্ধ তো ঠিকই আছে। সে আমার ছেলেপুলেকে মানুষ করছে, আমার সংসারকে রক্ষা করছে, সব কাজই সে করছে। সে আমার বিবাহিতা স্ত্রী, বাইরের দিক থেকে তার কোনোই ত্রুটি নেই। সেদিক দিয়ে তো গণ্ডগোল নেই, কেবল গণ্ডগোল আমার মনে। মনের মধ্যে যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল সেইটুকুই কেবল আমাকে মুছে ফেলতে হয়েছে। এখন আপনিই বলুন, সাবধান হওয়া আমার উচিত কিনা। আপনারা আমার শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু আর নির্ভর করতে ভরসা হয় না।

উনি মানুষ চিনতে ভুল করেছেন, তাই আমাদের জাতটাকেই অশ্রদ্ধা করছেন। কিন্তু ওঁর কথাগুলো শুনতে শুনতে আমার অত্যন্ত মায়া হলো। কত সুন্দর ছিল ঐ মানুষটির হৃদয়, প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে চুরমার হ'য়ে পড়ে আছে। এমন কেউ নেই যে ঐ হৃদযটিকে কুড়িয়ে নিয়ে জোড়াতাড়া দিয়ে সযত্নে মেরামত ক'রে দেয়। কারো এত দায় নেই, এত অবকাশ নেই। কিন্তু আমার আছে এর প্রয়োজন, আমি ক'রে নেবো এর জন্যে অবকাশ। মেরামতির কাজে আমার খুব আগ্রহ। ভাঙা জিনিস জুড়তে আমি ভালোবাসি। চাএর পেয়ালাটাও ভেঙে গেলে আমি টুক্‌রোগুলো জড়ো ক'রে জুড়ে জুড়ে ফুলদানি বানাই। কিন্তু সে কথা যাক, ঐ মানুষটি আমার প্রিয়, আমি ওঁকে সুন্দর ভাবে মেরামত ক'রে আমার নিজের ক'রে নেবো। হয়তো অনেক সময় লাগবে, কিন্তু মানুষটিকে আমি বাঁচিয়ে তুলবো। তখন আর ওঁর ওপরে কারো দাবিদাওয়া থাকবে না। আমি আদায় করবো ওঁর শ্রদ্ধা, আদায় করবো ওঁর নির্ভরতা। এতদিনে কাজের মতো একটা কাজ পেয়েছি। ওঁর জন্যে যদিও তখন মায়া হচ্ছিল, কিন্তু নিজের জন্যে হ'তে লাগলো আনন্দ, এ কথা লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। আর কিছু নয়,

এতদিনে আমি একটা পথ খুঁজে পেয়েছি, ওঁকে ধরে নির্ভয়ে ওঠবার জন্যে একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি। এই সূত্রটা আগে জানতে পাবলে আরো ভালো হতো।

আমি বলছি একটি লতাগাছের মনের কথা। লতাগুলো যে কেমন ভাবে একটিমাত্র দড়ি বেয়ে ওপর দিকে গজিয়ে ওঠে সেটা কেউ কখনো লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন কী? আমি দেখেছি। আমার বাপের বাড়ির উঠোনে ঘোড়ার দানা খাবার জন্যে একটা পুরোনো ডাবা ছিল। ঘোড়া আর নেই, কাজে কাজেই সেই ডাবাটার মধ্যে মাটি ভরে তাতে একটা লতানো জুঁইগাছ লাগানো হয়েছিল। আমি প্রত্যহ দেখতুম, গাছটা চারিদিকেই ছোটো ছোটো ডালপালা বের করছে, অথচ কোন দিক দিয়ে যে ওপরে বেয়ে উঠবে তাব ঠিকানা নেই। একটা নতুন ডাল বের ক'রে খানিকটা পর্যন্ত এগিয়ে যায়, তারপরে আবার থেমে গিয়ে অন্যদিকে ডাল বের করতে থাকে। বাবা বললেন, ওতে হবে না, ওর ডাল বেয়ে ওঠবার জন্যে একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিতে হবে। ছাদের ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত একটা দড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হলো, গাছের একটা ডালকে সেই দড়িটা ধরিয়ে দেওয়া হলো। তখন অন্যান্য ডালগুলো যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই রয়ে গেল, ঐ একটিমাত্র ডাল তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠতে লাগলো সেই সূত্রটি ধরে। দেখতে দেখতে সেই ডালটি একতলা দুতলা তিনতলা পার হ'যে উঠে চলে গেল একেবারে বাড়ির ছাদের ওপরে। যখন সেখানে গিয়ে সে দিনের আলো আর মুক্তির বাতাস পেলে, তখন তার কী যে পাতার বাহার, কতই যে ফুল ফোটানোর ঘটা! পাতায় পাতায় যেমনি ছাদের পাঁচিলগুলো পর্যন্ত ঢেকে দিলে, ফুলে ফুলে তেমনি সারা বাড়িটা আমোদ ক'রে দিলে। কিন্তু উঠেছিল তার ঐ একটিমাত্র ডাল, পেয়েছিল সে ঐ একটিমাত্র সূত্র। ডালটা ক্রমে এমনি মোটা হ'য়ে উঠলো যে সূত্রটা আর মোটে দেখাই যায় না।

আমিও সেই কথাই বলছি,—এতদিনে ডাল বেয়ে ওঠবার একটা সূত্র খুঁজে পেয়েছি। ঐ একটি সূত্র ধরে একটি ডাল বেয়েই আমি উঠে যেতে পারবো। মনের আনন্দ আমার আর ধরে না।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আবার বোধ হয় হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি বজ্র নিক্ষেপ করলেন যে ডালপালা শুকিয়ে আমি একেবারে ঝল্‌সে গেলুম।

অপারেশনের ফলে যে ভবিষ্যতে আর আমাব কোনো সন্তান হবে না এ কথা আমি আগেই শুনেছি। তাতে আমার কোনো দুঃখ হয়নি, বরং আনন্দই হয়েছে। সন্তান সকলেই চায়, মা হ'তে কোন মেয়ের না সাধ যায়? কিন্তু একটি ছেলে তো আমার ঘরেই রয়েছে, তাই যথেষ্ট, তাতেই আমার মাতৃত্বের ক্ষুধা মিটে যাবে। আর বেশিতে দরকাব নেই। ও ছাড়াও আমি একটা নতুন কর্তব্যেব ভার নিয়েছি, সেই দিকটাই এখন ভালো ক'রে দেখতে হবে। সন্তান ধারণেব দায় থেকে মুক্ত হ'য়ে আমি বরং নিশ্চিন্ত। আমার ছেলেটি এখন বেশ বড়ো হ'য়ে উঠেছে। ছেলেটিকে বাড়িতে রেখে এসেছি আমার শাশুড়ীর কাছে, মাঝে মাঝে আমার স্বামী তাকে হাসপাতালে এনে দেখিয়ে নিয়ে যান। ছেলেটা যদিও এখন একটু রোগা হ'যে গেছে, বুঝতে পারছি তাব অযত্ন হচ্ছে, কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফিরে গিযে আমি সেটা শুধ্‌রে নিতে পাববো।

কিন্তু হাসপাতাল থেকে ফিবে যাবার কিছুদিন আগে বাড়ির লোকদের আসাযাওয়া হঠাৎ খুব কমে গেল। প্রায কেউ আসেই না, এমন কী আমাব স্বামীও না। তাবপরে দেখি অমব বাবুও খুব কম আসতে শুরু করলেন। দুপুরের দিকে যদিও দু একবার আসেন, একটুখানি থেকেই তাড়াতাড়ি চলে যান,—কিন্তু বিকেলের দিকে মোটেই না। যেদিন ভাবলুম জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কী, সেদিন থেকে ওঁব আর দেখাই পেলুম না। চার পাঁচ দিন এমনিভাবেই কাটলো, কেউ আব আসে না, একজনও চেনা লোকের মুখ দেখতে পাই না। ওখানকার ডাক্তার আর নার্সগুলোই কেবল আসে, নিঃশব্দে তাদের কর্তব্য সেরে চলে যায়। ওদের কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি না, নিজের মনেই কেবল রাগ করতে থাকি আর ছট্‌ফট্‌ করতে থাকি। মনে মনে ভাবি, একবার কেউ এলে হয়, তখন বুঝে নেবো ওদের আক্কেলটা কী রকম। আমাকে একলাটি ফেলে রেখে সবাই কেমন ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকে?

পাঁচ দিন পরে উনি এলেন একদিন সকালে। মুখখানা অত্যন্ত শুক্নো, চোখ দুটো লাল। দেখেই বুঝতে পারলুম কিছু একটা কাণ্ড ঘটেছে। উনি এসে আমার বিছানার কাছে বসে দুহাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরলেন। তখন বুঝলুম, নিশ্চয় কিছু গুরুতর ব্যাপার। উনি বললেন,—আমি জানি আপনার মনের জোর আমার চেয়েও অনেক বেশি, তাই অনেক চেষ্টায় আমি এখন আসতে পেরেছি। নইলে কিছুতেই আপনার কাছে আসতে পারতুম না। এই ব'লে তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কেবলই আমার হাতে জোরে জোরে হাত বুলোতে লাগলেন।

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আমি রুক্ষস্বরে ব'লে উঠলুম,—কী হয়েছে বলুন না, দেরী করচেন কেন?

—আগে আপনি একটু প্রস্তুত হ'য়ে নিন, তারপরে বলছি।

—আগে আপনি বলুন, আমার খোকা কেমন আছে।

উনি নীরব।

—বলুন না, খোকার কিছু হয়েছে?

—খোকা নেই। কাল মারা গেছে।

বিকট চীৎকার ক'রে আমি কেঁদে উঠলুম। পেটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় কিছুই না করতে পেরে উন্মাদের মতো আমার পরণের কাপড়খানা দাঁত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে টুক্রো টুক্রো ক'রে ফেললুম। আমাকে থামাবার চেষ্টা ক'রে যখন কিছুতেই কিছু করতে পারলেন না, তখন নিতান্ত বিব্রত হ'য়ে আমার কাঁধ দুটো ধরে জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে উনি বললেন,—চুপ করুন। আমার দিকে একবার চেয়ে দেখুন, আমাকে এমনি ক'রে আপনি এত যন্ত্রণা দিতে পারেন? সাধারণ অবুঝ মেয়েরা যেমন করে আপনিও তেমনি করবেন? কোনো কিছু তফাৎ নেই?

তৎক্ষণাৎ আমি চুপ করলুম। উনি আমার কাছে সরে এসে বসলেন, নুয়ে পড়া মাথাটা দুহাত দিয়ে তুলে নিয়ে নিজের কাঁধের ওপর রাখলেন, এক হাত দিয়ে

গলাটা বেষ্টন ক'রে অন্য হাত দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন। ওঁর কাঁধের ওপর মাথাটা রেখে তখনও আমি মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে উঠতে লাগলুম। উনি বললেন,—না না, আর একটুও না। একেবারেই চুপ করুন, নইলে আমি চলে যাবো। তখন একেবারেই আমি চুপ করলুম।

উনি মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন,—বলুন আর কাঁদবেন না। আমি বললুম,—না, আর কাঁদবো না।

পুত্রশোক ভোলাতে পারে এমন জিনিস সংসারে কী আছে? দেখলুম কিছু আছে বৈকি, নইলে আর একবারও আমি কাঁদিনি কেন?

শুনলুম, খোকার হয়েছিল নিউমোনিয়া। উনি ছিলেন আমাকে নিয়েই ব্যস্ত, একদিনও আমাদের বাড়িতে যাননি। আমার শাশুড়ী প্রথমে মনে করেছিলেন সামান্য ঠাণ্ডা লেগেছে, তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। যখন বাড়াবাড়ি হলো তখন ইনি খবর পেলেন, কিন্তু তখন রোগটা খুব বিগ্‌ড়ে গেছে। তারপরে বড়ো বড়ো ডাক্তারদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ইনি কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে দিনরাত সেখানে থেকে অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই বাঁচাতে পারলেন না। ছেলেটা অযত্নে আর অবহেলায় মারা গেল, নিঃসন্তান নারী হ'য়ে আমি সেরে উঠলুম। শুধু তাই নয়, পুত্রশোকও আমি ভুলতে পারলুম। মনে মনে ভাবলুম যে নিঃসন্তান হ'লেও আমার জীবন নিঃস্ব হয়নি। আমার অনেক কাজ রয়েছে। ঐ একটি অসহায় মানুষ ভাঙা প্রাণ নিয়ে আমার দ্বারস্থ,—মাতৃহারা শিশুর মতো, গৃহহারা পথিকের মতো, অন্নহারা ভিখারীর মতো আমার মুখ চেয়ে রয়েছে, তাকে আশ্রয় দিতে হবে, তাকে সুস্থ করতে হবে। যে আমার অন্তরঙ্গ, যাকে এতদিনে আমি চিনেছি, তাকে আমার সর্বস্ব দিয়ে রক্ষা করতে হবে। নিজের সুখদুঃখ দেখতে গেলে এখন চলবে না।

কিন্তু যে কাজ হাতে নিয়েছি সে কাজ যে কত কঠিন তা আমি পরে বুঝতে পারলুম।

অমরনাথের কথা

সেবার পূজোর ছুটিতে যখন দেশে চলে গেলাম তখন স্বাস্থ্যটা আমার খুবই ভালো যাচ্ছে। একটানা দেড় মাস সেখানে থেকে কাটালাম,—তখন সেখানে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া হচ্ছে, কিন্তু আমার কিছুই হোলো না। আমার স্বাস্থ্য যে তখন খুবই ভালো থাকবে এটা আমি জানতাম।

দেশের কেমন একটা মোহ আছে। দেশে গেলেই মনটা আমার আগেকার মতো নরম হ'য়ে যায়, সেই বিয়ের আগেকার সময়গুলোর কথা মনে পড়ে যায়। ভুলে যাই যে আমি একজন বিজ্ঞানের ছাত্র। পায়ের জুতো খুলে ফেলে খালি-পায়ে ঘুরতে ইচ্ছে করে বনে জঙ্গলে নদীর ধারে, গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের মতো চেঁচিয়ে তেমনি মেঠো সুরে আবার গান গাইতে ইচ্ছে করে।

সেই ছেলেবেলাকার পার্বতী নদী, সেখানে এখন প্রচণ্ড স্রোত। সমস্ত জল ঘোলা। গৈরিক জলের ঢল নেমে আবর্তের সৃষ্টি করছে। সেই ছেলেবেলাকার বালির চর, যেখানে আমরা বাতাবি লেবুর ফুটবল খেলতাম। সেখানে আর তেমন ফাঁকা জায়গা নেই, লম্বা লম্বা শরগাছ জন্মেছে, তার ভেতর দিয়ে গেলে গা ছড়ে যায়। জায়গায় জায়গায় কাশ গাছের ডগাগুলো জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, তার পুচ্ছগুলোকে পাঁকে দলিত ক'রে দিয়ে জলের স্রোতরেখা পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে। আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে সারি সারি বালিহাঁসের ঝাঁক। জেলেরা নদীর জলে মাছ ধরবার কাঠিজাল পুঁতে রেখেছে।

একদিন বেড়াতে গেলাম আমার সেই ছেলেবেলাকার সঙ্গী বাদ্‌লাদের বাড়ি। বাদ্‌লার সেই তখনকার নধর মূর্তি আর নেই, বেচারা একদম পাকিয়ে গেছে। সাম্‌নের কয়েকটা দাঁত পড়ে গেছে, মুখখানা বুড়োদের মতো চুপ্‌সে গেছে। এখন সে একজন পাকা চাষী। তার দুটি বৌ, পাঁচটি ছেলেমেয়ে। প্রথম বৌএর

সন্তান হোলো না দেখে বাদ্‌লাব মা ওর আবার একটি বিয়ে দিয়েছিল, এখন দুটিতে মিলেই সন্তানের জন্ম দিচ্ছে। নাতিপুতিদের নিয়ে বাদ্‌লার মা'র আনন্দের অবধি নেই।

আমি যেতেই বাদ্‌লার মা বাদ্‌লার দুটি লজ্জাবতী বৌকে এনে হাজির করলে, তারা দুজনেই আমাকে প্রণাম করলে। নিরাভরণা মলিনবসনা দুটি কালো কালো মেয়ে, কিন্তু তবুও বেশ দেখতে। স্বাস্থ্য আছে, শরীরে বল আছে। ওদের নাতিপ্রসর বস্ত্রের অন্তরাল থেকে সুপুষ্ট স্তনগুলি মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ে,—সেগুলি দুগ্ধপূর্ণ, সুডোল। দ্বিতীয়ার একটি শিশু হামা দিতে দিতে ছুটে এলো তার মা'র কাছে, স্তন্যপানের জন্যে মহা উপদ্রব শুরু ক'রে দিলে। তার মা বিব্রত হ'যে তাঁকে কোলে নিয়ে একপাশে সরে গিয়ে স্তন্যপান করাতে লাগলো।

বাদ্‌লা তখন মাঠ থেকে সবেমাত্র এসেছে। আমার সুমুখেই সে ভাত খেতে বসে গেল, সেই লাল লাল চালের ভাত আব ডাঁটা চচ্চড়ি। ওর ছেলেমেয়েরা প্রচুব কলরব করতে কবতে বসলো ওর চাবিদিক ঘিরে। বাদ্‌লা খেতে খেতে তাদের কিছু কিছু প্রসাদ বিতরণ করতে লাগলো, তাই পেযে তারা মহা খুশি।

বাদ্‌লাব মা আমার কাছে বসে গৃহস্থালিব পরিচয় দিতে লাগলো। প্রথমাব ছেলেমেয়ে দুটি, দ্বিতীয়াব তিনটি। বাড়িতে মাত্র দুখানি ঘর, একটিতে শোয় বাদ্‌লার মা আর তাব ছোটো ছেলে, অন্যটিতে শোয় ওবা সকলে মিলে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—বৌদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া হয় না? আমার প্রশ্ন শুনে বৌ দুটি মাথা নিচু ক'রে হাসতে লাগলো। বাদ্‌লার মা বললে,—না বাবা, আমাব বৌ দুটি খুব ভালো, আব ঝগড়া করবাব সময কখন পাবে? এতো বড়ো সংসারের কাজ সব ওরা দুটিতে মিলেই করে, আমারে কিছু করতে দেয না। এতগুলি কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করা, রান্না করা, বাসন মাজা, জল আনা, গরুর সেবা, ধান ভানা, সব ওরাই দুজনে হাতাহাতি ক'রে সারে।

আমি ওদের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলাম। অবস্থা প্রায় তেমনিই আছে, খাবার লোকের সংখ্যা বাড়াতে বরং দারিদ্র্য একটু বেড়েছে। তবে ওদের খাবার

কোনো অভাব নেই। জমিতে সারা বছরে যা ফসল হয় তাতেই ওদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে যায়, তেমন অভাব কিছুই ওরা বোধ করে না। কিন্তু আমি দেখলাম ওদের বস্ত্রের অভাব। বাদ্‌লার বৌ দুটির জন্যে দুখানি লালপাড় শাড়ি কিনে উপহার দিলাম। শাড়ি পেয়ে অবশ্যই খুব খুশি হোলো, কিন্তু সে দুটি ওরা তুলে রেখে দিলে। দেখলাম, ওদের আনন্দের পরিমাপ সভ্যজগতের থেকে স্বতন্ত্র। সাজ-সরঞ্জামের মূল্য ওরা আমাদের মতো অতটা বোঝে না। খাওয়া-পরাটা কোনোমতে হ'লেই হোলো, তার বেশি প্রযোজন নেই। সম্পদবৃদ্ধির চেয়ে সংসারের সংখ্যা-বৃদ্ধিটা ওরা বোঝে ভালো, তাতেই ওদের আনন্দ। বাদ্‌লার মা বললে,—দুটি বৌ এনেছি, এতগুলি নাতিপুতি হয়েছে, এইগুলি বেঁচে থাক, তাহ'লে আর আমার ভাবনা কি? পেটের জন্যে কোনো ভাবনা নেই, তোমার আশীর্বাদে দুবেলা দুমুঠো যেমন ক'রে হোক জুটে যাবে।—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনো ভয় কিংবা ভাবনা ওদের আদৌ নেই।

আমাদের নিজেদের বাড়িতে ইতিমধ্যে অনেক রকমের পরিবর্তন হয়েছে দেখলাম। সুবলরা এখন আলাদা হ'য়ে গেছে, বাড়ি ভাগাভাগি ক'রে নিয়ে তারা এখন পৃথক সংসার পেতেছে। সুবলের দুটি ছেলে হয়েছে। সুবলের স্ত্রী পাকা গৃহিনী। আমার স্ত্রীও একজন পাকা গৃহিনী। দুজনেই নিজের নিজের স্বার্থটুকু বেশ বোঝে, জমির ফসল বাগানের ফল আর পুকুরের মাছ চুল চিরে ভাগ ক'রে নেয়। পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি নেই, মুখ দেখাদেখি নেই। সুবল জমি-জমার কাজ নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত, তার ওপরে তার নিজের সংসার আছে, আমাদের দিকটা দেখবার কোনো অবসর নেই। আমাদের দিকে একবারও আসে না কিংবা কোনো খোঁজখবরও নেয় না। আমাদের যা কিছু দেখাশোনা করেন আমার ঠাকুমা, আমার মা, আমার স্ত্রী, আর আমাদের একজন গোমস্তা আছেন তিনি। কিন্তু আমাদের প্রতি সুবলের কোনো বিদ্বেষ নেই। জমিদারীর যা আদায়পত্র হয় সমস্তই সে ভাগ ক'রে হিসাব সমেত আমাদের তরফে পাঠিয়ে দেয়। আমার সঙ্গে দেখা হ'লেই হাসিমুখে অভ্যর্থনা ক'রে বলে,

—এই যে দাদা, তোমাকে একটা কথা বলবার ছিল, ঐ বাঁকিপুরের দরুণ যে জমিটা এবার ভাগে দেওয়া হয়েছিল,—ইত্যাদি। আমারও সুবলের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই। আমিও হেসে বলি,—তুই যা ভালো বুঝিস তাই করবি, আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করচিস কেন?

দেশে গিয়ে রীতিমত ভাবে সংসার করতে লেগে গেলাম। আমার স্ত্রী এবং আমার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সাংসারিক সম্পর্ক। সে ভাবে, আমি এই সংসারের কর্তা, সুতরাং আমাকে তার প্রয়োজন। আমি ভাবি, সে এই সংসারের গৃহিণী, সুতরাং তাকে আমার প্রয়োজন। দুজনে এই যৌথ কারবারটির অংশীদার দাঁড়িয়ে গেছি, পরস্পরে পরামর্শ ক'রে সুষ্ঠুভাবে একে চালাতে হবে। বিশেষত আমাদের ছেলেটি এবং মেয়েটির সম্বন্ধে দুজনেরই স্বার্থ রয়েছে। তাদের রক্ষা করতে হবে, তাদের ভবিষ্যৎ দেখতে হবে দুজনকেই। এখন স্বামী-স্ত্রীতে মিলে সংসার করার মধ্যে সেইটাই সবচেয়ে প্রধান কথা। ছেলেটি এখন গ্রামের স্কুলে পড়ছে। মেধাবী ছেলে, ক্লাসে একবার ফার্ষ্ট হয়েছিল। মেয়েটিও দ্বিতীয় ভাগ পড়ছে, দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। ওদের নিয়ে দুবেলা আমি পড়াই, গল্প বলি, খেলা করি।

কিন্তু আমি দেখলাম, অমরনাথ চৌধুরী শুধু একটিমাত্র মানুষ নয়, এর মধ্যে রয়েছে তিন জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিন জনের তিন রকমের চরিত্র, তিন রকমের চিন্তা।

এক নম্বরের অমরনাথ বৈজ্ঞানিক। তার কৃতিত্বটা এখানে এসে যদিও অনেকটা চাপা থাকে, তবুও থেকে থেকে বেরিয়ে পড়ে। যখনই সে দেখে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া হচ্ছে, উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে লোকে মারা যাচ্ছে, তখনই সে অবৈতনিক চিকিৎসায় উৎসাহের সঙ্গে লেগে যায়, মনে মনে সঙ্কল্প করে যে নিজের উপার্জিত অর্থ এই অসহায়দের জন্যে কিছু কিছু ব্যয় করতে হবে, —এখানে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলতে হবে, প্রত্যেক সপ্তাহে দেশে এসে নিয়মিতভাবে ডাক্তারি ক'রে এদের বাঁচাতে হবে, নতুবা নিজের বিবেকের কাছে

নিজেকে অপরাধী হ'তে হচ্ছে। যখনই দেখা যায় দেশে কলেরা টাইফয়েডের মহামারী শুরু হয়েছে, তখনই এই অমরনাথ ভাবে এটা বড়ো অন্যায় হচ্ছে, স্বাস্থ্য যে কেমন ক'রে রক্ষা করতে হয় তার কিছুই এরা জানে না, কেউ এদের শেখায় না। পানীয় জল যে কেমন ক'রে বিশুদ্ধ রাখতে হয়, রোগের সংক্রমণ যে কেমন ক'রে বাঁচিয়ে চলতে হয়, সেটা এদের ভালো ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আর কেউ না করুক, এ কাজটা তো আমিই পারি। তা ছাড়া, এখানে পানীয় জলের জন্যে কয়েকটা টিউব-ওয়েল বসিয়ে দেওয়া দরকার। লোকের কাছে কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে এবং নিজের থেকেও কিছু দিয়ে এটা অত্যন্ত অনায়াসেই করা যেতে পারে। মহৎ সঙ্কল্প সে অনেক রকমেরই করতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনোটাই কাজের হয় না। কিছুটা অগ্রসর হ'তে না হ'তেই উৎসাহ দমে যায়, দেশের লোকের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে যায়, বৈজ্ঞানিক তখন অবসন্ন হ'য়ে নিজেকে অবলুপ্ত ক'রে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে।

দুই নম্বরের অমরনাথ ঘোর সংসারী। সে রীতিমত সংসার করে, ছেলে-মেয়েকে পড়ায়, পরের ঘরের সঙ্গে নিজের ঘরের তুলনা করে, ধান চাল মাপে, বাগানে বেড়া দেয়, রাত্রে হেরিকেন জ্বেলে দেখে আসে খিড়কির পুকুরটাতে কেউ চুরি ক'রে মাছ ধরছে কিনা। তারপরে আলো নিবিয়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে শোয়, সকালে উঠে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ফের পড়তে বসায়। এই অমরনাথের আবার শখ আছে নানা রকমের। ভালো ভালো ফুলগাছ এনে বাগানে লাগায়। বড়ো বড়ো দুটো কুকুর আছে, তাদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে যায়, সেখানে গিয়ে তাদের নানা রকম কসরৎ শেখায়। একটা ক্যামেরা আছে, তাই নিয়ে পল্লীপ্রকৃতির কত রকম ছবি তোলে। লোক পাঠিয়ে সন্ধান নেয়, বালিহাঁসের ঝাঁক কোন চরে নামলো, জলকাদা ভেঙে বন্দুক নিয়ে ছুটে যায় শিকারে। খাবার লোভটি আছে যথেষ্ট। নিজের হাতে হাঁসের রোষ্ট্ তৈরী করে, নিজেও খায় এবং সকলকে বণ্টনও করে। হুইলের ছিপ নিয়ে পুকুরে মাছ ধরতে যায়, বড়ো মাছ পেলে লোককে নিমন্ত্রন ক'রে খাওয়ায়। সবই করে, কিন্তু থেকে থেকে ওরও

কেমন অবসাদ আসে। ছেলেমেয়েরা তখন পড়ায় ফাঁকি দেয়, অযত্নে বাগানে জঙ্গল জন্মায়, কুকুরের গায়ে এঁঠুলি জন্মায, ক্যামেরায় জং ধরে, বন্দুকে মরচে পড়ে। তখন খাবার দিকে ওর মন থাকে না, শরীরের দিকে যত্ন থাকে না, তরকারিতে নুন দেওয়া না হ'লে তাও কিছু বুঝতে পারে না, উল্টো দিকে জামা পরলে কিংবা ছেঁড়া কাপড় পরলে তাও কিছু বুঝতে পারে না,—কেউ দেখিয়ে দিলে শুধু হাসে।

তিন নম্বরের অমরনাথ মনোবিহারী দার্শনিক। মনের ভিতর নিষ্পলক চোখ দিয়ে সে অনবরতই শুধু দেখছে,—মীরা, মীরা। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে প্রথমেই যখন মনের দিকে চায় তখনি দেখে মীরা। সারাদিন ঘরের লোকের মধ্যে সহস্র রকমের কাজে ব্যস্ত থেকে রাত্রে যখন বিছানায় শুয়ে চোখ বোজে তখনও দেখে সেই মীরা। ঐ জঙ্গলে ঘেরা বেড়াভাঙা বাগানটিকে আলো ক'রে যেমন ফুটে রয়েছে দুধে-আল্তা রংএর একটিমাত্র শতদল স্থলপদ্ম, ওর জঙ্গলে ঘেরা মনটিকে আলো ক'রে তেমনি ফুটে রয়েছে একমাত্র সেই মীরা। কিন্তু সে মীরা একবারও সুস্পষ্ট নয়, একবারও সুস্থির নয়। সর্বদাই সে বাঁশপাতার মতো থর্থর্ ক'রে কাঁপছে। সে মীরা ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী, অস্থায়ী। মুহূর্তে সে ঝল্কে ওঠে বিদ্যুৎ-রেখার মতো, মুহূর্তেই সে স্তিমিত হ'য়ে যায়। সে কেবল ক্ষণিকের দীপ্তি, স্পর্শ করবার নয়, ধরে রাখবার নয়। ও কখনো ধরা দেয় না,—ওরা কাউকেই কখনো ধরা দেয় না। অথচ ওরাই আমাদের ভালো লাগার জিনিস, ওদের নইলে আমাদের চলে না। তাই ওরা আমাদের চোখে এমন প্রহেলিকা হ'যে ঘুরে বেড়ায়। জগতে রয়েছে এমনি অসংখ্য মেয়ে, তার মধ্যে এমন কি একজনও কেউ নেই যে আমাকে তার সবটুকু জানতে দেবে? বিদ্যুতের মতো একবারটি দেখা দিয়ে লাভ কি, এমন কি একজনও নেই যে স্থায়ীভাবে ধরা দেবে, স্পর্শমাত্রে কলঙ্কিত হ'য়ে যাবে না? বিদ্যুৎকে স্থায়ী করবার সাধনা আছে, তার জন্যেও আলাদা তপস্যা আছে। ঐ অমরনাথ ভাবে, সাধনা আমি করতে পারি, কিন্তু কোনো সিদ্ধি আমার চাই না। তপস্যা করতে পারি, কিন্তু বর কিছুই চাই না। মীরাকে গিয়ে বলবো, এমনি ভাবেই তুমি থাকো, এবার আমি চললাম।

ঐ তিন নম্বরের অমরনাথ বিবাগী। সে ভাবে, এবার আমি দূরে চলে যাবো। এখন যুদ্ধ বেধে গেছে, ডাক্তারদের পক্ষে মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে বিদেশে যাবার খুব সুবিধা হয়েছে। অফিস থেকে সার্কুলার এসেছিল, যারা যারা যুদ্ধে চাকরি নিতে ইচ্ছুক তারা নিজের নাম লিখে পাঠাও। ছুটিতে আসবার আগেই আমি লিখে দিয়ে এসেছি যে আমি ইচ্ছুক। কেবল দেশ আর কলকাতা, কলকাতা আর দেশ,—এ আমার ভালো লাগছে না। এবার আমি চলে যাবো বিদেশে, মীরার স্মৃতিটুকু নিয়ে। ওকে দেখিয়ে দেবো যে ওর কাছে আমি কিছুই চাই না। আমার যে কোন জিনিসটার প্রয়োজন ছিল তা ও বুঝবে না। সুতরাং আমার অভাবের কোনো কিছুই ওকে জানতে দেবো না।

কিন্তু এই তিন রকমের অমরনাথকে নিয়ে সামলাতে সামলাতে আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলাম। কিছুকাল পরে দেশে থাকা আমার অসহ্য হ'যে উঠলো, তখন কলকাতায় পালাবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। দু একদিন পরেই যাত্রা করবো স্থির হয়েছে, এমন সময় অকস্মাৎ আমাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত—শঙ্কর।

আমি তো অবাক। এই অজ পাড়াগাঁয়ে হঠাৎ কলকাতা থেকে শঙ্কর কেন এলো? কোনো বিপদ-আপদ ঘটেছে না কি?

শঙ্কর বললে,—না না, আমি শুধুই বেড়াতে এসেছি, কিছুদিন যদি আপনাদের বাড়িতে থাকি, তাতে কোনো অসুবিধা হবে কি? ভেবেছিলাম আগে একটা চিঠি লিখে জানাই, কিন্তু মীরা বললে,—উনি তো আমাদের ঘরের লোকের মতো, ওঁকে আর চিঠি লিখে জানাতে হবে না, তুমি এমনিই যাও। কখনো কলকাতার বাইরে কোথাও যাইনি কিনা, তাই মাকে বলেছিলাম যে এবার পূজোর ছুটিতে একটু পুরী বেড়িয়ে আসি। কিন্তু মীরা শুনেই বললে,—তাহ'লে তুমি মাকে সঙ্গে নিয়ে যাও, নইলে সেখানে তোমার দেখাশোনা করবে কে, তোমার খাওয়াদাওয়ার তদ্বির করবে কে? আমি আবার নিজে নিজে ও সব কিছুই করতে পারি না কিনা, তাই।

কিন্তু মাকে নিয়ে আর তাঁর লটবহর নিযে ট্রেণে যাওয়াআসা করা, তারপরে পুরীতে গিয়ে তাঁকে নিয়ে কোথায় উঠবো তার ঠিক নেই, সে আরো ঝঞ্ঝাট। আমি বললাম, তবে কোথাও গিয়ে কাজ নেই। তখন মীরা বললে,—তা কেন, তুমি বরং অমব বাবুদের দেশে গিয়ে বেড়িয়ে এসো, বাংলা দেশের পল্লীগ্রামটা একবার দেখে এসো। মীরা বললে কিনা যে সেখানে তোমার যেতেও কোনো কষ্ট হবে না, থাকতেও কষ্ট হবে না, তাঁরা ঘরের লোকের মতোই তোমার দেখাশোনা করবেন,—আরো অনেক কথাই মীরা বললে কিনা, তাই বরাবর এখানেই চলে এলাম। তা আমাকে নিয়ে আপনাদেব কোনো অসুবিধা হবে না তো? হাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মীরা আপনাদের জন্যে সন্দেশ পাঠিয়ে দিযেছে, আপনার স্ত্রীর হাতে সেগুলো দিয়ে দিতে বলেছে। আমাকে একবার নিযে চলুন তাঁর কাছে।

শঙ্করকে দেখে যে আমার কি আনন্দ হোলো তা বলবাব নয। যেন এতদিন যত অচেনা লোকদের মধ্যেই ছিলাম, হঠাৎ একজন নিজের লোককে পেয়ে গেছি। মীবাব ভাই এসেছে, সে যেন আমাব আপন ভাইএর চেযেও আপন। মীরার অনেকখানি ছাঁচ তুলে নিয়ে সে আমার কাছে এসে হাজির হযেছে। সে কথা বলে অনেকটা মীরার ধরণে, ঘাড় বাঁকালে মীরার গ্রীবাভঙ্গীর রেখামাধুর্য দেখা যায়, হাসলে তেমনি গালে টোল খায, ঠোঁট দুটি দেখায় তেমনি লোভনীয়। থেকে থেকে আচমকা ওর মুখে মীরার মুখের এমন এক একটা ঝল্‌কানি ফুটে ওঠে যে আমার অন্তরের সেই অদৃশ্য মূর্তিটাই যেন ক্ষণিকের জন্যে দৃশ্যমান হ'য়ে ওঠে।

শঙ্করকে পেয়ে আমার কলকাতায যাওয়া ঘুচে গেল। ওকে নিয়ে আবার আমি মেতে উঠলাম মাছ ধরতে, শিকার করতে, কুকুর ছোটাতে, ফোটো তুলতে। আমার স্ত্রীও ওর খুব আদরযত্ন করতে লাগলো। একদিন ঠাট্টা ক'রে বললে,—তোমাব মতো অতটা তো দেখাশোনা করতে পারচি না, কুটুম্ব মানুষ, কিছু আবার মনে না করে। আমি বললাম,—কুটুম্ব কি রকম? সে বললে,—তোমার আপন বন্ধুর শালা তো, কুটুম্বের মতোই ভাবতে হবে বৈকি।

শঙ্কর ছেলেটি নিতান্ত সরল প্রকৃতির। এদিকে বেশ বুদ্ধি আছে, লেখাপড়াতেও ভালো, কিন্তু কোন কথাটি কাকে বলতে হয় আর কোনটি লুকিয়ে রাখতে হয় তার কিছুই জানে না, যা দেখে এবং শোনে সমস্তই বলে ফেলে। মীরার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করলে আমি অনেক কথাই ওর কাছে শুনতে পাই। মীরার ছেলেবেলাকার অনেক কথা, বিয়ের আগে বাবার কাছে ওর শিক্ষার কথা, বাবার মতো ওর চরিত্রের তেজস্বীতার কথা, ও-বাড়ির সকলেই ওকে কতখানি ভয় করে সে কথা,—সমস্তই আমার শোনা হ'য়ে গেল।

একদিন কথায় কথায় শঙ্কর বললে,—মীরা আপনাকে খুবই ভালোবাসে, সে তো জানা কথা, কিন্তু আমার মাও আপনাকে ভালোবাসেন।

—তা কেমন ক'রে হয়? তিনি আমাকে একবারও চোখে দেখেন নি।

—নাই বা দেখলেন চোখে। মীরার কাছে অনবরত শুনতে পান আপনার কথা, আর আমিও তো বলি। আপনাকে নিয়ে আমাদের অনেক আলোচনা চলে কিনা।

—কেন, আমাকে নিয়ে আবার কি আলোচনা হয়?

—মীরা যখনই আমাদের ওখানে যায় তখনই আপনার বিষয়ে কত কথা বলে। আপনি ওর কাছে যখন যা বলেন, সমস্তই ও যেন মুখস্থ ক'রে রাখে। কোনো একটা কথা উঠলেই অমনি বলে, অমর বাবু হ'লে এই কথা বলতেন, কিংবা সেদিন তিনি অমুক বিষয়ে অমুক কথাটি বলছিলেন। তার থেকেই আরো অনেক কথা এসে পড়ে আপনার সম্বন্ধে।

—এতই বা কি কথা আসতে পারে আমার সম্বন্ধে?

—কত কথাই হয়, তা কি এখন মনে পড়ছে? তবে যোগেন বাবুর সঙ্গে প্রায়ই আপনার তুলনা করা হয়। মীরাই আপনাদের দুজনকে নিয়ে তুলনা করে। যোগেন বাবুর সঙ্গে মীরার তেমন বনে না কিনা, একটু ঝগড়া হ'লেই তখন আমাদের বাড়িতে এসে অনেক কথা বলে। মা কত রাগ করেন, বলেন যে স্বামীনিন্দে করতে নেই। মীরা বলে, সত্যি কথা বলবো, তাতে আমার

কোনো ভয় নেই। এই তো সেদিন যখন আমার এখানে আসবার কথা হোলো, তখন মীরা বললে, উনি অনেকদিন হোলো দেশে গেছেন, কোনো খবরও দেন নি, ওঁর জন্যে বড়ো মন কেমন করচে। মা এই শুনে বললেন,—এ কেমন কথা হোলো তোর ? যোগেন যখন বিলেত গিয়ে তিন বছর কাটিয়ে এলো তখন একদিনের জন্যেও তোর মন কেমন করতে শুনলুম না, আর ও পরের ছেলে দুদিনের জন্যে নিজের দেশে গেছে, ওর জন্যে তোর মন কেমন করবে কেন ? মীরা তখন বললে,—তখনকার চেয়ে এখন আমার বোঝবার বয়স হয়েছে, আর সত্যি যা তাই বলছি, সত্যি কথা বলতে ভয় করবো নাকি ? মা ওকে রাগাবার জন্যেই বলেছিলেন, ও অমনি খুব রেগে উঠলো। তখন মা হাসতে হাসতে বললেন,—না না, তা কেন, ছেলেটি সত্যিই খুব ভালো, অনেকদিন না দেখতে পেলে একটু মন কেমন করবে বৈকি। তোর কাছে শুনে শুনে আমারই দেখতে ইচ্ছে হয় ছেলেটিকে।

শঙ্করের কাছে মীরার সম্বন্ধে এত রকমের খবর পেলাম, কিন্তু মীরার শরীর যে খুব অসুস্থ এ কথা সে একবারও বলেনি। কাজে কাজেই কলকাতায় ফিরে যেতে যথেষ্ট বিলম্ব করলাম।

একদিন শঙ্কর বললে,—পল্লীগ্রামের চাষারা কেমন ভাবে থাকে দেখতে বড়ো ইচ্ছে করে। আমি বললাম,—চলো তোমাকে আমার ছেলেবেলাকার এক চাষা-বন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যাই, সেখানে গিয়ে দেখবে তারা গরিব হ'লেও কেমন চমৎকার সুখে আছে।

বাদ্‌লাদের বাড়িতে যেতে যেতে দূর থেকেই একটা কান্নার রোল শুনতে পেলাম। শঙ্কর বললে,—ওদের ওখানে গিয়ে কাজ নেই, নিশ্চয় ওদের কেউ মরেছে। আমি বললাম,—চলো না গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি।

ভেতরে ঢুকে দেখলাম বাদ্‌লার দ্বিতীয়া স্ত্রীর সেই শিশুটি মারা গেছে, তাকে উঠোনে বের করা হয়েছে। বাদ্‌লা, বাদ্‌লার মা, এবং আরো অনেক লোক উঠোনের মধ্যে শুষ্কমুখে বসে আছে। কেবল বাদ্‌লার প্রথমা স্ত্রী মৃত শিশুটিকে

কোলে নিয়ে বুক চাপড়ে চীৎকার ক'রে কাঁদছে, আর কাঁদতে কাঁদতে কাকে অভিসম্পাত দিচ্ছে,—কে আমার দুধের বাছাটির ওপর এমন পোড়া নজর দিলে গো, তার পোড়া বংশে বাতি দিতে কেউ বুঝি নেই গো—

বাদ্‌লার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—ছেলেটির কি হয়েছিল ?

বাদ্‌লা বললে,—কিছুই জানি না বাবু, পরশু দিনও বেশ খেলাধুলা করেছে, আমি মাঠে যাবার সময় কিছুতেই আমাকে ছাড়বে না। পরশু রাত্রে একবার তড়্‌কা হোলো। কাল সকালে ভালোই ছিল, কেবল গাটা একটু গরম। ভাবলাম যে হয়তো গরম লেগেছে, ওকে চান করিয়ে দিই। বিকেল থেকে আবার তড়্‌কা শুরু হোলো। মুখ দিয়ে গেঁজলা বেরুতে লাগলো, এক ঝিনুক জল পর্যন্ত খাওয়ানো গেল না। আজ সকালে হঠাৎ দম আটকে মারা গেল।

আমি বললাম,—তুই আমাকে একবার খবর দিলি না কেন ?

বাদ্‌লা বললে,—খবর দেবো কি, সবাই মানা করলে। বললে যে ওর খারাপ নজর লেগেছে, ডাক্তারি ওষুধে কিছু হবে না, পঞ্চানন্দর তলা থেকে জলপড়া এনে খাওয়া, এখুনি ভালো হ'য়ে যাবে। জলপড়া এনে কত খাওয়াতে চেষ্টা করলাম, সে জল পেটেও তলালো না।

কথাগুলো শুনে আমার অত্যন্ত রাগ হ'য়ে গেল। ভাবলাম যে বলি, সামান্য ম্যালেরিয়াতে বিনা চিকিৎসায় ছেলেটিকে ওরা মেরে ফেললে, একটু খবর পেলে অনায়াসে একে বাঁচানো যেতো,—কিন্তু তখন আর সে কথা বলেই বা লাভ কি ?

শঙ্কর বললে,—চলুন চলুন, এখান থেকে চলুন, এখানে থাকতে আমার একটুও ভালো লাগছে না। চাষার ঘর দেখতে আর আমার ইচ্ছে নেই একটুও।

সমস্ত দিনটা শঙ্কর ম্রিয়মান হ'য়ে রইল, অনেক কষ্টে তাকে ভোলাতে পারলাম।

নানা রকম আমোদ আহ্লাদে ওকে নিয়ে আরো কয়েকটা দিন কাটিয়ে ছুটি ফুরোবার একদিন মাত্র আগে আমরা দুজনে একসঙ্গে কলকাতায় ফিরলাম।

ফিরেই দেখি মীরা গুরুতর ভাবে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে আছে। সে একেবারে শয্যাগত। তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ওর পেটের মধ্যে অপারেশন করানো হোলো। সেখানে অনেক দিন ওকে থাকতে হয়েছিল, তাতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে আবার নতুন ক'রে ঘনিষ্ঠতা জেগে উঠলো। তখন আমার মনের বিরুদ্ধ ভাবটা একেবারেই কেটে গেল। আমি দেখলাম মেয়েটি সত্যিই খুব ভালো, আমি যা ভেবেছিলাম তা নয়। আমাকে ও নিজের অন্তরঙ্গ ক'রে নিতে চায়। আমাকে ওর কোনো কথাই বলতে বাধা নেই, সেটা বেশ দেখতে পাই। আমার নিজের সম্বন্ধেও সকল কথা শুনতে ওর অসীম আগ্রহ। আমার প্রতি ওর একটা সত্যিকার আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

অপারেশনের পর থেকে ওর শরীরটা আস্তে আস্তে বেশ সেরে উঠছিল, দেখে আমার আনন্দ হচ্ছিল। কিন্তু ওর ছেলের হ'য়ে গেল নিউমোনিয়া, তাতেই ছেলেটা হঠাৎ মারা গেল। নিউমোনিয়াতে মরা আজকালকার দিনে মোটেই উচিত নয়, যখন এমন সব চমৎকার ওষুধ বেরিয়েছে। কিন্তু এও যেন অনেকটা সেই বাদলার ছেলে মরে যাওয়ার মতো, সময়মতো চিকিৎসা করা গেল না।

অনেক কষ্টে মীরাকে ঠাণ্ডা করলাম। আমি ছাড়া আর কারো দ্বারা এটা সম্ভব হোতো না। আমি জানি এটা ওর পক্ষে কত বড়ো আঘাত। ভবিষ্যতে ওর সন্তান হবার সম্ভাবনা ঘুচে গেছে, তারপরে যে সন্তানটি ছিল সেটিও মরে গেল। এখন ওর বেঁচে থাকবার উপযোগী কি সম্বল রইল? শুধু স্বামীটিকে নিয়ে সারা জীবনের জন্যে সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকা কি ওর পক্ষে সম্ভব? তাও শুনেছি, স্বামীর সঙ্গে ওর নাকি তেমন বনিবনা নেই। সেটা হ'তেই পারে, কারণ আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, যোগেনের রুচির সঙ্গে ওর রুচির অনেক বিষয়ে তফাৎ আছে।

তখনও ওর শরীর অত্যন্ত দুর্বল। ওকে আরোগ্য করতে হবে, ওর স্বাস্থ্যটা ভালো ক'রে তুলতে হবে। এটা আমারই কাজ, আমি ছাড়া আর কেউ পারবে না। সুতরাং ওকে নিয়ে আমায় কিছুকাল লেগে থাকতে হবে, ওকে

অনবরত ভুলিয়ে রাখতে হবে। মনকে খুশি না রাখতে পারলে ওর শরীর সহজে সারবে না, সুতরাং ওকে ফেলে এখন কোথাও আমার যাওয়া চলবে না। যুদ্ধের কাজে যেতে রাজি আছি বলে লিখে দেওয়াটা আমার অন্যায় হয়েছে, তখন কি এত জানতাম? যাই হোক, তাড়াতাড়ি ঐ সম্মতিটা প্রত্যাহার ক'রে আবার আমি লিখে পাঠালাম, যুদ্ধের কাজে যেতে আপাতত আমি অনিচ্ছুক, কারণ আমার বাড়িতে খুব অসুখ যাচ্ছে, ইত্যাদি।

মীরা বাড়ি ফিরে যাবার পরে তার কাছে প্রত্যহই আমি যেতে লাগলাম বিকেলে। অনেকক্ষণ বসে গল্পগুজব করি আগেকার মতো, মীরাকে অনেক রকম কাজের ফরমাস করি, আজগুবি রকমের খাবার তৈরী ক'রে দিতে বলি, যাতে ও সর্বদা একটা কিছুতে নিযুক্ত হ'য়ে ভুলে থাকে। এতে সবাই আমাকে সমর্থন করে, যোগেনও আমার সঙ্গে সহযোগিতা করে। সকলেই দেখতে পায় যে এতে মীরা থাকে ভালো, পুত্রশোকের কথাটা সে ভুলে যায়, তার মুখে হাসি ফোটে। মনের আঘাতের পক্ষে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ওষুধ হচ্ছে কাজ। যেন কাটা ঘায়ে কতকটা ড্রেসিং চড়িয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেবার মতো,—ওপর থেকে ঘা-টা দেখাও যায় না, এ দিকে চাপা পড়ে ক্রমে ক্রমে আপনিই শুকিয়ে আসতে থাকে।

যোগেনের বাবা বললেন,—আমি তো এখন বরং ভালোই আছি, তুমি এখন বরং বৌমাকে একটু দেখ। তোমার সঙ্গে গল্পটল্প করলে ও বরং খুশিই থাকে, তোমাকে খুব মানে কিনা। সেইজন্যেই তোমার এখন রোজ আসার দরকার। বেচারা বড়ো শোক পেয়েছে।

যোগেনের মা বললেন,—ভাগ্যিস তুমি ছিলে বাবা, তাই আমার বৌমাটি বেঁচে উঠলো। কপালে যা ছিল তাইতো হোলো, এখন ও একটু ভালো হ'য়ে উঠলে আমি বাঁচি। তুমি বাবা তাড়াতাড়ি যেন চলে যেও না, রাত্রে এখানে খেয়ে তবে যাবে।

যোগেন বলে,—তুমি ভাই তোমার রোগীর সঙ্গে বসে বসে গল্প করো, আমার একগাদা মক্কেল এসে বসে আছে, আমি চললাম তাদের সঙ্গে বক্ বক্ করতে।

আমি বলি,—তাহ'লে সুরেনকে এখানে একটু ডেকে দিয়ে যেও।

যোগেন বলে,—সুরেন এখন পড়ছে। আর কাউকে ডাকতে হবে না, তুমি একাই একশো। তোমার এত কিন্তু কিসের বলতো? তাড়াতাড়ি পালাবার মতলব আছে বুঝি? মীরা তোমার সঙ্গে গল্প করতে পেলে একটু খুশি থাকে কিনা, তাই বুঝি তোমার দামটা অনেক বেড়ে গেছে? মীরা আমাকে বলে দিয়েছে, রাত্রি দশটার আগে কিছুতেই যেন তোমাকে না ছেড়ে দেওয়া হয়। আমাব কথা বিশ্বাস না হয়, ওকেই বরং জিজ্ঞাসা ক'বে দেখ।

মীরা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

মীরাব সঙ্গে নানা বকমের হাসিগল্প ক'রে ওকে ভুলিয়ে রাখছি, কিন্তু তবু এতটা মেলামেশা সত্ত্বেও যে অশোভন দেখাবার মতো আচরণ কিছুই করিনা, নিজেব দূরত্ব এবং শিষ্টাচার যে বরাবর বজায় রেখে চলি, এটা সবাই দেখতে পায়। সবাই আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে মীরার কাছে ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, কারো মনে কোনো সন্দিগ্ধতাব আভাস মাত্র নেই।

সবাইকে দেখি সন্তুষ্ট, কিন্তু কেবল একজনকে দেখলে মনে হয় যেন অসন্তুষ্ট। সে ঐ যোগেনের ছোটো ভাই সুরেন।

ঐ ছেলেটিকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনা। শঙ্কর ছেলেটি যেমন সরল, এ তেমন মোটেই নয়। মনের ভিতরে ভিতরে অনেক প্যাঁচ আছে। আমার সঙ্গে আজকাল সহজে কোনো কথা বলে না, আমি কিছু জিজ্ঞাসা করলে খুব সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দেয়। মুখে মোটে হাসি নেই, সর্বদাই যেন গম্ভীর। আগে এমন ছিল না, ক্রমশই দেখছি ওর যেন একটা পরিবর্তন হচ্ছে। আগে কলেজে প্রায়ই আমার কাছে যেতো, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতো, আমাকে যথেষ্ট ভক্তি করতো, কিন্তু এখন আর মোটেই আমার সঙ্গে দেখা করে না। ওদের বাড়িতে গিয়েও দেখতে পাই, হয়তো মীরার কাছে বেশ হাসতে হাসতে কথা বলছে, কিন্তু যেমনি আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম অমনি হাসিটা তার থেমে গেল, মুখখানা বিরক্ত ক'রে তখনই সে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল। যেন আমার

যাওয়াটা তখন অনভিপ্রেত, আমি উপস্থিত হ'য়ে ওর কথার রসভঙ্গ ক'রে দিলাম।

শুধু তাই নয়, মীরার সঙ্গে কথা বলতে বলতেও আমি কয়েকবার দেখেছি যে কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ কোথা থেকে স্থরেন এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলো, টেবিল থেকে কোনো একটা বই কিংবা কাগজ নিয়ে তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, যেন ঐ জিনিসটাই নিতে এসেছিল। কিংবা হয়তো নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে সুমুখের বারান্দা দিয়ে স্থরেন এদিক থেকে ওদিকে চ'লে গেল আমাদের দিকে চাইতে চাইতে, আবার কিছুক্ষণ পরে ওদিক থেকে এদিকে ফিরে গেল। এগুলো হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু আমার চোখে খারাপ লাগতো তাই বলছি।

এমনি ভাবে প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। বরং বেশি তবু কম নয়। ইতিমধ্যে মীরার শোক অনেকটা চাপা প'ড়ে গেছে, শরীরও খানিকটা সেরে উঠেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় আগের চেয়ে একটু যেন বক্তও হয়েছে। আমার দ্বারাই অবশ্য এতটা হয়নি, সময়ে সব জিনিসেরই পরিবর্তন হ'য়ে যায়, মনোকষ্টও ক্রমে মিলিয়ে যায়। কিন্তু তাই ব'লে আমি যে আমার যাওয়া আসা কমিয়ে দেবো এমন কোনো কথা নেই। ওটা যেন অভ্যাসের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। মীরাকেও আর বলতে হয়না যে কাল আবার আসবেন, আমারও যেতে কোনো দ্বিধা হয় না। বরঞ্চ যখন দুচার দিনের জন্যে দেশে গেলে ওখানে যাওয়াটা বাদ পড়ে যায়, তখন দেশ থেকে ফিরে এলেই ওরা বলে,—"আপনি এ-ক'দিন আসেন নি, এমন বিশ্রী লাগছিল।"—কবে দেশে যাবো আর কবে ফিরবো এই কথা নিয়ে মীরা তো অনেক আগের থেকেই দিন গুণতে থাকে, যাবার আগের দিন রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ছাড়তে চায় না।

একদিন একটা শনিবারের কথা বলছি। সেদিন কলেজ থেকে ছুটির পরে দুটোর ট্রেণে দেশে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কলেজ থেকে বেরুতে একটু দেরী হ'য়ে গেল। তখন গেলে ট্রেণ ফেল হ'য়ে যাবো ভেবে সেদিন আর যাওয়াই

হোলো না। ভাবলাম যে এ-সপ্তাহটা নাই বা গেলাম, পরের সপ্তাহে যাওয়া যাবে। কিন্তু মীরা জানে যে আমি আজ দেশে যাচ্ছি। ওকে একটু আশ্চর্য ক'রে দিয়ে মজা দেখা যাবে ভেবে স্টেশনের দিকে আর না গিয়ে বরাবর চলে গেলাম ওদের বাড়ি। তখন বেলা প্রায় দুটোই হবে। অকস্মাৎ এই অসময়ে ওর কাছে একেবারে হাজির হ'যে ওকে অবাক ক'রে দিতে হবে। রাস্তার মোড়ে একটা নার্সারি থেকে কিনলাম প্রকাণ্ড একটা ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুল, মীরার জন্যে উপহার।

বরাবর ওপরে উঠে গিয়ে দেখলাম মীরার ঘরের দরজা বন্ধ। অর্গলবদ্ধ নয়, ভেজানো। কিন্তু হঠাৎ দরজাটা খুলে ঘরে ঢোকা আমার উচিত নয়। আমি ধীরে ধীরে দরজায় ঘা দিতে লাগলাম।

ভিতর থেকে মীরা সাড়া দিলে,—কে, কে?

আমি কিছু না ব'লে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মীরা আবার বললে,—কে তুমি, সাড়া দিচ্ছো না কেন? দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি।

মীরা এসে দরজাটা একটু ফাঁক করে উঁকি মারলে। প্রথমে বললে,—কে তুমি? তারপরে আমাকে দেখেই যেন চমকে উঠলো। আমি আশ্চর্য হ'য়ে দেখলাম, আমাকে দেখে ও যেন হঠাৎ একটু ভয় পেলে। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে,—ও, আপনি? আমি এমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম যে আর কেউ বুঝি। আজ আপনার দেশে যাওয়া হোলো না তাহ'লে? চলুন, ঐ পাশের ঘরে বসবেন চলুন, ঠাকুরপো এখানে ঘুমোচ্ছে।

দরজাটা যেটুকু ফাঁক করা আছে তার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম, সুরেন শুয়ে আছে খাটের ওপরে, চোখ দুটো তার মুদ্রিত।

অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে আমি বললাম,—থাক থাক, আমি এখন চললাম, আমার কাজ আছে।

মীরা বললে,—শুনুন শুনুন একটা কথা—

কিন্তু ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে তর্ তর্ ক'রে আমি নেমে চলেছি। পা দুটো ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে, হাঁটু দুটো যেন সিঁড়ির ওপরেই দুম্‌ড়ে ভেঙে পড়তে চায়। হাতগুলো এমন ভারী, যেন আর আমার হাত নয়, ভারী ভারী দুটো মুগুর। আশ্চর্য হ'যে নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখলাম। হাতে রয়েছে একটা ম্যাগনোলিয়া ফুল। তখন স্মরণ হোলো, ওটা কার জন্যে এনেছিলাম। ফুলটা কুচি কুচি টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ছড়িয়ে ফেলে দিলাম। ততক্ষণে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি রাস্তায় গিয়ে পড়েছি।

মেসে গিয়ে প্রথমে স্নান করলাম। গরমটা কাটলো না। কিছুক্ষণ পরে আবার স্নান করলাম। তবুও গরম কাটে না। বিকেলে ভাবলাম গঙ্গায় গিয়েই স্নান ক'রে আসি। যাবো যাবো ভাবছি, এমন সময় এসে হাজির হোলো স্বয়ং যোগেন।

যোগেন এসেই বললে,—চলো তোমাকে মীরা ডাকছে। আমাকে বলে দিয়েছে জোর ক'রে ধরে নিয়ে যেতে। তুমি নাকি রাগ ক'রে চলে এসেছো, আর নাকি আমাদের বাড়ি যাবে না? তুমিও যে এমন রাগ করতে পারো এটা তো জানতাম না।

আমি নিতান্ত ভালোমানুষের মতো বললাম,—না না, রাগ করবো কেন? উনি ভুল বুঝেছেন। ঐদিকেই আমার একটা কাজ ছিল, তাই ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রেই তাড়াতাড়ি চলে গেলাম। উনি অমনি ভেবে নিলেন বুঝি রাগ করেছি? তা নয়, আচ্ছা চলো আমি যাচ্ছি। স্নানটা সেরে আসি।

খুব শান্তভাবে গিয়ে মীরার ঘরে বসলাম। যেন কিছুই হয়নি। মীরা চা এনে দিলে, খেলাম। যোগেন তখন বললে,—তোমরা এবার মেটামিটি করো বাপু, আমি যাই আমার মক্কেলদের মামলা মেটাতে।

মীরা বললে,—আপনি তখন অমন ক'রে চলে গেলেন কেন?

—আমার তাড়াতাড়ি একটা কাজ ছিল।

—আপনাকে কতবার ডাকলুম, কিছুতেই শুনলেন না।

—শোনবার সময় ছিল না।

—ঠাকুরপোর হঠাৎ জ্বর হয়েছে কিনা, মাথার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছিল। আমার কাছে তাই ছুটে এলো, দুটো দুটো সারিডন ট্যাবলেট—

—ও, বুঝতে পেরেছি। যাক্, তাতে আর কি হয়েছে?

—কিছুই নয়, তখন কি হয়েছিল তাই বলছি। ট্যাবলেট খাইয়ে মাথাটা টিপে দিতেই ঠাকুরপো একটু ঘুমিয়ে পড়লো, আমি তাই দরজাটা ভেজিয়ে দিলুম, পাছে ঠাকুরপো আবার—

দারুণ ঘৃণায় আমার সর্বাঙ্গ রি রি ক'রে উঠলো। দোষ কাটাবার জন্যে কতই প্রয়াস! আশ্চর্য হ'য়ে মীরার মুখের দিকে চাইলাম। ওর তখনকার মুখখানা অতি কুৎসিত দেখালো। অতি সাধারণ এই একটা মেয়ে, এরই জন্যে আমি এতটা মুগ্ধ হয়েছিলাম? কেবল ঠাকুরপো আর ঠাকুরপো, আর কিছু ওর বলবার নেই। এরা সবাই সমান, ঐটুকু পর্যন্তই এদের দৌড়। একটু মৃদু হেসে আমি বললাম,—আমার সৌভাগ্য যে আমি কারো ঠাকুরপো হইনি।

নিমেষের মধ্যে মীরার মুখখানা শাকবর্ণ হ'য়ে গেল। একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদুস্বরে সে বললে,—আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম কেন আপনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। কিন্তু আপনি তো এতদিনে আমাকে অনেকটাই চিনতে পেরেছেন—

—খানিকটা চিনেছি বৈকি। তারপরে এখন অন্য কথা বলুন।

—একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনি এমন রাগ করছেন? আপনাকে কোনো দোষ দিচ্ছিনা, এই রকমই আপনার মনটা হ'য়ে গেছে,—কিন্তু আমাকে তো বিলক্ষণ—

—থাক থাক, ও কথায় আর কাজ কি? যা করেছেন বেশ করেছেন।

—শুনুন আগে আমার কথাটা। একটি কথাও কি আপনি শুনবেন না? যেটুকু আমার বলবার আছে সেটুকু অন্তত শুনে নিন, তারপরে যা খুশি তাই বলুন।

—অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু শুনতে আর আমি চাই না। শোনবার কোনো প্রবৃত্তি নেই।

—আমার ওপরে এত রাগতে পারেন আপনি? এ আমি জানতাম না। কোনো কথাই আপনি শুনতে চাইছেন না, কিন্তু ভেবে দেখুন আপনার কথা আমি কত শুনি। মনে আছে, একদিন আপনি আমাকে আমার খোকার জন্যে কাঁদতে বারণ করেছিলেন, তখন থেকে আর আমি একটুও কাঁদিনি? কেন যে কাঁদিনি, তা কি আপনি জানেন না?

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

মীরার চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে জল পড়তে লাগলো। ভাঙা ভাঙা গলায় ও বললে,—আমাকে অনর্থক এতটা কষ্ট দিতে পারেন আপনি? •

মনে হোলো এটা মায়া কান্না। এমনি ভাবের কথা আমিই একদিন ওকে বলেছিলাম। সেই কথারই ও আজ পুনরুক্তি করছে। চেয়ারে ছিলাম ব'সে, তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। বললাম,—আচ্ছা বেশ, আর কষ্ট দেবো না, এবার আমি চললাম।

কোনো উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে আমি বেরিয়ে চলে এলাম।

পরের দিন ভোরের গাড়িতে দেশে চলে গেলাম। মাত্র একবেলার জন্যে দেশে গিয়ে রাত্রিটুকু কাটিয়ে সোমবার সকালেই ফিরে এলাম কলকাতায়। নিয়মিত সময়ে কলেজে গেলাম।

দুপুর বেলায় হঠাৎ টেলিফোনে ডাক পড়লো। আমিও এমনি একটা কিছু প্রত্যাশা করছিলাম। মীরা আজ টেলিফোনে ডেকে অনেক ক্ষমা চাইবে, অনেক কাঁদুনি গাইবে, বিকেলে ওখানে যেতে অনুরোধ করবে, হয়তো আজ রাত্রে খেতেও বলবে। অবশ্য আমি যাবো, নেহাৎ অভদ্রতাটা আর করবো না,—বন্ধুত্বের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার কোনো দরকার নেই। কিন্তু বেশি অন্তরঙ্গতাতেও আর আমার কাজ নেই। অন্তরের আগ্রহ নিয়ে যেখানেই আমি বেশি নির্ভর করতে যাই সেখানেই এমনি বাধা পাই। বেশিটা অগ্রসর হ'য়ে

যাওয়াই আমার এক দুর্বলতা, সেইজন্যে আমায় এই সব নিগ্রহ ভোগ করতে হয়।

মনে মনে অনেক কথা ভাবতে ভাবতে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম। ফোন ধরেই জিজ্ঞাসা করলাম,—এমন অসময়ে ডাকচেন কেন? কারো অসুখবিসুখ নয় তো?

উত্তর এলো অত্যন্ত ভারী একজন ইংরেজের গলায়। আমাদের হেড অফিস থেকে টেলিফোন আসছে, কথা বলছেন আমাদের বড়ো কর্তা স্বয়ং। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—একবার তুমি যুদ্ধের চাকরি নিতে স্বীকার হ'লে, আবার লিখলে যেতে পারবো না, এর কারণ কি? তুমি ভালো অ্যানাটমি জানো, যুদ্ধে গেলে সার্জনের কাজ খুব ভালো পারবে। সেইজন্যেই তোমাকে বিশেষ ভাবে যেতে বলছি, যুদ্ধ বিভাগ থেকে ভালো সার্জন চেয়ে পাঠিয়েছে। অনেক বেশি মাইনে পাবে, অথচ আপাতত ভারতবর্ষের মধ্যেই থাকবে। যদি রাজি হও তো বলো, আমি তাহ'লে এখনই টেলিগ্রাম ক'রে দিই।

আমি বললাম,—যেতে রাজি আছি, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি?

—হাঁ, তাড়াতাড়িই যেতে হবে, এখনই লোক দরকার। আজই আমি অর্ডার পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওখানকার একজন অ্যাসিষ্টাণ্টকে তোমার চার্জ বুঝিয়ে দাও। কাল থেকে সাতদিন তোমার জয়েনিং টাইমের ছুটি পেলে, এর মধ্যে তৈরী হ'য়ে নাও। সাতদিন পরে তোমাকে সেখানে হাজির হ'তে হবে।

ভাবলাম যাক্‌গে, এ আমার পক্ষে ভালোই হোলো। নিজের থেকে হয়তো কোনো দিন বাঁধন ছিঁড়ে যেতে পারতাম না, এখন বাধ্য হ'য়ে যেতে হবে। দুটোর সময় দেশে যাবার ট্রেণ ছিল, কলেজের চাকরির সমস্ত চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে একেবারে সটান দেশে চলে গেলাম। সেখানকার জমিজমা আর আদায়পত্রের ভার সুবলকে বুঝিয়ে দিতে, পশ্চিমের বিষয়সম্পত্তি গুলোর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে, এবং আরো কয়েকটা জরুরী কাজের নিষ্পত্তি ক'রে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আসতে চার পাঁচদিন সময় লাগলো। ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্যে

একজন মাষ্টার নিযুক্ত ক'রে এলাম, আর আমাব স্ত্রীর হাতে থোক্ কিছু টাকাকড়িও দিয়ে এলাম।

এর মধ্যে চম্পকী একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল,—হঠাৎ যুদ্ধের চাকরি নিতে গেলে কেন?

আমি বললাম,—এমনি। মাইনেটা এখানকাব চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া ভাবলাম, দেখে আসি যুদ্ধের ব্যাপাবটা।

—আমাদের বাবণ তো শুনবে না, কিন্তু যদি মারা পড়ো তখন কি হবে?

—তাহ'লেও কোনো চিন্তা নেই, তোমরা চিবকাল মোটা পেন্‌শন পাবে।

—তোমার সেই বন্ধুর বাড়িব কেউ এ চাকরি নিতে বাবণ করলে না?

—ওদের বারণ করবার কি অধিকার আছে? আব করলেই বা শুনছে কে?

এর পরে সে আব কিছু বলেনি। কোনো একটা অন্যায় অনুরোধ ক'রে নিজেকে অপদস্থ করা কখনই তার স্বভাব নয়।

কলকাতায় যখন ফিরলাম তখন একটি দিন মাত্র সময় আমাব হাতে আছে। পোষাক প্রভৃতি কেনবাব জন্যে নগদ ছ'শো টাকা হাতে পেয়েছি, বিস্তর রকমের জিনিসপত্র কেনাকাটা ক'রে সেদিন বিকেলে গেলাম যোগেনদের বাড়ি। বহুদিনের জন্যে বিদায় নিয়ে এবাব বহুদূরে চলে যাচ্ছি, এই কথাটি এবাব নীবাকে গিয়ে বলতে হবে। তাহ'লেই আমার সব কর্তব্য মিটে যায়। হয়তো এই আকস্মিক বিদায়েব আঘাতটা তাকে মোক্ষম বকমে লাগবে। কিন্তু আঘাত লাগানো ছাড়া এখানে আর উপায় কি,—আমি যে তাকে প্রকৃতই ভালোবাসি। আমার ভালোবাসার সোজা দিকটা যখন সে নিতে পারলে না, তখন এই উল্‌টো দিকটাই তাকে নিতে হবে। হয়তো অন্যায় সে বিশেষ কিছুই করেনি, কিন্তু ওর ভাগ করা বন্ধুত্ব আর সেবাযত্ন আর সন্দেহ ঘোচাবার জন্যে যত কৈফিয়ৎ,—এই কি শুধু আমি ওর কাছে চেয়েছিলাম? সন্দেহের দিক থেকে কোনো প্রশ্নটাই যাতে না উঠতে পারে এমন ব্যবস্থা ও করেনি কেন? তা করবে না, মেয়েরা সবাই সমান। যা দেবার আছে তা খানিকটা মাত্রই দেখায়, আর বাকিটা

রাখে লুকিয়ে। এর শাস্তি ওকে নিতেই হবে। সেদিন কিছু দিয়ে এসেছি, আজ আরো কিছু দিয়ে বিদায় নেবো। গিয়ে প্রথমেই কি বলবো, আমার যাবার খবরটা কেমন ভাবে ঘুরিয়ে বললে সব চেয়ে জোরে ওর লাগবে, মনে মনে তাই রচনা করতে কবতে গেলাম। তীব্র একটা কশাঘাত লাগিয়ে দিয়ে একবার ভালো ক'রে দেখে নিতে হবে, তাতে কতখানি ওর লাগে। ওতেই আমার আনন্দ। ধরতে গেলে যখন ধরা যায় না, তখন ছেড়ে চলে যাবার সময় দেখতে চাই, ধরে রাখবার ব্যাকুলতা নিযে ও দারুণ ছট্‌ফট্ করতে থাকে কিনা। তাই শুধু দেখে চলে যাবো। তারপরে ও যদি আমাকে ভুলেও যায, তাতেও কোনো দুঃখ নেই।

মীরার কথা

সেদিন উনি একটা তুচ্ছ কথায় এমন রাগ ক'রে উঠে চলে গেলেন, তারপরে ক'দিন আর দেখাই দিলেন না। শুনলুম হঠাৎ দেশে চলে গেছেন।

পুরুষ মানুষেরা আমাদের মোটে চেনে না। ওরা মনে করে যে আমরা অব্যবস্থিতচিত্ত, অস্থিরমতি, আমাদের ওপরে কোনো বিশ্বাস করা যায় না। কত বড়ো যে ভুল ধারণা ওদের।

অনেক লোকের লেখা বইও পড়ে দেখেছি,—কিন্তু আমাদের ঠিকভাবে বুঝেছিলেন শুধু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'চতুরঙ্গ' বইখানা পড়লেই তা বোঝা যায়। ননিবালা অতি সাধারণ একটি ভালোমানুষ গোছের মেয়ে, কিন্তু সে দৈবক্রমে ভালোবেসেছিল দুশ্চরিত্র পুরন্দরকে। পুরন্দর ওকে ত্যাগ করলে, বহু রকমের নির্যাতন করলে, কিন্তু তবুও,—আর জ্যাঠামশায়ের মতো মহাপুরুষের অনেক চেষ্টাতেও সে শচীশের মতো অসাধারণ চরিত্রের একজন অন্য পুরুষকে কিছুতে বিয়ে করতে পারলে না, সেই পুরন্দরকে ভুলতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সে আত্মহত্যা করলে। দামিনীর চরিত্র তার উল্টো ধরণের, সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে, কিন্তু দৈবক্রমে সে ভালোবাসলে ঐ শচীশকে। শচীশ তাকে গ্রহণ করতে চায় না, একদিন তাকে লাথি মারলে, তাড়িয়ে দিলে, এমন কি শ্রীবিলাসের সঙ্গে তার বিয়ে পর্যন্ত দিয়ে আলাদা ঘর বেঁধে দিলে, কিন্তু তবু সে ঐ শচীশের বদলে শ্রীবিলাসকে মন থেকে মেনে নিতে কিছুতেই পারলে না, শেষে সেও একরকম ভাবে আত্মহত্যাই করলে। মেয়েরা ননিবালাই হোক আর দামিনীই হোক, আসলে কিন্তু সবাই সমান। একবার যাকে ধরে তাকে আর কিছুতেই ছাড়তে পারে না। এই হলো প্রকৃত নারী-চরিত্র। যতক্ষণ তার বুকের মধ্যে এই ভালোবাসার ছাপটি না পড়েছে ততক্ষণ সে কাদার তালের মতো নরম, তার

কোনো কিছুই স্থিরতা নেই, সেকভের ডার্লিংএর মতো তাকে যেদিকে বাঁকাও সেই দিকেই বেঁকবে। কিন্তু যেমনি তার বুকে সেই বিশিষ্ট প্রিয়ব্যক্তির পদ-চিহ্নটি একবার পড়লো অমনি সেই ছাঁচে তার সমস্ত অন্তরটা সিমেণ্ট কংক্রিটের মতো চিরস্থায়ী ঢালাই হ'য়ে যাবে। সেই নির্দিষ্ট মানুষের পদচিহ্নটি সারাজীবনের মধ্যে সেখান থেকে আর কিছুতে মুছবে না, অন্য কোনো পদরেখার দাগ সেখানে আর কিছুতে ধরবে না। সাবিত্রীর উপাখ্যানের মধ্যে যে সতীত্বের বর্ণনা আছে এ সেই জিনিস। সকল নারীর মধ্যেই এটা আছে, সত্যবানের দেখা পেলেই ফুটে ওঠে। তখন আর তার একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কোনোই নড়চড় হবার সম্ভাবনা নেই। আদর্শ কিংবা ভালোবাসা পুরুষদের বদলে যেতে পারে, মেয়েদের বদলায় না।

কিন্তু এত কথা উনি জানবেন কেমন ক'রে? একজন মেয়েকে মাত্রই দেখেছেন, যার সঙ্গে ওঁর কোনো বিষয়েই মিল নেই,—সেই অমিলকে গোঁজামিল দিয়ে চালাতে গিয়ে মারাত্মক রকমের একটা ঘা খেয়েছেন। তাই স্বভাবটাই হ'য়ে গেছে সন্দিগ্ধ। এতে ওঁর কোনো দোষ নেই, মনটা এখনো সুস্থ হ'তে পারেনি কিনা। আমি তো জেনেশুনেই সেই কাজের ভার নিয়েছি। অবিশ্বাসের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের গাছ ফলাবো, এই হবে আমার কাজ।

সেদিন অমন ক'রে আমাদের বাড়ি থেকে হঠাৎ চলে যাওয়াতে প্রথমটায় ব্যথা পেলুম বটে, কিন্তু ওতে আমার কোনো দুঃখ হয়নি, বরং একটা আনন্দ হয়েছে। ওঁর সম্বন্ধে একটা নতুন রকম পরিচয় পেলুম। কেবল আমার কারণেই আমার ওপরে উনি এমন নিষ্ঠুর হলেন। এতেই আমি আরো স্পষ্টভাবে জানতে পারলুম যা এতদিন ধরে জানতে চেয়েছিলুম,—উনি ওঁর স্ত্রীকে কতটুকু ভালো-বাসতেন। সে প্রকৃতই একটা দোষ করেছিল, কিন্তু তার প্রতিও উনি এমন নিষ্ঠুর হ'তে পারেন নি। প্রকৃত ভালোবাসলে তবেই তার ওপরে এমন নিষ্ঠুর হওয়া যায়। উনি আমাকেই প্রকৃত ভালোবাসেন।

ওঁর একটু ঈর্ষা হয়েছিল। তা হ'তেই পারে। আমার স্বামীর সম্বন্ধে ওঁর কোনো ঈর্ষা নেই, উনি জানেন যে সেখানে ঈর্ষার কোনো কারণ নেই। অন্য কারো সঙ্গে আমার হৃদ্যতা উনি একটুও সহ্য করতে পারেন না। ঠাকুরপো অসুস্থ হ'যে শুধু আমার ঘরে এসে শুয়েছে, তাই দেখে উনি অমনি—

কিন্তু আমি অবাক হ'যে দেখছিলাম—ওঁর রাগের কী বিচিত্র ভঙ্গিমা! কী সংযতবাক প্রচণ্ড রাগ, একেবারে খাঁটি পুরুষালী জিনিস, ওর মধ্যে কোনো অভিনয় নেই। এমন সংহত অথচ সর্বদাহী রাগ কেবল বাবার ছাড়া আর কারো আমি দেখিনি। রাগলে কান দুটো টকটকে লাল হ'যে ওঠে, আর মুখ-খানা যে আরো কত সুন্দর দেখায়! মনে হয় সেই মানুষই কেমন স্নিগ্ধমূর্তি থেকে জ্বলন্তমূর্তি হ'য়ে গেলেন। রাত্রের যে আলো তার নাম জ্যোৎস্না, তার স্নিগ্ধ রূপটি সুন্দর। আর দিনের যে আলো তার নাম রৌদ্র, তার রুদ্র রূপটিও কী সুন্দর নয়? দুই রকম আলোর উৎপত্তি যে একই জায়গা থেকে।

জীবনে এ আমার এক আশ্চর্য অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথের গানে শুনেছিলুম, —'কাঁদালে আজি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে, নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে—' কাঁদতে কাঁদতে পুলক লাগা যে কেমন তা আমি কখনো জানতুম না, আজ বুঝলুম সেটা কেমন।

ঐ যে আমার ঘরে বাবার এস্‌রাজটা রয়েছে, যেটা এখনও মাঝে মাঝে বাজাই,—আঘাত না পেলে ও বাজে না। কিন্তু যেমন তেমন হাতের আঘাত হ'লে ওর চলবে না, তাহ'লে ও বেসুরো বাজবে। কেবল গুণীর হাতের সেই আশ্চর্য রকমের আঘাতটি পেলে তখনই ও পুলকে ঝঙ্কার দিয়ে উঠবে। আমারও বীণা তাই আজ বাজলো, গুনীর হাতের এক আশ্চর্য আঘাতে এর পর্দায় পর্দায় তারে তারে সুরের ঝঙ্কার তুলে অতি মিঠা সুরে আমার বীণা আজ বেজে উঠলো। কত কাল পরে, কত যুগ পরে এই বীণা আজ নতুন ক'রে নতুন সুরে বেজে উঠেছে। সেই আঘাতের বিপুল ঝঙ্কারে যদিও এর মর্‌চেপড়া তারগুলো ছিঁড়ে যাওয়া সম্ভব, তবুও আমার বীণা এমনি ক'রে আরো বাজুক বাজুক।

এ যে আমার সৌভাগ্য। যে পথে পা দিয়েছি তাতে দুঃখ একটু পেতে হবে বৈকি। উনি নিজেই কতবার বলতেন,—আকাশে মেঘ থাকবে না, কাঁটাবনে কাঁটা থাকবে না, ভালোবাসায় দুঃখ থাকবে না, আব শরীরে রোগ থাকবে না, এ রকম প্রত্যাশা করাই বোকামি।

আমার ঠাকুরপো বলে, আমি খানিকটা শিক্ষিত হলেও আমার কথাগুলো নাকি মোটেই আধুনিক কালের মতো শোনায় না। তা হবেও বা, আধুনিক কালে জন্মেও আমি হয়েছি পৌরাতনিক। কিন্তু আমার মন এক ধুয়ো ধরে বসলো, আরো আঘাত সহ্য করবো, আরো আরো আঘাত আমি সহ্য করবো।

অনেক রকম ভেবেচিন্তে এই কথাই আমি স্থির করলুম। ওঁর বিশ্বাসে যখন ঘা লেগেছিল, তখন যুক্তিতর্কের অবতারণা ক'রে সেটা কাটাতে যাওয়াই আমার ভুল হয়েছিল। অবিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে কখনই কাটানো যায় না। ওঁর অন্যায় আঘাতকে আমি নির্বিবাদে মেনে নিলুম। উনি যখন ফিরে আসবেন, তখন ঐ কথাই বলবো।

এলেন উনি ছ'দিন পরে। আমার ঘরে এসে ঢুকতেই ওঁকে প্রণাম ক'রে বললুম,—আমার দোষ হয়েছিল স্বীকার করছি। আমি যাই কিছু ক'রে থাকি, আপনার মনে কষ্ট হয়েছে। তাতেই আমার অন্যায় হয়েছে। তার জন্যে আরো শাস্তি নিতে আমি প্রস্তুত আছি। আবো যে শাস্তি আপনি দিতে চান দিন।

উনি বললেন,—ও সব কথা এখন থাক। তার আগে আমার একটা বিশেষ কথা বলবার আছে।

—কী বলতে চান বলুন, কিন্তু আপনার কথার আগে ঐটুকুই কেবল আমার বলবার ছিল যে সব রকমের শাস্তি নেবার জন্যে আমি প্রস্তুত।

—আপনাকে শাস্তি দেবার আগে যে আমি নিজেই একটা শাস্তি বেছে নিয়েছি। এখানকার চাকরি ছেড়ে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে আমি দূরে চলে যাচ্ছি। কালই আমাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে। কতদিনে ফিরতে পারবো তা জানি না।

সকল রকমের আঘাতের কথাই আমি ভেবেছি, কিন্তু এর জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না। এ নিতান্তই বজ্রাঘাত। শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আমি কেমন অসাড় হ'য়ে গেলুম। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে মনে স্থির ক'রে নিলুম,—এও সহ্য করবো, এও সহ্য করবো। শুনতে পেয়েছি যে কালকেই ওঁকে চলে যেতে হবে, তবু মুখভাবের কিছুমাত্র বিকৃতি না ঘটতে দিয়ে খুব শান্ত মৃদুস্বরে আবার আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—কবে আপনাকে যেতে হবে ?

—কালই।

—দুদিন দেরী ক'রে যাবারও বুঝি কোনো উপায় নেই ?

—একদিনও না। যুদ্ধের কাজে একবার পা বাড়িয়ে দিলে তখন আর ফিরবারও কোনো উপায় থাকে না, দেরী করবারও উপায় থাকে না।

—আপনার দেশের বাড়িতে এ খবরটা জানিয়েছেন কী ?

—নিশ্চয়, অর্ডারটা পেয়ে আগেই তো আমি দেশে চলে গেলুম। সেখানকার সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আজ মাত্র ফিরেছি।

—অর্ডার কী তারা এমনিই দিলে, না আপনিই আগে যেতে চেয়েছিলেন ?

—তা কী হয়, আমি না যেতে রাজি হ'লে কখনো তারা অর্ডার দিতে পারে ?

—তাহ'লে কালই আপনাকে যেতে হবে ?

—নিশ্চয়, এতে আর কোনো ভুল নেই।

আর কী আমার বলবার আছে ? আমি চুপ ক'রে রইলুম।

উনি তখন বললেন,—একদিন একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছিলুম, সেজন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। ওটা যেন আপনি মনে রাখবেন না, ভুলেই যাবেন।

ছি ছি ছি, সেই পুরোণো কথাটা নিয়ে এমন ক'রে এখন ক্ষমা চাইবার জন্যে কে ওঁকে মাথার দিব্য দিয়েছিল ? শুধু তাই নয়, আমি কোনটা মনে রাখবো আর কোনটা ভুলে যাবো তাই নিয়েই বা ওঁর এত মাথাব্যথা কিসের ? কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মুখ ফুটে বলবার কিছু নেই। আমি চুপ ক'রে রইলুম।

উনি বললেন,—কিছুই কী আপনার বলবার নেই ?

—আর কিছু না, কেবল একটি কথা বলবার আছে। আপনি যেখানেই যান আর যেখানেই থাকুন, আমাকে নিয়মিত ভাবে চিঠি দেবেন। এইটুকু ছাড়া আর কিছু আমি চাইনা। আমিও আপনাকে কথা দিচ্ছি, যাতে আপনার মনে একটুও কষ্ট হ'তে পারে এমন কাজ আমি কখনই করবো না।

এতক্ষণে উনি যেন একটু খুশি হলেন। বললেন,—নিশ্চয়ই চিঠি দেবো।

যাবাব সময় উনি ঘটা ক'বে সকলের কাছে বিদায় নিলেন। যেন খুব খুশি হয়েই যাচ্ছেন। আমার শ্বশুরকে শরীররক্ষা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, শাশুড়ীর কাছে বসে অনেক খাবার খেলেন।

ওপবের বারান্দার রেলিং ধরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে উনি বারান্দাব দিকে মুখ তুলে একবার চেয়ে দেখলেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সোজা চলে গেলেন।

ওঁব চলে যাবার কথাটা নিয়ে ঠাকুবপোর সঙ্গে আমার প্রায়ই আলোচনা হয। ঠাকুরপো বলে,—অমর বাবু যে হঠাৎ যুদ্ধেব কাজে চলে গেলেন, তুমি বারণ করলে না ?

—চাকরি যখন নিয়েছেন তখন যেখানে পাঠাবে সেখানে যেতেই উনি বাধ্য, আমি বারণ করলেই বা চলবে কেন ?

—আগে উনি নিজে যেতে স্বীকার হয়েছেন, তবেই তো ওঁকে পাঠিয়েছে ?

—তাও যদি হয়, উনি নিশ্চয় ভালো বুঝেছিলেন তাই বলেছিলেন।

—তুমি সেটা জেনেশুনেও বুঝি ধরে রাখতে পারলে না ? চেষ্টা করেছিলে নিশ্চয় ? এখন বুঝলে তো বৌদি, তোমার সেই কাব্যগন্ধা পাথুরেঘাটা প্যাটার্ণ ভালোবাসা কিংবা শ্রদ্ধাভক্তি যাই বলো না কেন, তার কোনো কিছুই দাম নেই ? নিজের স্বার্থই সকলের চেয়ে বড়ো, তার কাছে ও সব জিনিস দাঁড়াতে পারে না। ও নিয়ে বড়াই করা বেশ চলে, কিন্তু কাউকে ধরে রাখা যায় না।

—ধরে রাখতে আমি যাবোই বা কেন? আমাদের মধ্যে ধরে রাখবার সম্পর্কই নয়। উনি যেখানেই যান না, তাতে আমার শ্রদ্ধা ভালোবাসা ক্ষুণ্ন হবে কেন?

—হবে বৈকি, তোমার না হোক ওঁর হবে। চোখের আড়াল হ'লেই তখন মনের আড়াল হ'য়ে যাবে। এই হচ্ছে পৃথিবীগ্রহের মানুষদের স্বভাব।

—কিন্তু তুমি দেখো, আমাদের তা হবে না। মনের মধ্যেও যে দুটো চোখ সর্বদা চেয়ে আছে, সে তোমাদের কলেজের দুরবীনের মতো, অনেক দূরে চলে গেলেও তার দৃষ্টিশক্তিতে কোনো আড়াল হয়না, বরং তাতে আরো যেন কাছেই দেখতে পায়। উনি যে দূরে চলে গেলেন তাতে আমার ক্ষতি কী? তুমি দেখো, এখানে থাকলে যা হতো, তার চেয়ে এখন বরং ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে উঠবে।

—হাজার মাইল দূর থেকে ঘনিষ্ঠতা? ও সব হচ্ছে স্রেফ ধোঁয়ারাজ্যের কথা, আমরা স্থূলবুদ্ধি রক্তমাংসের মানুষ, শুনলেও কিছু বুঝতে পারি না। প্র্যাকটিকাল কথা বলো বৌদি, কাব্যের হেঁয়ালিগুলো ছেড়ে দাও।

—আচ্ছা না হয় ছেড়েই দিলুম। তোমার প্র্যাকটিকাল কথাটা তাহ'লে কী তাই এবার শুনি।

—আমি বলতে চাই যে আমি তোমার খুবই কাছে আছি, এবং আশা করি চিরকালই কাছে থাকবো। তোমার ঐ মিষ্টি বন্ধুত্বটুকুর দাবী করবার অধিকার এখন শুধু আমার, যে বাইরের লোকটা হঠাৎ মায়া কাটিয়ে দূরে চলে গেল তার নয়।

—কাছে থাকলেই কী খুব কাছে পাওয়া যায় ঠাকুরপো? তা কখনই নয়। কাছের মানুষেরাও সরে যায় কত দূরে, আবার দূরের মানুষেরাও এসে পড়ে কত কাছে, এর কোনো একটা ঠিকানাই নেই। এই দেখ না, তোমরা তো আমাকে এতটা কাছেই বেঁধে রেখে দিয়েছ, কিন্তু তবুও আমি এখানে নেই, আমি চলে গেছি সেই হাজার মাইল দূরে। দিনের মধ্যে দুশো বার সেখানে আনাগোনা করছি। এর আর কী উপায় আছে বলো?

—প্রকৃতিস্থ হও বৌদি, নিতান্তই খেপে যেওনা।

—তুমি জানোনা ঠাকুরপো, তাই বলছো। এতদিন আমি অপ্রকৃতিস্থ হ'য়েই ছিলুম, এখন একটা সোজা রাস্তা পেয়েছি। তুমি দেখে নিও, আমার চেয়ে বেশি প্রকৃতিস্থ তোমরা কেউ নও।

কিন্তু কাজ না হ'লে মানুষের চলে না। আর আশ্চর্য এই যে সংসারে সকল সময়ের জন্যেই কাজেরও কোনো অভাব নেই। একটা কাজ ফুরিয়ে গেলে তখনি আবার একটা যা হোক জুটেই যায়, সময়টা বেশিদিন ফাঁকা থাকে না। কেমন ক'রে আমার সময়টা কাটাবো যখন ভেবে পাচ্ছিনা, তখন আমার একটা নতুন রকমের কাজ জুটে গেল।

অমর বাবুর বাপের আমলেব একজন বুড়ো চাকর, তার নাম ছট্টু। আমি তাকে আগে চিনতুম না, কিন্তু আমার দাদা চিনতো। দাদা যখন বেড়াতে গিয়েছিল ওঁদের দেশে, তখন ছট্টু সেখানে ছিল, ওর সঙ্গে দাদার খুব ভাব জমে গিয়েছিল। এই লোকটি অমর বাবুকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছিল, এখনও পর্যন্ত ববাবর ওঁব সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো। উনি যখন মেসে থাকতেন তখন সেও সেখানে থাকতো, উনি যখন ওঁদেব দেশে যেতেন তখন সেও সঙ্গে যেতো। লোকটি যদিও এখন বুড়ো হ'য়ে অনেকটা অথর্বের মতো হ'য়ে গেছে, কিন্তু চমৎকাব কথকতা করতে পারে, হিন্দি দোঁহা গাইতে পারে। আমার দাদার আবার ঐ সব শোনবার খুব শখ, সে ছট্টুকে ওরই জন্যে খুব তোয়াজ করতো। কলকাতায় ফিরে এসে দাদা অনেকবার ওকে আমাদের পাথুরেঘাটার বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গেছে, মাকে ওর কহানি আর দোঁহা শুনিয়ে দিয়েছে।

অমর বাবু যখন মিলিটরির চাকরি নিয়ে চলে গেলেন তখন ছট্টু এখানে ছিল না, সে ছুটি নিয়ে নিজের দেশে গিয়েছিল। দেশ থেকে ফিরে এসে দেখে উনি নেই। তখন সে চলে যায় ওঁদের দেশে। ওঁর স্ত্রী কিন্তু সেখানে ওকে রাখতে চাইলে না, বললে,—তুমি বুড়ো হয়েছো, কোনো কাজ করতে পারবে না, কে

তোমাকে শুধু শুধু এখানে পুষবে? এখন তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও, বাবু এলে আবার এসো। অমর বাবুর মা বোধ হয় ওকে রাখতে রাজি ছিলেন, কিন্তু খরচের ভয়ে আর পুত্রবধুর অনিচ্ছা দেখে সাহস ক'রে কিছু বলতে পারেন নি। ও তখন কলকাতায় ফিরে এসে কাজের জন্যে গিয়েছিল আমার দাদার কাছে। সে-বাড়িতে মানুষের সংখ্যা এখন খুব কম, উদ্বৃত্ত চাকরের কোনো প্রয়োজন নেই। দাদা তাই ওকে নিয়ে এলো আমার কাছে। বললে,—একে রাখবি? লোকটি খুব ভালো, এমন চমৎকার দোঁহা গাইতে পারে যে কী বলবো।

আমি হেসে বললুম,—দোঁহা শুনলে তো পেট ভরবে না, কাজ করা চাই। ও যে অথর্ব বুড়ো, সর্বদা কোমর বেঁকিয়ে আছে, ও কী কাজ করতে পারবে?

দাদা বললে,—পারবে বৈকি, নিশ্চয় পারবে। দেখতে বুড়ো হ'লে কী হয়, ওর গায়ে খুব জোর। অমর বাবুর সব কাজগুলো তো ও একলাই করতো।

তখন ওর সব পরিচয় আমি শুনলুম। বললুম,—আচ্ছা এখন তবে ও আমাদের বাড়িতেই থাক, যখন তিনি ফিরে আসবেন তখন তাঁর কাছে আবার যাবে।

ছটুকে রাখলুম বটে, কিন্তু দুদিন পরেই দেখলুম যে ও কোনো কাজ করতে পারে না, শুধু দোঁহা গাইতেই পারে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—ছটু, তুমি তোমার বাবুর কী কী কাজ করতে পারতে?

সে বললে,—আমি ছাড়া বাবুকে আর কে দেখবার ছিল বহুজী? আমিই বরাবর ক'রে আসছি ওর সেই ছেলে-বয়স থেকে আর এই যোয়ান-বয়স পর্যন্ত। ছেলে বয়সে কোনো দোষ করলে কান মলে দিতুম, রাত্রে ঘুম না হ'লে নিজের কাছে শুইয়ে কত গল্প ব'লে ঘুম পাড়াতুম। চিরকাল আমার কাছেই বাবু মানুষ হয়েছে। এখন সে দুই ছেলের বাপ হয়েছে, এখন তো আর কান মলে দিতে পারি না, আমার কাজ তাই আরো অনেক বেড়ে গেছে। বাবু চিরকালই খামখেয়ালি, নাওয়া খাওয়া কোনো কিছুর ঠিকানা থাকে না। এমন কি খাবার

সময় মনে করিয়ে দিতে হবে যে খিদে পেয়েছে, খাও। কলেজ যাবার দেরী হচ্ছে, ঘড়ি দেখিয়ে সে কথা বলে দিতে হবে। সকালে ঘুম ভাঙিয়ে বলতে হবে, বেলা হয়েছে, চা খাও। একদিন একটা পোষাক পরলেই সেটা ময়লা ক'রে ফেলবে, পরেব দিন আবার চাই ফর্শা পোষাক। আগের থেকে সেগুলো হিসেব ক'রে লুকিয়ে রাখতে হবে, দরকারের সময়টিতে বের ক'রে দিতে হবে। পয়সাকড়ি পকেটে পড়ে থাকবে, সেগুলো পকেট থেকে নিয়ে তুলে রাখতে হবে, বেরোবার সময় আবার পকেটে দিতে হবে। অনেক রকমের ঝামেলা ছিল, কত তার হিসেব দেবো?

আমি বললুম,—তাহ'লে এ ছাড়া পরিশ্রমের কাজ তোমার কিছুই ছিল না বলো?

ছট্টু বললে,—আর পরিশ্রমের কাজ কী? রান্নাবাড়া কাপড় কাচা, সে তো মেসের চাকর বামুনে করতো, বাড়িতে গেলে বাড়ির লোকেরা করতো। কিন্তু বাবুর হুঁশিয়ারি করা, সর্ব জিনিসের তদারক করা, সেই কী কম মেহনতের কাজ? ওঁর অনেক রকমের বাহানা ছিল, সেগুলোকে সামলাতো কে? একদিন দুপুর রাত্রে হঠাৎ খেয়াল হলো যে—

এমনি একটা কোনো প্রশ্ন করলেই ছট্টু ওঁর অতীত আর বর্তমান যুগের যত বিস্তারিত গল্প শুরু ক'রে দিত। ও যে ছিল তাঁর একমাত্র অভিভাবক, ও না থাকলে যে তাঁব সব কিছুই অচল, এই কথাটাই ওর প্রতিপাদ্য। আমি সব শুনতুম। শুনতে শুনতে ওঁর সমস্ত বিগত জীবনটা আমি ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পেতুম। নিতান্ত অসহায় অগোছালো ঐ বাঁধনছেঁড়া বঞ্চিত মানুষটি ছেলেবেলায় পাননি পিতামাতার স্নেহ, যৌবনে পাননি স্ত্রীর আদর, কোথাও পাননি কোনো নিশ্চিন্ত আশ্রয়। আগ্রহ আর আশা নিয়ে যেদিকে গেছেন সেদিক থেকেই বিমুখ হয়েছেন। জীবনধারণের জন্যে শেষে নির্ভব করেছেন বাল্যজীবনের সম্বল ঐ বৃদ্ধ চাকরটির ওপরে, ভালোবেসেছেন কুকুরকে, ভালোবেসেছেন নিজের বন্দুক আর ক্যামেরাকে। কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের ওপরে নির্ভর করতে না

পারলে কী ও রকম ধরণের পুরুষমানুষের কখনো চলে? এমন একজন থাকা চাই যে ওঁর খাসমহলের দিকটার খবরদারি করবে, ওঁর মনের শূন্য স্থানটাকে পূর্ণ ক'রে রাখবে। আমি যে রয়েছি সেই জন্যেই, আমিই নেবো সেই ভার—ওঁকে রক্ষা করবার, আশ্বাস দেবার, প্রেরণা দেবার ভার, যা ওঁর পক্ষে নিতান্তই প্রয়োজন, যা নইলে উনি বাঁচতেই পারবেন না। কিন্তু এ কথা আপাতত আমার মনে মনেই রইল।

ছট্টুকে বললুম,—এখানে তোমাকে ও সব কাজ করতে হবে না, কিন্তু এখানে একটু পরিশ্রম করতে হবে।

ছট্টু বললে,—হুকুম করবেন বহুজী, যতটা পারবো ততটা করবো।

অনেক রকমের হুকুম ক'রে দেখলুম, কোনোটাই ও পারে না। পারতপক্ষে ওকে নিষ্কৃতি দিতুম, ওর কাজগুলো যতটা সম্ভব নিজেই ক'রে নিতুম।

কিন্তু আমিই না হয় ঐ অপাবগ বৃদ্ধকে কোনোমতে সহ্য করলুম, আমার শাশুড়ী কেন সহ্য করবেন? তাঁর বকুনির একটা বাই আছে সে কথা আগেই বলেছি। আগে আগে আমাকেই বকতেন। ইদানিং আমি বড়ো হ'যে উঠেছি, তার ওপরে একটা পুত্রশোক পেয়েছি, আমাকে আব আজকাল বকতেন না। এখন নতুন একটা বকবাব পাত্র পেয়ে সেই পুরোনো বাইটা প্রচণ্ড বেগে চাড়া দিয়ে উঠলো। তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ঝাঁঝালো চীৎকাবে সকলের প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। শাশুড়ী যখন ঝঙ্কার দিয়ে বলেন,—'বাহাত্তুরে বুড়ো কুটোটি নেড়ে উপকার করতে পারে না, অথচ গাদা গাদা পিণ্ডি গিলতে মজবুত',—তখন পাশের বাড়ির লোকেরা জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে শোনে, মনে করে এ-বাড়িতে অকস্মাৎ বুঝি কোনো দারুণ বিপ্লব বেধে গেছে।

শ্বশুর ছট্টুকে ডেকে বলেন,—দেখ বাপু, তুমি তো কোনো কাজই করতে চাওনা, অথচ আমি বরং দেখি যে তুমি দিনে আধ সের চালের ভাত খাও, আর রাত্রে আধ সের আটার রুটি খাও,—অতগুলো তুমি হজম করো কেমন ক'রে? আমি তো বরং আশ্চর্য হ'য়ে তাই কেবল ভাবি। বুড়ো হ'লে কী হয়, এই দেখ

আমি এখনো কত কাজ করি, রোজ নিজে হেঁটে বাজারে যাই, নিজে হাতে বাজার ক'রে আনি। অথচ কতটুকু খাই বলো দেখি? তাহ'লে তোমার বরং আমার চেয়েও কম খাওয়া উচিত, যখন আমার চেয়েও কম পরিশ্রম করো। একটু হিসেব ক'রে দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে যে অনেক পয়সার খাবারগুলোকে অনর্থক তুমি খেয়ে খেয়ে বরং নষ্টই করছো, কোনো কাজে লাগাচ্ছো না। হিসেব মতন একটা কিছু করো, হয় কুঁড়েমি ছেড়ে দাও, নয়তো খাওয়া ছেড়ে দাও। বেশ তো, কাজ করতে না চাও নেই নেই, খাওয়াটা তাহ'লে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকো, আমি তো বরং এই কথাই তোমাকে বলি। বুঝেছো আমার কথা?

ছট্টু সকলের সব কথাই বুঝতে পারে কিন্তু কোনো উত্তর করে না, চুপ ক'রে কেবল শুনে যায়। আমার কাছে যখন আসে তখন ওর চোখ দুটো ছল্‌ছল্ করে। মুখখানাকে অত্যন্ত করুণ ক'রে মাথাটা কাঁপাতে কাঁপাতে বলে,—আমার বাবু কখনো আমাকে এমন ক'রে বলেনি বহুজী, বাবুর বাপ মাও কখনো কিছু বলতে সাহস করেনি। এতকাল আমিই সকলকে ধমক দিয়ে চালিয়ে এসেছি। বাবুর পকেটে কত টাকা থাকতো, এক পয়সাও কখনো চুরি করিনি,—তা যদি করতুম তাহ'লে এতদিনে আমি বড়া-আদ্‌মি হ'য়ে যেতুম। কেবল দুবেলা দুমুঠি খাই, এই আমার দোষ। আমরা পশ্চিমের লোক, তোমাদের চেয়ে কিছু বেশি খাই। তোমরা আমার মনিব, তোমাদের বাড়ি খাবো না তো আর কোথায় আমি খেতে যাবো? আমার বাবু যে অমন খামখেয়ালি লোক, সেও আমার খাবার সময় কাছে এসে বলতো,—তোর খাওয়া আজকাল এত কমে যাচ্ছে কেন রে? ঠাকুরকে ডেকে হুকুম দিতো,—ঠাকুর, ছট্টুকে আরো চারখানা পরোটা দিয়ে যাও। আমি যদি বলতুম,—না না, আর খেতে পারবো না,—তাহ'লে বাবু জোর ক'রে বলতো, তোকে খেতেই হবে, না খেলে তুই বাঁচবি কেমন ক'রে, তুই মরে গেলে আমায় দেখবে কে? এর জবাবে আর আমি কিছু বলতে পারতুম না, খিদে না থাকলেও জোর ক'রে খেয়ে নিতুম। অমন

মনিব আর হবে না। তুমিও তো কোনো কড়া কথা বলো না বহুজী, তুমিও খুব ভালো। আমরা গরিব আদ্‌মি, মারলে আমাদের গায়ে লাগে না, কিন্তু কড়া কথা বড়ো গায়ে লাগে। কী করবো, আমার নসীব, যখন নিমক খাচ্ছি তখন কড়া কথাও হজম ক'রে নিতে হবে। বাবু কতদিনে ফিরবে বলতে পারো বহুজী ?

কিছুকাল পর্যন্ত ছট্টুকে আমাদের বাড়িতে রেখেছিলুম, তার পরে আর রাখা চলল না। ক্রমশ ওর খাওয়া কমতে লাগলো, শরীর রোগা হ'য়ে যেতে লাগলো। আমি তখন ওকে বললুম,—তুমি দেশে চলে যাও ছট্টু, তোমার যা মাইনে তা আমি সেখানেই মাসে মাসে পাঠিয়ে দেবো, যতদিন তোমার বাবু না ফিরে আসেন।

ছট্টু সতেজে বলে উঠলো,—দেশে গিয়ে বসে থাকবো আর শুধুশুধুই তোমার তলব নেবো ? এ তুমি দয়া করে ভিক্ষা দিতে চাইছ, এ আমি নিতে পারবো না বহুজী, আমাকে মাপ করো। বাবুর কাছে ছুটি নিয়ে যখন দেশে যেতুম তখনও কোনো তলব নিতুম না। বাবু সে কথা জানে, এলে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো। না খেটে তলব নেবো কেমন ক'রে ? সে কোনো দস্তুর নয়।

—তাহ'লে তোমাকে নিয়ে কী করবো ছট্টু ? এখানে আর রাখা চলে না।

—অন্য কোনো জায়গায় একটা চাকরি দেখে দাও। নইলে আমি গরিব মানুষ, দেশে গিয়ে বসে থাকলে আমার চলবে না।

—তোমার দেশে কে কে আছে ?

—আমার বুড়ী স্ত্রী আছে, পুত্রবধু আছে, আর একটি ছোটো নাতি আছে। এক জোয়ান ছেলে ছিল, সে অনেকদিন আগে মরে গেছে।

—নাতির বয়স কত ?

—চার গণ্ডা এখনও পূরা হয় নি।

—তাহ'লেও যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তোমার নাতিকেই এখানে পাঠিয়ে দাও, তুমি দেশে চলে যাও। তাকে আমি কাজ শিখিয়ে মানুষ ক'রে তুলবো, তার মাইনেটা তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

এই ব্যবস্থাই ঠিক হলো, ছট্টু দেশে গিয়ে গ্রামের লোকের সঙ্গে তার নাতিকে পাঠিয়ে দিলে।

ওর নাতির নাম মংরু। খুব চালাকচতুর চট্‌পটে ছেলে। মুখখানা সর্বদাই হাসিহাসি। প্রথমে বাংলা কথা মোটে বুঝতে পারে না, কিছু বললে কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। ছট্টুর মুখে শুনেছি, পশ্চিম থেকে বাংলা দেশে এসে অমর বাবুরও নাকি প্রথমে এই দুর্দশা হয়েছিল, সকলের কথা শুনেই উনি হাসতেন আর ছট্টুকে বলতেন,—ওরা সবাই কী বিড়ির্ বিড়ির্ করে, আমি একটুও বুঝতে পারি না। মংরুকে আমি বাংলা কথা বলতে আর বাংলা অক্ষর পড়তে শেখাতে লাগলুম। খুব চালাক ছেলে, চট্‌পট্ ক'রে অনেক শিখে ফেললে। ইংরেজী কথাও অনেক শিখিয়ে দিলুম। স্মরণশক্তি ওর চমৎকার, একবার যা বলে দিই তা কিছুতেই ভোলে না। আমি জিজ্ঞাসা করি,—ক্যাট্ মানে কী বল দেখি? ও বলে,—বিল্লি। আমি বলি,—ও তো হিন্দি বাৎ হলো, বাংলা বল। ও বলে, —বিলাই। আমি বলি,—দূর, ওটাও তো হিন্দি হলো, বাংলায় কী বলে? ও তখন একটা ঢোক গিলে নিয়ে বলে,—বিলার। আমি বলি,—দূর হতভাগা, বিলার নয়, বিড়াল। ও তখন হাসতে হাসতে বলে,—আচ্ছা এবার ঠিক মনে থাকবে মাজী, বিলার নয়, বিডাল। বলে—ঐ দুটো কথা আমার উল্‌টা-পাল্‌টা হ'যে গেছে,—বিলার নয়, বিডাল। পরের দিন খুব ভোরে আমার কাছে এসে হাজির, আমি তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছি। একটা বেরালছানা ধরে এনে বললে,—বিলার নয়, বিডাল, না মাজী?

ছেলেটি কাজকর্মেও খুব মজবুত। ভারী জলের ঘড়া অক্লেশে তুলে নিয়ে যেতে পারে। কোনো কাজেই পিছপা নয়। আর আমার শাশুড়ীকে খুব জব্দ ক'রে দিয়েছে। বারে বারে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে,—এর পরে কোন কাজটা করতে হবে হুকুম দাও। বলতেই হবে কিছু একটা কাজের কথা, নইলে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে। যখন কোনো কাজ নেই তখন আমার শাশুড়ীকে বলবে, একবার দেখে যাও তো বুড়ী মায়ী। কী দেখবো রে? উঠে এসো না, ঐ সিঁড়িটা

একবার দেখে যাও। কেন, সিঁড়িতে আবার কী হলো? হয়েছে বৈকি, লোক-জনের পায়ে পায়ে এতক্ষণে অনেক ময়লা জমে গেছে, আর একবার জল ঢেলে ধুয়ে দেবো? শাশুড়ী বলেন,—মরণ তোমার, এই তো সকালেই ধুয়ে দিলি। ও হাসতে হাসতে বলে,—মরণ এখন আমার হবে না বুড়ী মায়ী, আমি তোমার চেয়ে অনেক ছোটো আছি। এখন আমি সিঁড়ি ধুতে চললুম, নইলে ময়লা দেখলেই তুমি আবার চিল্লাতে শুরু করবে।

মংরুকে নিয়ে দিনগুলো আমাব একরকম কেটে যাচ্ছিল মন্দ নয়। ছেলেটি বড়ো মিশুক, যখন তখন আমার কাছে এসে বসে, স্নেহ আদায় করতে জানে। নিতান্তই বাচ্চা, তার খাওযাপরাগুলোর দিকে একটু নজর রাখতে হয়, তার সঙ্গে অনেক বক্‌বক্ করতে হয়, অনেক জিনিস তাকে শেখাতে হয়। পাথুরেঘাটায় গেলেও আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাই, পাছে একলা থাকলে এ-বাড়িতে কিছু গণ্ডগোল ক'বে বসে, ওকে একলা ফেলে যেতে আমার ভরসা হয় না।

অমর বাবুর কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার কথাটা এ পর্যন্ত আমার বলা হয়নি। উনি চলে যাবার প্রায় মাসখানেক পবে চিঠি পেলুম, লিখেছেন রাওল-পিণ্ডি থেকে। চিঠির তারিখটা প্রায় পনেবো দিন আগেকার, রাওলপিণ্ডি থেকে চিঠি আসতে এত দেরী হবার কথা নয়। দেখলুম কয়েক জায়গায সেন্‌শর হ'যে এসেছে, সেইজন্যে এত দেরী। চিঠির জন্যে যখন অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছি আর মনে মনে কত অসম্ভব রকমের আশঙ্কা করছি, তখন এলো চিঠি। উনি লিখেছেন—

সুচরিতাসু,

এখানে এসে খুব কষ্টে আছি। একটুও ভালো লাগছে না। বুঝতে পারছি যে ভুল করেছি. কিন্তু এখন আর শোধরাবার কোনো উপায় নেই। তা হোক, আপনারা এবার সুখে থাকুন। আসবার সময় আপনি নিজের থেকেই বলেছিলেন চিঠি লিখতে, তাই লিখছি। নইলে কিছু লিখতাম না। কিন্তু যখন লিখছি তখন সত্য কথাই লিখি, আপনার কথা আমার সর্বদাই মনে হয়।

আপনার শাস্তি নয়, এ আমারই উপযুক্ত শাস্তি। আরো অনেক কথা আমার বলবার ছিল কিন্তু এখন বলতে চাই না। আগে আপনার জবাব আসুক তখন লিখবো। এখন কেমন আছেন এইটুকু শুধু জানতে চাই। আপনার শরীর এখনো সুস্থ হয় নি, শরীরের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। স্নেহাশীর্বাদ জানাই—

অমরনাথ চৌধুরী

আমি এই চিঠির জবাবে তৎক্ষণাৎ লিখে দিলুম—

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি আসতে এত দেরী হলো কেন? আমি কত কী ভাবছিলুম। এবার থেকে যাতে একটুও দেরী না হয় সেই ব্যবস্থা করবেন। দেরী হ'লে কিছুতেই চলবে না। আমি শারীরিক বেশ সুস্থ আছি, আমার জন্যে ভাবনা করবার কিছুই নেই। কিন্তু আপনাব চিঠি পড়ে আমার একটুও ভালো লাগছে না। কী কী কষ্ট আর অসুবিধা হচ্ছে সমস্তই খুলে লিখবেন। যে কথা আপনার বলবার আছে অবশ্যই বলবেন। আর এক কথা, এর পর থেকে আপনি আর আমাকে 'আপনি' ব'লে চিঠি লিখবেন না, 'তুমি' ব'লে লিখবেন। এখনও আমাকে 'আপনি' বলছেন সেটা বড়ো দুঃখের কথা। নিজেই ভেবে দেখুন, যাব কথা সর্বদাই মনে হয়, যাকে শাস্তি দিতে গিয়ে নিজেও শাস্তি পান, সে কী আপনার পর? এখনও কী সে কথা বলতে হবে? আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আপনার স্নেহের অনুপযুক্ত জীবনে আমি কখনও না হই।

আপনার স্নেহের মীরা

এই চিঠি লেখবার পরে আবার এক মাস কেটে গেল, এর আর কোনো উত্তর এলো না। আমার চিঠি পেলে আরো অনেক কথা লিখবেন বলেছিলেন, সেই কথাগুলো জানবার জন্যে আগ্রহে আমি অতিমাত্রায় উৎসুক হ'য়ে রয়েছি, অথচ মোটে চিঠি আসছে না কেন? উনি কী আমার চিঠিটা পাননি? কিংবা

হয়তো ওঁর উত্তর ঠিক সময়েই এসেছে, কারো হাতে হয়তো পড়েছে, সে পেয়েও আমাকে দেয়নি, কিংবা হয়তো কোথাও ফেলে দিয়েছে। কার এমন কাজ হ'তে পারে? হয় মংরু, না হয় ঠাকুরপো,—এদের ছাড়া আর কারো হাতে পিয়ন চিঠি দিয়ে যায় না।

সেদিন প্রথমে ধরলুম মংরুকে,—হাঁরে মংরু, পিয়ন যে তোকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে, সেটা কোথায় রাখলি বলতো? তোর দেশ থেকে ঠাকুরদাদার যে চিঠি আসে সে চিঠি নয়, খামের ওপর ইংরেজীতে ঠিকানা লেখা একখানা আমার নামের চিঠি।

মংরু হেসে বললে,—তুমি তো রোজই আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করো, আজ কোনো চিঠি এসেছে? আমি বলি, না। তবে আজ আবার এমন কথা বলছো কেন মাজী? তোমার কোনো চিঠি এলে সেটা আর কাউকে দেখাবো না, তখনই তোমার হাতে এনে দেবো, এ কী আমার মনে নেই ভাবছো? আমার ঠিক খেয়াল আছে, পিয়নকে দেখলেই আমি রাস্তায় গিয়ে তাকে ধরি, চিঠি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করি। যখন কোনো চিঠি আসবে তখন তুমি যেখানেই থাকো, তোমার হাতে ঠিক পৌঁছে দেবো। কিন্তু না এলে কী করবো বলো?

মংরু কিছু জানে না। তাহ'লে নিশ্চয় জানে ঠাকুরপো। ইচ্ছে ক'রেই সে চিঠিখানা চেপে রেখে দিয়েছে, আমাকে জব্দ করবার জন্যে। ঠাকুরপোকে তখন ধরলুম, এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার একটা ঝগড়াই বেধে গেল।

আমি বললুম,—দাও, আমার চিঠিখানা কোথায় রেখেছ শিগ্‌গির দাও।

—কিসের চিঠি?

—আহা, যেন কিছুই জানো না। আমার নামে যেখানা এসেছিল, তুমি লুকিয়ে রেখে দিয়েছ।

—অভিযোগটা শুনে দুঃখিত হলুম। কিন্তু আমি তোমার চিঠি শুধু শুধু লুকিয়ে রাখতে যাবো কেন? আমি কী তোমাদের মতো মেয়েছেলে?

—তবে কোথায় গেল আমার চিঠি?

—যাবে আবার কোথায়, মোটে আসেই নি। কেউ লিখলে তবে তো আসবে ?

—লেখেন নি, এটা হ'তেই পারে না। তুমি ভীষণ মিথ্যেবাদী, না জেনেশুনে যাহোক একটা বাজে কথা বলে আমাকে কেবল ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা।

—বৃথা আমার ওপর রাগ করছো বৌদি, রাগটা সেই যথাস্থানে প্রয়োগ করলে ভালো হয়।

ঝগড়াটা যখন ধাপে ধাপে চরমে গিয়ে উঠছে এমন সময় সেখানে এসে হাজির হলো আমার দাদা, শঙ্কর। সে বললে,—কিসের এত উত্তেজনা ?

শুনলে সে সব কথা। ঠাকুরপোকে বললে,—এতে তুমি এত চটছো কেন ভাই, অনেক দিন চিঠি না পেলে মানুষ তো একটু ব্যস্ত হ'তেই পারে, তুমি বিদেশে গেলেও যদি চিঠি আসতে দেরী হয় তাহ'লেও আমরা এমনি ব্যস্ত হবো। আমাকে বললে,—তুই একটু স্থির হ'য়ে থাক, আমি এর ব্যবস্থা করছি। মিলিটারির ব্যাপার যেখানে, সেখানকার চিঠি আসাযাওয়াতে অনেক দেরী হ'যে যায়, সেন্‌শরে পাশ হ'যে আসে কি না। তার কোনো দরকার নেই, রাওলপিণ্ডিতে আমার কলেজের সময়কার একজন বন্ধু থাকে, তার নাম পিয়ারীলাল। দে তোর চিঠি, আমি আজই তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে খোঁজখবর নিয়ে অমর বাবুর সঙ্গে আলাপ করবে, তাঁর হাতের লেখা জবাব নিয়ে নিজে এখানে পাঠিয়ে দেবে। দাঁড়া, এক সপ্তাহের মধ্যেই তোকে জবাব আনিয়ে দিচ্ছি।

আমার দাদার সাংসারিক বুদ্ধিটা তেমন নেই বটে, কিন্তু এ সব কাজে খুব তৈরী। পিয়ারীলালের কাছ থেকে দশ দিনের মধ্যেই চিঠির জবাব এসে গেল। উনি লিখেছেন—

তোমার চিঠির জবাব অনেক দিন আগেই পাঠিয়েছি, তুমি পেলে না কেন তা জানি না। এই দেখ, তোমাকে 'তুমি' সম্বোধন ক'রে লিখছি, এতেই বুঝতে পারবে যে তোমার সেই চিঠি আমি পেয়েছি। শঙ্কর তার বন্ধুর মারফত আমাকে জানিয়েছে যে তুমি চিঠির জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছ, লুকিয়ে

রেখেছে ভেবে তোমার স্থরেন ঠাকুরপোর সঙ্গে নাকি এই নিয়ে অনেক ঝগড়া করেছ। বুঝতে পারছি যে আমার চিঠি না পেয়ে তোমার খুব ভাবনা হয়েছে। আমার জন্যে যে কারো ভাবনা হয় এই দেখতেই আমি একদিন চেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আর চাইনা। তোমার প্রতি অনেক অন্যায় ক'রে এসেছি। জানি তার জন্যে তুমি আমায় ক্ষমা করবে। এখন আর আমার কোনো ক্ষোভ নেই, তোমার আর শঙ্করের চিঠিতে অনেক কথা বুঝতে পেরেছি। শঙ্কর ছেলেটি খুব ভালো, আমার প্রতি তার যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। তুমি আমার জন্যে ভেবো না, তোমার চিঠি মাঝে মাঝে পেলেই আমি আনন্দে থাকবো। চলে আসবার সময় তোমার শুক্‌নো মুখখানা দেখে এসেছি, এখনও অনবরত সেই মুখখানাই দেখতে পাই, তাই কেমন মায়া হয়। এখনও তোমার শরীর সারেনি। ঐ মুখে একটু হাসি ফুটুক আর ঐ গায়ে একটু মাংস লাগুক, এই দুটি জিনিস আমি ফিরে গিয়ে দেখতে চাই। তা হবে কি ? দেখ, তুমি কি ভাবো যে মানুষ কেবল দূরে গেলেই বিচ্ছেদ হয়, আর কাছে থাকলে হয় না ? তোমার কি মনে হয় তা জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় যে কাছে থেকে আমাদের যে বিচ্ছেদটা বরাবরই ছিল, কিছুতেই যেটা দূর করা যাচ্ছিল না, এই দূরে চলে আসাতে সেটা যেন একেবারেই দূর হ'য়ে গেছে। আমাদের মধ্যে এখন যেন আর কিছুই বিচ্ছেদ নেই। এই মিলন আর বিচ্ছেদ নিতান্তই মনের জিনিস, বাইরের কিছু নয়। হাজার মাইল দূরের মানুষটিকে আমি এক ফুট কাছে দেখতে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে না যে কখনো বিচ্ছেদ ঘটেছিল।

চিঠিখানা পেয়ে আনন্দে আমি দিশেহারা হ'য়ে উঠলুম। তাঁর হাতের লেখা চিঠি পেয়েছি সেজন্যে তো বটেই, কিন্তু আমিও যে কথা মনে মনে বলি, উনিও ঠিক সেই কথাটি কেমন ক'রে বললেন ? হাজার মাইল দূরকে মনে হয় এক ফুট কাছে, বিচ্ছেদকে মনে হয় মিলন, কষ্টকে মনে হয় সুখ, নিজের জন্যে কোনোই দুঃখ নেই কেবল ওঁর জন্যেই যত দুঃখ, ওঁর জন্যেই যত মায়া,—এ সব তো আমারই মনের কথা ! এ কী চমৎকার মনের মিল !

ওঁর সেই চিঠিখানার জবাবে আমি লিখলুম—

গায়ে আমার যথেষ্টই মাংস আছে, আরো মাংস লাগলে একেবারে টিপসি হ'য়ে যাবো, সে কী খুব ভালো দেখাবে? তবে আপনি ফিরে এলে যে শুক্‌নো মুখে হাসি দেখবেন, এ আমি গ্যারাণ্টি দিয়ে বলে দিচ্ছি। এখনই ফিরে আসুন না, এখনই দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনার সেই বুড়ো ছট্টু চাকরটি আমাদের বাড়িতে কিছুদিন ছিল, সে কেবল জিজ্ঞাসা করতো, বাবু কবে ফিরবেন বহুজী? আমি তার কোনো জবাব দিতে পারিনি, আপনাকেই তাই জিজ্ঞাসা করছি। কবে ফিরবেন বলুন। এখন তো আপনি বুঝে নিলেন যে কোন জিনিসটা আমার কাছে একমাত্র সত্যি? আর আপনি আমাকে 'তুমি' বলে চিঠি লিখলেন, তাতে যে আমি কত খুশি! কিন্তু আপনি কবে যে আমাকে সামান্য একটু ব্যথা দিয়েছিলেন তাই নিয়ে দুঃখ করেছেন কেন? তার জন্যে আবার ক্ষমাই বা কিসের? ঐ তো আমি চেয়েছিলুম। আমি কেবল কাব্য চাইনি, চেয়েছিলুম সত্যিকার জিনিস। এমন একজন প্রিয়ব্যক্তি, যাঁকে আমি ভালবাসবো এবং ভক্তি করবো এবং ভয় করবো, সমস্তই একসঙ্গে। যিনি আমাকে স্বচ্ছন্দে স্নেহ ক'রে আদর দেবেন, আবার রাগ ক'রে ধমকও দেবেন। আমি তাঁর অনুগতের মতোই থাকবো, তিনি কিছু অন্যায় করলেও তাতে আমার আত্মমর্যাদায় লাগবে না, আমার দিক থেকে তাই নিয়ে বিচার ক'রে দেখবার সেখানে কোনো প্রশ্নই মোটে উঠবে না। এমনই একজনকে চেয়েছিলুম যিনি আমাকে বাইরের সৌজন্য দিয়ে কিছুমাত্র তফাৎ ক'রে রাখবেন না,—চাষা যেমন তার স্ত্রীকে বেমালুম নির্ভাবনায় নিজের জীবনের মধ্যে সর্বতোভাবে নিয়ে নেয়, ঠিক তেমনি। আর ওখানে গিয়ে আপনার শরীরটা কেমন আছে সে বিষয়ে কিছু লেখেন নি কেন? ঠিক সময়ে খাওয়াদাওয়াগুলো করেন তো? ওখানে ছট্টু নেই যে এই সব কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে, নিজের থেকে হুঁশ ক'রে শরীররক্ষার জন্যে যা যা করা দরকার তাই করবেন। আরও একটা কথা। ওখান থেকে কলকাতায় টেলিফোনে কথা বলা যায় না কী? যদি খুব বেশি তাতে

খরচ হয় তবে থাক, দরকার নেই। একটু সন্ধান নিয়ে দেখবেন। দেশে চিঠিপত্র দিচ্ছেন তো? খোকা আর খুকী কেমন আছে?

এর পর সময়মতো যখন ওঁর চিঠিপত্র আসতে লাগলো তখন আর আমার মনে কোনো উদ্বেগ রইল না। সংসারের কাজকর্ম আছে, একদিন চিঠি এলে কয়েক বার সেটা পড়তে আর তার জবাব লিখতেই অনেক সময় লেগে যায়, এর পরেও যেটুকু উদ্বৃত্ত সময় থাকে সেটুকু মংরুকে নিয়ে আমার স্বচ্ছন্দে কেটে যায়।

আষাঢ় মাসে হলো আমার দাদার বিয়ে। দিনকতক তাতেই খুব মেতে রইলুম। বৌটির নাম বেলা, কচি ফুটফুটে মুখখানি, গাল দুটো বেলফুলের মতোই ফুলো ফুলো। দাদা নিজে দেখেশুনে বিয়ে ক'রে এনেছে, খুব গরিবের ঘরের মেয়ে। নিজেদেব টাকায় তার সমস্ত গয়না গড়িয়ে দিয়েছে, তাদের কিছুই দিতে থুতে হয়নি। বৌকে নিয়ে দাদা তো একেবারে উন্মাদ। আমি লুকিয়ে আড়ি পাতি, দেখি দাদার সব অদ্ভুত কাণ্ড। দাদা যে বৌকে এমনভাবে সোহাগ করতে পারবে এ আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। ও কোথায় শিখলে এত? আমি ভাবতুম যে দাদা এ সব বিষয়ে নিতান্তই বোকা, দেখলুম তা মোটেই নয়। কেমনভাবে মেয়েদের মন ভোলাতে হয়, কেমনভাবে ভালোবাসা আদায় করতে হয়, সমস্তই দাদা বিলক্ষণ জানে। বৌটি কিন্তু খুব নম্র, কথায়বার্তায় একটুও দেমাক নেই। অল্প দিনেই আমার খুব বাধ্য হ'য়ে উঠেছে, আমাকে দিদিভাই ব'লে ডাকে, মাঝে মাঝে আমার শ্বশুর বাড়িতেও আসে। সঙ্গে সঙ্গে আমার দাদাটিও অমনি এসে হাজির হয়। পাছে ঠাকুরপো বেলাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে, পাছে ওর সঙ্গে বেশি ভাব হ'যে যায়, এই ভয়টুকু ষোলো আনা। আমি যত বলি,—ভয় নেই দাদা, আমি তোমার বৌকে আগ্‌লে রাখবো,—কিন্তু সে কথা কে শোনে। দাদা বলে,—কোনো বিশ্বাস নেই তোর ঐ ঠাকুরপোটিকে,

সকলেই তো আর সেই অমরনাথ বাবু নয়। আমি মনে মনে হাসি দাদার এই অতি সতর্কতার ভাবখানা দেখে।

একদিন আমার শাশুড়ী আমাকে ডেকে চুপি চুপি বললেন,—তোমার দাদার বৌটি খাসা হয়েছে বৌমা। এবার আমার স্থরেনের জন্যে অমনি একটি বৌ এনে দাও, তোমার ওপরে ভার দিলুম। আমি মাথামুড় খুঁড়ে মরলেও ও ছেলে আমার কথা শুনবে না, বলতে গেলেই চোখ পাকিয়ে তেড়ে আসবে। কিন্তু তুমি হয়তো ভুলিয়ে ভালিয়ে ওকে রাজি করাতে পারো। ঘরে একটাও ছেলেপুলে নেই, আমাদের তো নাতিনাতনীর মুখ দেখতে ইচ্ছে হয়, কখন আছি কখন নেই তার ঠিক কী?

আমার এই এক চিরকেলে স্বভাব, কেউ যদি মিনতি ক'রে আমার সাহায্য চায়, আমি যথাসাধ্য তার জন্যে চেষ্টা করি। আমি বললুম,—আচ্ছা আমি দেখছি চেষ্টা ক'রে, আপনি কিছু ভাববেন না।

আমার বড়দিদির ছোটো ননদ কাবেরী, তাকে আমি দেখেছি, দাদার বৌভাতে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিল। মেয়েটির বয়স হয়েছে, তার মা বিয়ে দেবার জন্যে খুব ব্যস্ত। সে মেয়ে অনেক লেখাপড়া জানে, দেখতেও বেশ স্মার্ট। আজকালকার পুরুষদের চোখধাঁধানো খানিকটা রূপ আছে, তার ওপরে খানিকটা ঢংঢাং আছে। কানে ঝোলানো দুল দুটোকে দুলিয়ে দুলিয়ে আর তার সঙ্গে বাংলা ভাষাকে চিবিয়ে চিবিয়ে অবাঙালীর মতো উচ্চারণ দিয়ে বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, স্থতরাং ঠাকুরপোর এই মেয়েটিকে মনে ধরবে বলে আশা হয়।

বড়দিদিকে ব'লে একদিন সেই মেয়েটিকে আমাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে আনালুম। বিকেলে তাকে বললুম,—ঠাকুরপোর সঙ্গে একটু সিনেমা দেখে এসো, ফিরে এসে এখানে খাওয়াদাওয়া ক'রে তারপরে বাড়ি যাবে।

—আপনিও চলুন না কেন?

—সিনেমা দেখতে আমার আর ইচ্ছে হয় না।

—সে কী বলছেন, সিনেমা দেখতে আবার কার না ইচ্ছে হয়? সিনেমার চেয়ে মার্ভেলাস্ জিনিস আজকাল আর কী আছে? 'বিদ্যুৎলেখায়' এমন একটা ভীষণ চমৎকার বই এসেছে,—সিনেমা দেখা আর লিটারেচর পড়া, এর চেয়ে প্লীজিং আর কী থাকতে পারে বলুন তো?

—আগে আমিও তাই ভাবতুম বটে, কিন্তু এখন দেখছি ওগুলো মিথ্যে, খানিকটা হুজুগ নিয়ে মেতে থাকা বৈ কিছুই নয়। ওতে আমার আর তেমন তৃপ্তি হয় না।

কাবেরী অবাক হ'যে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

ঠাকুরপোকে বললুম,—এই মেয়েটির নাম কাবেরী, আমার বড়দিদির ননদ। ওর সিনেমা দেখবার ভারী শখ। 'বিদ্যুৎলেখায়' কী একটা চমৎকার বই হচ্ছে বলছে, ওকে দেখিয়ে নিয়ে এসো।

ঠাকুরপো বললে,—বেশ যাচ্ছি, কিন্তু তুমিও যাবে তো?

আমি বললুম,—আমার মাথা ধরেছে, কোথাও যেতে ভালো লাগছে না।

ঠাকুরপো বললে,—বুঝেছি।

পরের দিন ঠাকুরপোকে জিজ্ঞাসা করলুম,—মেয়েটিকে তোমার কেমন লাগলো?

ঠাকুরপো বললে,—নামটি যখন শুনলুম কাবেরী তখন তো ভালো লাগবারই কথা।

—শুধু তাই নয়, ও খুব স্মার্ট। লেখাপড়াও বেশ জানে, পিয়ানো বাজাতে জানে, আর দেখতেই বা মন্দ কী বলো? ঐ রকম যদি একটি সঙ্গী পাই তাহ'লে আমাকে একা একা আর এই তরকারি কোটার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। তুমি ওকে বিয়ে ক'রে ফেলো ঠাকুরপো, আমি তার ব্যবস্থা করি। ওকে নিয়ে তুমি সুখী হবে।

—চেপে যাওনা এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথাই তো হ'যে গেছে, আবার কেন? বিয়ে-টিয়ে করা আমার দ্বারা পোষাবে না। আমি তো

বলেই দিয়েছি যে তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার ঠিক হ'য়ে আছে, বিয়ে আর কখনো করবো না।

—কেন, আমাকে দেখেই একেবারে এমন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ক'রে বসলে কেন? তোমার দাদাই আমাকে বিয়ে করেছেন জানতুম, সেই সঙ্গে তুমিও আমাকে মনে মনে বিয়ে ক'রে ফেলেছিলে নাকি?

—দাদা তোমার সবটাকে তো বিয়ে করতে পারেনি, খানিকটা অংশ বাকি ছিল বৈকি। কিন্তু এখন আর সেটুকুরও কোনো আশা নেই, শেয়ালে মুড়িয়ে দিয়ে গেছে।

—তবে যেখানে শেয়ালের চোখ পড়েনি সেখানে বিয়ে করবে না কেন?

—নাঃ, তা আর হয় না। বিয়ে আমি করবোই না ঠিক করেছি।

—আচ্ছা মনে করো, আমাদের সমাজে যদি ডাইভোর্স থাকতো, আর তোমার দাদা যদি আমাকে ডাইভোর্স করতেন, তখন যদি আমি বলতুম তাহ'লে আমাকে তুমি বিয়ে করতে কিনা?

—তা হয়তো করতুম। আর কিছুর জন্যে নয়, কেবল তোমাকে বেঁধে রাখবার জন্যে ওটা করতে হতো, আর আমার বাড়িতে তখন ঐ অমর বাবুটিকে ঢুকতেই দিতুম না। ঢুকতে এলে গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিতুম।

আমি খিল্‌খিল্ ক'রে হেসে উঠলুম। হাসতে হাসতে বললুম,—এটা তাহ'লে নিতান্ত ভালোবাসার জন্যেই আমাকে বেঁধে রাখতে চাইতে না, পাছে কেউ নজর দেয় সেইজন্যে বেঁধে রাখতে চাইতে। অমর বাবুর ওপরে তোমার এতটাই হিংসে। তা এখন তো আর তিনি এ মুল্লুকেই নেই, এখনো কি তার দরকার হবে? দেখছো তো, আমাকে বাঁধন দিয়েও কিছুতেই বাঁধা যায় না, তার বদলে আর একজনকে এনে আমায় জব্দ ক'রে দাও না কেন?

ঠাকুরপো কথা না ব'লে রাগে গর্‌গর্ করতে করতে চলে গেল।

এর পরেই এলো সেই শ্রাবণ মাস। রবীন্দ্রনাথের একখানা চিঠি পেয়েছিলুম প্রায় দুমাস আগে,—চিঠিখানা তাঁর নিজের হাতের লেখা নয়, কাকে দিয়ে লিখিয়ে নিচে কাঁপা কাঁপা অক্ষরে নিজের নামটা সই ক'রে দিয়েছিলেন। রোগের যন্ত্রনায় খুব কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু তবুও আমার সেই অপারেশনের কথাটি তখনো মনে আছে। চিঠিতে এই রকম লেখা ছিল,—রাজকন্যে, চোখে ভালো দেখতে পাইনা, কলম ধরতেও আর পারিনা। এবারকার বর্ষামঙ্গলটা নিতান্তই মাঠে মারা গেল। বড়ো কষ্টে আছি। তোমার শরীরটা এতদিনে সম্পূর্ণ সেরে উঠেচে কিনা জানতে চাই।

আমি উদ্বিগ্ন হ'য়ে জবাব দিলুম, কিন্তু তারপর আর কোনো খবর পেলুম না। মাঝে মাঝে কাগজে পড়তুম তিনি খুব অসুস্থ। শ্রাবণ মাসে শুনলুম তাঁকে কলকাতায় আনা হচ্ছে, অস্ত্রচিকিৎসা করা হবে। এখানে আসার দুচার দিনের মধ্যেই শুনলুম, অবস্থা খুব খারাপ। ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলুম। সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতালার ঘরটিতে, যে ঘরে ছেলেবেলায় আমি বাবার সঙ্গে কতবার গেছি, ওঁর নিজের মুখে কত গান শুনেছি,—সেই ঘরে একটা কৌচের ওপর তিনি শুয়ে আছেন, চোখ দুটি নিমীলিত। কেবল শ্বাসপ্রশ্বাসের স্পন্দন ছাড়া শরীরে আর কোনো স্পন্দন নেই। সর্বাঙ্গ চাদরে ঢাকা, কেবল সেই ফুলো ফুলো পা দুটি দেখা যাচ্ছে। অক্সিজেন গ্যাস দেওয়া হচ্ছে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের দুটি মেয়ে ওঁকে শোনাবার জন্যে ওঁরই গান মৃদুস্বরে গাইছে, গাইতে গাইতে চোখ দিয়ে তাদের জলধারা বইছে। দিগ্বিজয়ী বিরাট পুরুষ সেই রবীন্দ্রনাথও আজ এমন অসহায়! যে ধরিত্রীকে উনি এতই ভালোবাসতেন তার সঙ্গে আর কোনই সম্পর্ক নেই, সেই ধরিত্রীর দিকে একবারও চোখ মেলে চেয়ে দেখছেন না। এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারলুম না, কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে পালিয়ে এলুম। কেমন যেন তখন থেকেই মনে হতে লাগলো, পৃথিবীর অমঙ্গল এবার আসন্ন, আমারও অমঙ্গল যেন আসন্ন। ঘোর দুর্দিন একটা আসছে।

দিকে দিকে তাঁর মৃত্যুর অশুভ বার্তা ছড়িয়ে গেল। খবর পেয়েই অমর বাবু আমাকে লিখলেন.—আমি বুঝতে পারি এই মহাআত্মীয়-নিপাতের কত দুঃখই তুমি পাচ্ছো। কিন্তু দুঃখ কোরোনা, তিনি যে আরো কিছুদিন বিলম্ব না ক'রে এই সময়টিতে চলে গেছেন, সে খুব ভালোই হয়েছে। জাপান এখন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, সেই যুদ্ধের বিভীষিকাময় অপঘাত আর অপচিকীর্ষা থেকে অর্ধমৃত ভারতবর্ষও এবার বাদ যাবে না। তিনি বেঁচে থাকলে এ খবরটা শুনে হয়তো সহ্য করতে পারতেন না। দেশে শান্তি থাকতে থাকতে যে তিনি চলে যেতে পারলেন এতেই তুমি আশ্বস্ত হও।

বেশিদিন আমার নিশ্চিন্তভাবে কাটলো না। কিছুদিন পর থেকেই আমার স্বামীর শরীরটা খারাপ হ'তে লাগলো। কেমন যেন নিস্তেজ, খেতে রুচি নেই, অনবরত শুয়ে থাকতে চান, দেখতে দেখতে শুকিয়ে যাচ্ছেন, সর্বদাই মনে হয় গা গরম। আমি বললুম,—এ ভালো কথা নয়, তুমি একজন ডাক্তার দেখাও। কথাটা তিনি গ্রাহ্যই করেন না। তখন আমার দাদাকে বললুম, সে কলেজ থেকে একজন বড়ো প্রফেসরকে ডেকে নিয়ে এলো। তিনি দেখেশুনে বললেন,—বিশেষ কিছু বোঝা যাচ্ছে না, তবে রীতিমত ওষুধ খাওয়া হোক, টেম্পারেচার নেওয়া হোক, একমাস পরে আবার দেখে তখন বলবো।

এ রকম ধরণের অনির্দিষ্ট রোগ অত্যন্ত খারাপ। আমি প্রাণপণ যত্নে আমার স্বামীর সেবা করতে লাগলুম, পীড়াপীড়ি ক'রে একটু খোরাক বাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই উনি খেতে পারেন না, আমি তাতে রাগ করলে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, কোনো কথা বলেন না। আমি ভাবি, এ কেমন হলো, ওঁর সেই দুর্দান্ত স্বভাব আর তিরিক্ষি বচন কোথায় গেল?

মাসখানেক পরে একস্‌রে ক'রে দেখা হলো, তাতেও কিছু পাওয়া গেল না। কিন্তু শরীরের অবনতি হ'তেই থাকলো। ডাক্তার বললেন, ও কিছু না, আরো কিছুদিন ওষুধ খাওয়ালে আর বিশ্রাম দিলেই সেরে যাবে। ডাক্তারদের এ

ধরণের এড়ানো কথাগুলোও খুব ভালো নয়। তখন আমি আমার স্বামীকে বললুম,—দিন কতক রাওলপিণ্ডিতে বেড়িয়ে আসবে চলো, সেখানে অমর বাবুও আছেন, আর জায়গাটাও নিশ্চয় মন্দ নয়। আমার স্বামী তাতেই সায় দিয়ে বললেন,—চলো।

অমর বাবুকে আমি ইতিমধ্যেই লিখেছিলুম এ সব কথা। এবার লিখলুম যে আমার স্বামীকে নিয়ে ভাবনায় অস্থির হয়েছি, কেউ কিছু কিনারা কবতে পারছে না। হয় তিনি ছুটি নিয়ে পত্রপাঠ এখানে এসে এর একটা ব্যবস্থা করুন, আর না হয আমরাই রাওলপিণ্ডিতে যাচ্ছি, তিনি একটা বাড়ির ব্যবস্থা ক'রে অবিলম্বে খবর দিন। তাঁর কাছে আমাব স্বামীকে নিয়ে গিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।

অমর বাবু লিখলেন,—এ জায়গাটা অত্যন্ত গরম, তোমরা যেমন ভাবছো তা মোটেই নয। কিছুদিন পরে অবশ্য এখানে ঠাণ্ডা পড়বে, কিন্তু এটা শরীর সারাতে আসবাব মতো জায়গা নয। আর আমারও এখন ছুটি নিয়ে যাবাব উপায় নেই। যুদ্ধ বেধে গেছে, আমার অন্যত্র যাবার জরুরী হুকুম এসে গেছে. দু'এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে রওনা হ'তে হবে। কোথায় যেতে হবে ঠিক জানি না, জানলেও বলা নিষিদ্ধ। সুতরাং আমার দ্বারা এখন কোনো সাহায্যই সম্ভব নয। স্বামীর অসুখ নিয়ে যে দুর্ভাবনায় পড়েছো সেটা তোমাকে একাই বহন করতে হবে। কিন্তু কোনো ভয নেই। আমি জানি, এ দুর্ভাবনায় তোমাব কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না, তোমার মুখের হাসি তেমনি অম্লান হ'যে থাকবে। জীবনে নিশ্চিন্ত থাকতে পারাই যে সব চেযে ভালো রকমেব থাকা, তা নয়। কুকুর-বেড়ালবা খুব নিশ্চিন্ত থাকে, কিন্তু তাদের মতো থাকাই কি খুব কাম্য? আমাদের মন যে কতখানি বড়ো, এ কথা প্রমাণ করবার জন্যেই আমাদেব বিপদ আপদের সাক্ষাৎ পাওয়া মাঝে মাঝে দবকাব। বিপদ আসে আসুক, কিন্তু তাকে কাটিয়ে ওঠবাব শক্তি তোমার যেন থাকে। নিজের মনকে আমি যে ভাবে শিক্ষা দিচ্ছি, তোমাকেও ঠিক সেই ভাবে লিখছি। অনেকদিন পরে

তোমাদের দেখতে পাবার আশু সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হ'য়ে আমাকে আরো দূরে চলে যেতে হচ্ছে, এ আমাব পক্ষে কম দুঃখের কথা নয়। কিন্তু সহ্য করতেই হবে। তোমাদের একটা ফোটো যদি নিয়ে আসতুম তাহ'লেও কতকটা ববদাস্ত হোতো। কিন্তু আনিনি, এখন আব আনিয়ে নেবার সময় নেই। দুঃসময়ের জন্যে স্মৃতিটুকু ছাড়া আমার আর সম্বল কিছুই নেই। তবু এতদিন চিঠি পাচ্ছিলুম, কিন্তু এব পর থেকে বোধ হয সেটুকুর সম্ভাবনাও আর রইল না।

অমরনাথের কথা

কলকাতা ছেড়ে গিয়ে পড়লাম একেবারে স্বতন্ত্র রকমের রাজত্বে, তৎক্ষণাৎ শুরু হ'য়ে গেল এক স্বতন্ত্র রকমের জীবন। সে রকম অদ্ভুত জীবনযাপন করতে আমি কোনো কালে অভ্যস্ত ছিলাম না।

চিরকালই কাটিয়েছি নিকট-আত্মীয়দের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, তাতেই মনে মনে ভাবতাম যে গৃহহীনের মতো বিদেশে বাস করছি,—কিন্তু প্রকৃত বিদেশে থাকা যে কাকে বলে তা এবার হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম। এখানে কোনো পরিচিত মুখ নেই, কোনো মুখে দয়া মায়ার চিহ্নমাত্র নেই, কেউ ভুলেও হাসে না, কেউ বাজে কথা বলে না, সকলেই কেবল নিজের নিজের ডিউটি করে। মানুষ বলতে এতদিন যা বুঝে এসেছিলাম তা যেন আমার ভুল ধারণা, এখানে এসে দেখলাম যে মানুষ বলতে বোঝায় কতকগুলো বিভিন্ন রকমের ডিউটি করার কল, সেই ডিউটিগুলো দিয়েই তাদের পরিচয়, তা ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই। আমাকেও একটা নির্দিষ্ট ডিউটি দেওয়া হোলো, তার দ্বারাই আমার সেখানকার পরিচয় শুরু।

যেখানে গিয়ে পড়েছি সে একটা মিলিটারি শিক্ষাকেন্দ্র। সেখানে নতুন সৈনিকদের শিক্ষা দেওয়া হয়,—যুদ্ধকালে কেমন ভাবে আচরণ করতে হবে, অধ্যক্ষের আদেশ কেমন ভাবে ত্বরিতগতিতে পালন করতে হবে, কেমন ভাবে কষ্টসহিষ্ণু হ'তে হবে। ডাক্তারদের পক্ষেও কেবল ডাক্তারি বিদ্যাটি প্রয়োগ করাই এখানে যথেষ্ট নয়, তাদেরও এই সকল শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এখানে সত্যিকার ডাক্তারি কাজ খুবই কম, কিন্তু অনর্থক কাজ অজস্র, সেইগুলো করতে করতে সারাদিনে কোনো অবসর পাওয়া যায় না। অনর্থক কাজ করার দৈনন্দিন অভ্যাসের দ্বারাই সত্যিকার কাজ করার যোগ্যতা অর্জন ক'রে নিতে হয়।

সকলকেই অহেতুক প্রত্যহ কুড়ি ত্রিশ মাইল প্যারেড করতে হয়, সৈনিক কিংবা তাদের অফিসার কিংবা তাদের ডাক্তার সকলকেই। যুদ্ধ বিভাগের একমাত্র মূলমন্ত্র হচ্ছে গতি, সুতরাং কোনো প্রয়োজন থাক কিংবা নাই থাক, সর্বদাই সকলকে গতিশীল অবস্থায় থাকতে হবে। যখন কোনো কাজ নেই তখন মিথ্যা কাজ দিয়েও সকলকে নিযুক্ত রাখতে হবে, যাতে কেউ আলস্যের সুযোগ না পেতে পারে।

প্যারেড করবার পদ্ধতিটা এখানকার সকল বিষয়েই দেখা যায়। সকালে প্রাতঃকৃত্য থেকে শুরু ক'রে রাত্রে শোবার সময় পর্যন্ত সকল কাজই প্যারেডপূর্বক সমাধা করতে হয়। এমন কি খেতে বসাটাও একটা রীতিমত প্যারেড। খাবার জন্যে এখানে মেসের মতো ব্যবস্থা। আহার্য এবং পাচক সরবরাহ করে কর্তৃপক্ষ, তাই নিয়ে কয়েকজনে মিলে এক একটি মেস ক'রে নিজেদের খাবার ব্যবস্থা নিজেদেরই ক'রে নিতে হয়। প্রত্যেক মেসে থাকে এক একজন মেস-প্রেসিডেন্ট, খাদ্যবিষয়ে তাঁরই আদেশ সকলকে প্রতিপালন করতে হয়। সমবেত হ'য়ে যখন খেতে বসতে যাবে তখন তার মধ্যেও অনেক আদবকায়দা রক্ষা করতে হবে। নিজের নিজের নির্দিষ্ট পোষাক পরে' স্যাম্-বেল্টটি পর্যন্ত এঁটে নিয়ে খেতে যেতে হবে, খেতে বসবার আগে মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে সেটা যথাস্থানে খুলে রাখতে পারবে, আবার খাওয়া হ'যে গেলেই তৎক্ষণাৎ সেই স্যাম্-বেল্ট কোমরে এঁটে নিতে হবে। মেস-প্রেসিডেন্টের আগে কেউ খাওয়া শুরু করবে না, আগে তিনি খেতে আরম্ভ করবেন, তখন সকলে খাবে। নতুন কোনো খাদ্য এলে আগে তিনি সেটা আস্বাদ করবেন, তখন সকলে তার ভাগ পাবে। আবার টেবিলে খেতে বসে চুপ ক'রে যদি শুধু খেয়ে যাও, সেটাও অসভ্যতা। আদবকায়দা বজায় রাখবার জন্যে খেতে খেতে যা হোক কিছু গল্প করতে হবে, কিন্তু রাজনীতির বিষয় কিংবা স্ত্রীলোকের বিষয় বাদ দিয়ে। মিলিটরি জগতে স্ত্রীজাতির কোনো অস্তিত্বই নেই এটা ধরে নিতে হবে। তবে আমার সুবিধার মধ্যে এই ছিল যে আমাদের মেসে যে ক'টি অফিসার ছিলেন তাঁরা

সকলেই খুব ভদ্র, সুতরাং তাঁদের সঙ্গে আমাকে খুব বেশি আড়ষ্ট হ'যে থাকতে হয় নি। রীতিবহির্ভূত কথাও কিছু কিছু তাঁদের কাছে বলা চলতো।

বাওলপিণ্ডিতে প্রচণ্ড গরম, অথচ আমাকে সর্বদা সেই অফিসারের খাঁকি পোষাকগুলো পরে থাকতে হয়। সিপাহীরা অনেক সময় খালি-গায়ে থাকে, আমাদের তাও করা চলে না। অন্তত দুবেলা স্নান করতে পেলেও কতকটা আরাম হয়, কিন্তু এক বেলাই ভালো ক'রে স্নান করবার উপযুক্ত পরিমাণ জল পাওয়া যায় না। অতিরিক্ত গরমে আমার সর্বাঙ্গে যন্ত্রনাদায়ক ফোড়া বেরোতে লাগলো। শরীর এবং মন একসঙ্গে বিকল হওয়া আমার জীবনে কখনো ঘটেনি, এখানে এসে তাও ঘটলো। মীরাকে চিঠি দিলেও তার কোনো জবাব পাই না, সকালে ডাক আসবার সময়টা প্রত্যহই উৎসুক হ'যে উঠি, কোনো চিঠিপত্র নেই দেখে সারা দিনটাই ম্রিয়মান হ'যে থাকি। তার ওপরে অনেকগুলো ফোড়ার যন্ত্রনা, মারাত্মক নয়, কিন্তু ভারী কষ্টদায়ক। একদিন খুব মরিয়া হ'যে আমাদের অফিসার-কমাণ্ডিংএর কাছে গিয়ে ফোড়াগুলো দেখিয়ে বললাম,—আমার অসহ্য হ'যে উঠেছে, আমাকে দিন কতকের ছুটি দিন। তিনি প্রচুর গুম্ফরাশির ভিতর থেকে মৃদু একটু হেসে বললেন,—এইটুকুর জন্যেই ছুটি? তোমরা এই গরম দেশেরই লোক, তোমরা যদি এমন কথা বলো তাহ'লে যে সব সৈনিক বিলেত থেকে এসে আরো কত কষ্ট পাচ্ছে তারা কি বলবে? তোমার কাজ অনেক কমিয়ে দিচ্ছি, নিজের চিকিৎসা নিজেই ক'রে ওগুলো সারিয়ে নাও।

আমি কি ভুলই যে করেছি তা সেদিন বুঝতে পারলাম। সুদুর্লভ প্রেমের আস্বাদ পর্যন্ত সব কিছুই আমি পেয়েছিলাম, কেবল নিজের বুদ্ধির দোষে সমস্ত নষ্ট ক'রে দিয়ে এ কোথায় আমি চলে এলাম! এখান থেকে ফিরে যাবারও কোনো উপায় নেই, যে ভুল করেছি তার সংশোধনেরও আর উপায় নেই। বহুকাল পরে যদি কখনো বাংলাদেশে ফিরে যাই তখন আমার আপন জনেরা পরের মতো ব্যবহার করবে, প্রিয়ব্যক্তি ব'লে হয়তো চিনতেই পারবে না। মীরা যে আমার কতটা আপন হয়েছিল সে কথা এখন বুঝতে পারছি, কিন্তু দীর্ঘ অদর্শনের বিস্মৃতির

পরে গিয়ে তাকে আবার সে কথা কেমন ক'রে স্মরণ করিয়ে দেবো? সেই অসম্পূর্ণ মধুর আখ্যায়িকাটুকুর ঐখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেছে। এমনি ভাবে পেয়ে বঞ্চিত হওয়াই আমার চিরদিনের ভাগ্যলিপি। হয়তো গিয়ে দেখবো স্বামীকে আর দেওরকে নিয়ে সে পৃথক রকমের একটি পরিতৃপ্তির আবেষ্টন রচনা করেছে, আমি সেখানে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। সেই ঘরোয়া আবেষ্টনের মধ্যে বাইরের অবাস্তব ব্যক্তির কোনো স্থান নেই। হয়তো আমাকে দেখে সে মর্মান্তিক রকমের কিছু ভদ্রতা করতে আসবে, কিংবা হয়তো—

ইতিমধ্যে হঠাৎ পিয়ারীলালের সঙ্গে আলাপ হ'য়ে আমার হতাশা কতক ঘুচলো। সে নিজেই অনুসন্ধান ক'রে আমাকে আবিষ্কার করলে। শুনলাম মীরার অনুরোধেই সে আমার খোঁজে এসেছে। অতঃপর তার মারফতে মীরার চিঠি রীতিমত ভাবেই আসতে লাগলো। সেই সকল চিঠির মধ্যে সঞ্জীবনী মন্ত্র ছিল। অন্তত এইটুকু আমি বুঝলাম যে যোগাযোগ বজায় রাখতে আমার চেয়ে মীরারই বেশি আগ্রহ। আমি অশান্বিত হলাম। আশা থাকলে সব রকমের কষ্টই সহ্য করা যায়। মীরা একটা চিঠিতে জানতে চেয়েছিল যে বিকেলের চা টা কেমন খেতে পাই। অতি যাচ্ছেতাই চা তৈরী ক'রে দেয়, মীরার হাতের চাএর কথা মনে করতে করতে তাই আমি অম্লানবদনে গলাধঃকরণ করি। কিন্তু এ সব কথা তাকে লিখে লাভ কি? আমি যে কত কষ্ট পাচ্ছি সে কথা তাকে মোটে বলাই উচিত নয়, সে কত কষ্ট পাচ্ছে এইটুকু জানাই দরকার। সুতরাং আমার প্রকৃত অবস্থাটা কিছুই আমি তাকে জানতে দিই না; যেন আমার চেয়ে তারই বেশি কষ্ট হচ্ছে এইটে ধরে নিয়ে সহ্য করা সম্বন্ধে তাকে অনেক রকম উপদেশ দিই। এদিকে আমি নিজের যন্ত্রণা চুপচাপ নিজেই সহ্য করি, পিয়ারীলালের কাছে বই চেয়ে আনি, অবসরের সময়টা বই পড়ে কাটিয়ে দিই। ক্রমশ অনভ্যাসের কষ্টগুলো আপনিই কতক অভ্যাস হ'য়ে এলো, ফোড়া সেরে গেল, মীরার চিঠিও রীতিমত আসতে লাগলো। মীরার প্রত্যেক চিঠিতেই যখন বোঝা গেল যে আমাকে সে সহজে ভুলতে পারবে না, স্বামী দেওর প্রভৃতি

কাছে থাকা সত্ত্বেও এই দূরের মানুষটির দিকেই সর্বদা তার মন পড়ে আছে, তখন থেকে অনেকটা স্বচ্ছন্দভাবেই আমার দিন কাটতে লাগলো।

এমন সময় জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করলে। ভারত সাগরের তীরে তীরে বেধে গেল লড়াই। আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রে যে সব সৈন্যদল যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল তাদের তখন অভিযান শুরু হ'য়ে গেল। আমাকেও তাদের সঙ্গে যাত্রা করতে হোলো। কখনো ট্রেণে কখনো জাহাজে কখনো পদব্রজে আমরা বর্মা মুলুকের অভ্যন্তরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। সেখানে কোনো চিঠি পাওয়া নিতান্তই ভাগ্যের কথা। চিঠি দেবার এবং চিঠি পাবাব সকল ব্যবস্থা ঠিকই আছে, অ্যাড্‌ভান্স বেস্ পোষ্ট অফিসের (এ. বি. পি. ও.) মারফত চিঠি দিলে তারা যথাস্থানে পৌছে দেয়। কিন্তু আমরা কখনো এক স্থানে থাকি না, ক্রমাগতই স্থান পরিবর্তন করছি। সুতরাং চিঠি এলেও অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কোথাও পড়ে থাকে। তবে চিঠি না পেলেও আমি মীরাব সম্বন্ধে কতকটা আশ্বস্ত হ'য়ে নিজের কাজ নিয়ে থাকতে পারি।

আমরা তখন যুদ্ধসীমার মধ্যে গিযে পড়েছি। এখানকার আইনকানুন একটু স্বতন্ত্র, কারণ এখানে সাক্ষাৎ মৃত্যু নিয়ে কাববার। এখানে প্রত্যেককে নিজের সর্বাপেক্ষা নিকটতম আত্মীয়ের নাম আর ঠিকানা লিখে রেজিষ্ট্রী করাতে হয়, সেটা লিপিবদ্ধ হ'য়ে থাকে হেড কোযার্টার্সের দপ্তরে। যদি কারো মৃত্যু হয তখন সম্মান তালিকা (রোল্ অফ্ অনাব) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হেড কোয়ার্টার্স থেকে ঐ নিকটতম আত্মীয়ের কাছে খবর পাঠানো হয, এবং স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি যারা এতাবৎ মৃতব্যক্তির উপার্জনের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছিল তাদের জন্যে ঐ ঠিকানায় পেন্‌শনের ব্যবস্থা করা হয়। আমাকে যখন নিকটতম আত্মীয়ের নাম ঠিকানা লিখে দিতে হোলো তখন আমি লিখে দিলাম মীরার নাম ঠিকানা। আমার স্ত্রী পুত্র বর্তমান, পেন্‌শন পেতে হ'লে তারাই একমাত্র ন্যায্য অধিকারী, কিন্তু তাদের ঠিকানা না দিয়ে মীরার ঠিকানা কেন দিলাম তা জানি না। হয়তো ভাবলাম যে একটা সুদূর পল্লীগ্রামের ঠিকানা দেওয়ার চেয়ে কলকাতার ঠিকানা

দেওয়াই ভালো, খবরটা ওখানে সহজে পৌছবে। আর প্রয়োজন হ'লে মীরাই তাদের জন্যে পেন্‌শনের ব্যবস্থাটা সহজে ক'রে দিতে পারবে। আরো হয়তো ভেবেছিলাম যে আত্মীয় না হ'লেও মীরাই আমার সর্বাপেক্ষা নিকটতম, মৃত্যুর সংবাদটা ওর কাছেই আগে যাওয়া উচিত।

মৃত্যুব জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে রইলাম বটে কিন্তু কিছুকাল পর্যন্ত মৃত্যুকে একবার চোখেও দেখলাম না। যেখানেই যাই, রবার গাছের জঙ্গলের মধ্যে কিংবা লোকালয়ের কাছে কোনো পার্বত্য নদীর ধারে ছাউনি ফেলে থাকি। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি চমৎকাব, স্থানে স্থানে বৌদ্ধ প্যাগোডার প্রকাণ্ড চূড়াগুলো দেখা যায়। বর্মার পল্লীগুলি ছবির মতো সুন্দর, সেখানে হরেক বকমের ফুল ফোটে অজস্র। এ দেশেব লোকে ফুল খুব ভালোবাসে। বর্মী নরনারী আর ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা মাথায ফুল গুঁজে দল বেঁধে একত্র হ'য়ে দূব থেকে অত্যন্ত কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাদের দেখে, আমোদ করবার ছলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ দৈবাৎ ওদের দিকে একটু ইসারা করলেই তৎক্ষণাৎ ভয় পেয়ে ওরা সদলবলে দৌড় মারে। তৎক্ষণাৎ হয়তো ওদের পল্লীতে পল্লীতে নানারকম গুজব ছড়িয়ে যায়, তার পর থেকে আব কেউ আমাদের ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। আমরাও যে মানুষ জাতীয় প্রাণী এটা বোধ হয় ওরা ভাবতেই পাবে না।

শুনলাম জাপানীবা এখনও অনেক দূরে বয়েছে, আমরা আগের থেকেই তাদের প্রতিরোধ করতে যাচ্ছি। আমাদের সঙ্গে রয়েছে চলন্ত অ্যাম্বুলান্স ইউনিট, চলন্ত সার্জিক্যাল ইউনিট, চলন্ত হাসপাতাল। এগুলি মোটরের দ্বারা চালিত ঘরের মতো দেখতে, এর মধ্যে আহত সৈনিকদের এনে রেখে সাময়িক চিকিৎসা করবার চমৎকার ব্যবস্থা আছে, চিকিৎসার অনেক সরঞ্জাম এমন কি রক্ত-দানের ব্যবস্থা পর্যন্ত কোথাও কোথাও আছে। কিন্তু বেশি গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটলে তার চিকিৎসা এখানে হ'তে পারে না, তখন এখান থেকে রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এম্. ডি. এস্. নামক পরবর্তী চিকিৎসা কেন্দ্রে। সেটা থাকে অগ্রগামী সৈন্যদলের অনেকটা পিছনে, সেখানকার ব্যবস্থা আরো কিছু

ব্যাপক রকমের। অ্যাম্পুটেশন প্রভৃতি বড়ো রকমেব অপারেশনগুলো করবাব জন্যে সেখানেই বোগীদের পাঠাতে হবে। তারও পিছনে আছে সি. সি. এস্, সেগুলিকে সকল রকমের আধুনিক সবঞ্জামে সজ্জিত বীতিমত হাসপাতাল বলা চলে,—সেখানে নার্স থাকে, বড়ো বড়ো সার্জন থাকে। সকল বকমের জটিল অবস্থার রোগীদেব শেষ পর্যন্ত সেখানেই পাঠানো হবে।

আমরা বেশ একটি বড়ো রকমের সৈন্যদল নিয়ে চলেছি, তাব মধ্যে সকলেই ভারতীয়, কেবল অফিসারগুলি ব্রিটিশ। আমবা ডাক্তাব আছি পাঁচ জন, সকলেই ভারতীয। তার মধ্যে তিনজন বাঙালী, একজন মাদ্রাজী, একজন পাঞ্জাবী। আমবা সকলেই ক্যাপ্টেন, আমাদের নামগুলি হচ্ছে যথাক্রমে ক্যাপ্টেন বটব্যাল, চক্রবর্তী, চৌধুরী, পিলাই, আর সিং। উপাধিতেই আমাদেব পবিচয়, নাম কাবো জানা নেই।

এব মধ্যে প্রথমেই যাঁব নামটি বলেছি তিনি একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি, তিনি আমাদেব সকলেরই দাদা। ক্যাপ্টেন বটব্যাল ব'লে কেউ তাঁকে ডাকে না, সকলেই বলে দাদা, এমন কি অফিসাররা পর্যন্ত বলে মাইডিযাব ক্যাপ্টেন দাদা। প্রকৃতই তিনি মাইডিযাব ধবণেব লোক, সকলকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই যেন তাঁব আবির্ভাব হযেছে। বয়স হ'য়ে গেছে আটচল্লিশ, কিন্তু তবু এমন কর্মঠ আর কষ্টসহিষ্ণু যে যুবকেরাও তাঁব মতো মার্চ ক'রে যেতে পারে না। আমরা কেউ যদি কখনো ক্লান্ত হ'যে পড়ি, তাঁর উদাহরণ দেখে তখন লজ্জা পাই। কিছুতেই তিনি ক্লান্ত হন না। চেহারা দেখলে কিন্তু মনে হয যথেষ্ট বয়স হয়েছে, গাল মুখ চড়িয়ে গেছে। চুলগুলো অধিকাংশই পেকেছে, সেগুলো ছোটো ক'বে ছাঁটা, দেখতে সজারুর কাঁটার মতো খোঁচা খোঁচা। দাদার বয়স বুঝে আর চেহাবা দেখে প্রথমে তাঁকে সি. পর্যায়ে ফেলা হযেছিল,—অর্থাৎ যে পর্যাযের লোকেরা খুব পবিশ্রমেব কাজের পক্ষে উপযোগী নয়, তাদের কেবল কম পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হয়, বেশিদূর মার্চ করতে বলা হয় না, অগ্রগামী সেনাদের সঙ্গে পাঠানো হয় না,—ইত্যাদি। কিন্তু দাদাব খাটবার শক্তি আর

উৎসাহ দেখে তাঁকে সে পর্যায় থেকে সরিয়ে এনে অগ্রগামী দলের মধ্যে রাখা হোলো।

দাদার পূর্বজীবনের ইতিহাসটা বড়ো করুণ। কুড়ি বছর তিনি ডাক্তারি প্র্যাকটিস ক'রে যুদ্ধের কাজে এসেছেন। প্র্যাকটিস খুব ভালোই ছিল, আগে অনেক উপার্জন করেছেন, দেশে বাড়িঘর তৈরী করেছেন। স্ত্রী ছিলেন খুব গুণবতী, দশ বারো বছর আগে সেই স্ত্রী মারা যান। তখন থেকেই দাদার পরিবর্তন ঘটলো, প্র্যাকটিস প্রায় ছেড়েই দিলেন। সেই থেকে উনি ব্রহ্মচর্য পালন করেন। মাছ মাংস খান না, রীতিমত প্রাণায়াম আর যোগ অভ্যাস করেন, শ্রীঅরবিন্দকে গুরুর মতো ভক্তি করেন। একটিমাত্র মেয়ে ছিল, ভালো ঘরে তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন, তার পর থেকে এই সব নিয়েই থাকতেন। যখন যুদ্ধ বেধে উঠলো, কাগজে কাগজে মিলিটরি বিভাগে ডাক্তার নেবার বিজ্ঞাপন দেখে উনি বললেন, এখনো আমার পঞ্চাশ পার হয় নি, যুদ্ধটা একবার দেখে আসি। ভদ্রলোক খুব নিরহঙ্কার এবং নিস্পৃহ প্রকৃতির, কিন্তু এদিকে খুব রসিক, আমোদে আহ্লাদে সর্বদাই আমাদের মশগুল ক'রে রাখেন। যুদ্ধের কাজে এসেও নিজের ব্রহ্মচর্যের নিয়মগুলি পালন ক'রে যান, খুব ভোরে সকলের আগে উঠেই প্রাণায়াম শুরু ক'রে দেন। কোনো দিন কোনো কিছুতেই এর ব্যতিক্রম হয় না।

আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা দাদা, ও-সব বুজরুকিগুলো করেন কেন? ওতে কি সুখ পান?

—অবশ্য কিছু পাই বৈকি। বাইরে থেকে কি বুঝবি, নিজে ক'রে দেখলে তখন বুঝতে পারতিস।

—রেখে দিন ও-সব চালাকি। আপনার স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন করেছিলেন কি প্রাণায়াম?

—তা কেন করবো? তখনকার আনন্দ ছিল অন্য রকম, আর এটা অন্য রকম। সেটা নেই ব'লেই এটা ধরেছি।

—তিনি মারা যাওয়াতে খুব বেশি শক্ পেয়েছিলেন বুঝি ? কিছু মনে করবেন না, আপনি বুঝি আপনার স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসতেন ?

—ভালোবাসতাম বললেই সবটা বলা হয় না, অনেকখানি বাদ পড়ে যায়। তাঁর ওপরে সমস্ত নির্ভর ক'রেই আমি ডাক্তারি করতাম, পয়সা উপার্জন করতাম, ভেবেছিলাম যে মেয়েটার বিয়ে দেবার পরে তাঁকে নিয়েই আমার বাকি জীবনটা আনন্দে কেটে যাবে। সাংসারিক জীবন বলতে যা কিছু বোঝায়, তাঁকে নিয়েই তো সব ছিল।

—স্ত্রী জাতির ওপরে এতটাই নির্ভর করা যায় কি ? আমার তো তা মনে হয় না। আপনার হয়তো একটু বাড়াবাড়ি ছিল, এটা তারই রিঅ্যাকশন।

—এই রে, তুই নিতান্তই মরেছিস দেখছি। তুই বুঝি তোর স্ত্রীকে অবিশ্বাস করিস ? তাই বুঝি ঘর ছেড়ে পালিয়ে চলে এসেছিস ?

—সে কথা হচ্ছে না, তবে প্রায়ই দেখতে পাই মেয়েরা আমাদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে। তাই বলছি।

—আর তোরা বুঝি কখনো কিছু করিস না ? ওরে ভাই, সবাই সমান, যেমন মেয়ে তেমনি পুরুষ। কিন্তু যাকে তুই এতটা ঘোরালো ক'রে প্রবঞ্চনা বলছিস সেটা আসলে তেমন কিছুই নয়, বড় জোর হয়তো সাময়িক একটা স্খলন। ও সব তুচ্ছ দিকে চাইতে নেই, মানুষের কেবল ভিতরের দিকটা দেখবি। বিল্বমঙ্গলের গল্প জানিস তো ? একজন বণিকের স্ত্রীকে দেখে বিল্বমঙ্গলের ভারী লোভ হয়েছিল, সে তার অতিথি হ'য়ে ঐ স্ত্রীটিকে একদিন ভোগ করতে চাইলে। অতিথিকে বিমুখ করা যায় না, বণিক তাতেই রাজি হোলো। নিতান্ত অসম্ভব মনে করিস না, সংসারে এমন লোক এখনও দেখা যায়। ভাগ্যিস বিল্বমঙ্গল লোভ জয় ক'রে চোখ উপড়ে ফেললে, নইলে সেই বণিক আবার নিজের স্ত্রীকে আগের মতোই গ্রহণ করতো,—কারণ ওটা তার কাছে সাময়িক একটা অ্যাক্সিডেণ্ট মাত্র, ওতে তার কিছুই যেতো আসতো না। আমাদের জীবনের স্খলনগুলিকে ওই বণিকের মতো গ্রহণ ক'রে নিলেই সব মিটে যায়। আমার স্ত্রী আমার সম্বন্ধে এই কথাই

বলতেন। আমার নিজের অল্প বয়সে যা যা করেছি আর পরেও যা করেছি, সব তাঁকে বলতাম, সবই তিনি ঐ ব'লে উড়িয়ে দিতেন। তিনি যখন বেঁচে ছিলেন তখন নেহাৎ ভালোমানুষটি ছিলাম না, মরে যাবার পরে এইরকম হ'য়ে গেছি।

—বুঝতে পারছি, তিনি নিজেই নিতান্ত ভালোমানুষ ছিলেন, তাই আপনি দোষ করলেও তিনি বিশ্বাস ক'রে খুশি হ'য়ে থাকতেন।

—ঠিক বলেছিস। তুইও তাই করবি। বিশ্বাসে মিলয়ে খুশি, তর্কে বহুদূর। যাকে ভালোবাসিস তাকে অবিশ্বাস করবি না। তাতে নিজেই যন্ত্রণা পেয়ে মরবি।

আমাদের ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী লোকটি একেবারে অন্য ধরণের। দেখতে খুব লম্বা আর খুব রোগা, মাথার মাঝখানে একটু টাক,—সম্প্রতি বিবাহিত। রবীন্দ্রনাথের গানের বড়ো ভক্ত, বিকৃত স্বরে আর বেসুরো গলায় সর্বদাই গুণ্ গুণ্ ক'রে গাইছেন,—'ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন, ও মাধবী ও মাধবী'—। বৌএর কথা সর্বদাই তাঁর মুখে লেগে আছে। চলে আসবার সময় বৌ কি কি কথা বলেছিল, কতখানি কেঁদেছিল, পানের খিলিটা মুখে নিয়ে কেমন ক'রে ওঁর মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছিল, সেই একই গল্প কানের কাছে মুখ এনে বারে বারে বলবেন। যদি বলি, এ গল্প তো অনেকবার শুনেছি, নতুন কিছু বলুন,—অমনি রেগে উঠে বলবেন,—আঃ, আপনি তো বড়ো বেরসিক, এটা অন্য বারের কথা বলছি, মন দিয়ে শুনুন না। নতুন বিবাহের নতুন মোহ কাটিয়ে এসেছেন, চক্রবর্তীর ওপর আমার করুণা হোতো। অগত্যা ওঁর সেই এক গল্প বারেবারেই শুনতাম আর বারেবারেই হাসতে হোতো। দাদা কিন্তু এতটা সহ্য করতেন না। তাঁর কানে কিছু বলতে গেলেই তিনি বলতেন,—ওরে ভাই, আমার কাছে কেন, যার কাছে বললে একটা লাভের আশা ছিল সে তো এখানে নেই,—কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদানন স্পর্শলোভাৎ, সোতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃশ্যঃ,—বুঝলি কথাটা? কবি বলছেন, যার মুখের একটু স্পর্শ পাবার লোভে বাজে কথাটাও কানের কাছে গিয়ে বলতে চাইতিস, সেও এখন চোখের আড়ালে, আর তার

কানটাও এখানে নেই, তার বদলে আমাদের কানের কাছে ঘেঁষে এলে কি সেই সুখটি পাবি ? দাদা ওকে ঠাট্টা ক'রে এই সব কথা বলেন বটে, কিন্তু আমার মনটা ব্যথিয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় একদিন আনন স্পর্শলোভাৎ আমি কি কাণ্ডই করেছিলাম। এই দূর বিদেশে সেই স্পর্শবাসনা আবার নতুন ক'রে জেগে ওঠে, অনেক কষ্টে নিজের মনকে সংযত করি।

ক্যাপ্টেন পিলাই লোকটি নেহাৎ ভালোমানুষ, অত্যন্ত কালো মুখের ভেতর থেকে অত্যন্ত সাদা দাঁতগুলি বের ক'রে যখন হাসেন তখন সে বেশ মনোরম দেখায়। এঁর তিন কুলে কেউ নেই, নিকটতম আত্মীয়ের নাম লেখার সময় লিখে দিলেন নিজের ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডারের নাম। অথচ অর্থসঞ্চয়ের আগ্রহ যথেষ্টই আছে, কিছু মোটা রকমের অর্থ সঞ্চয় ক'রে নেবার জন্যেই এই চাকরিতে এসেছেন। ক্যাপ্টেন সিং-কে ঠিক বোঝা যায় না। তিনি আমাদের দলে যদিও সর্বদাই মেশেন, হাসবার কথা উঠলেই বোকার মতো হাসেন, কিন্তু নিজে কিছু বলেন না।

সন্ধ্যার পরে আমাদের গল্পগুজব জমে ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে সন্ধ্যার পরে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করা একেবারে নিষিদ্ধ। আলো জ্বালা নিষিদ্ধ, সিগারেট খাওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ,—পাছে তার আলো দেখা যায়। নিজের নিজের গণ্ডীর বাইরে কারো যাওয়া নিষিদ্ধ। নিজেদের ছাউনির পেরিমিটার বা সীমানার বাইরে যাওয়া তো একেবারেই নিষিদ্ধ, তাহ'লে পাহারায় নিযুক্ত নিজেদের লোকেরই গুলি খেয়ে মরতে হবে। কিন্তু ঐ সময়টিতেই আমরা পাঁচজনে একত্র হতাম, তাঁবু কিংবা ট্রেঞ্চের ধারে বসে ফিস্‌ফিস্ ক'রে গল্প করতাম, একজন কিছু খাবার তৈরী করলে পাঁচজনে তাতে ভাগ বসাতাম। অনেক রাত পর্যন্ত চলতো আমাদের আড্ডা। আমরা হচ্ছি বাঙালী, আড্ডা না হ'লে কি চলে ?

মান্দালয়ের কাছে কিছুদিনের জন্যে আমাদের কতকটা স্থায়ী রকমের ছাউনি করা হয়েছিল। তখন এক একদিন আমাদের সন্ধ্যাকালীন আড্ডার আসরে ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীকে অনুপস্থিত থাকতে দেখা যেতো। সন্ধ্যার পরেই সে কোথায়

অদৃশ্য হ'য়ে যেতো, আমরা ভাবতাম আমাদের ছেড়ে নিশ্চয় অন্য কোনো ক্যাম্পে আড্ডা দিতে গেছে। একদিন চক্রবর্তী আমাকে চুপি চুপি বললে,—আজ রাত্রে এক জায়গায় বেড়াতে যাবেন, একটু আমোদ আহ্লাদ করা যাবে? আমি বললাম,—তাতে আব দোষ কি, যাবো।

সন্ধ্যার পরে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে পেরিমিটারের বাইরে চলে যাচ্ছি দেখে ভয় হোলো। চক্রবর্তীকে বললাম,—আমরা যে সীমানা পার হ'য়ে যাচ্ছি, দূরে গেলে গুলি খেয়ে মরতে হবে। চক্রবর্তী বললে,—চলুন না, আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, এত ভয় কি? এখানে যারা এ সময় পাহারা দেয় তাদের সঙ্গে আমার বলাকওয়া আছে।

চক্রবর্তী •আমাকে নিয়ে গেল শহরতলীর এক বর্মী সুন্দরীর ঘরে। পুষ্পাভরণে সজ্জিতা সেই রূপাজীবা যেন আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিল, অভ্যর্থনা ক'রে আমাদের ঘরেব মধ্যে নিয়ে গেল। মেয়েটি খুব হাস্যময়ী আর লাস্যময়ী,—অবাক হ'য়ে আমি দেখতে লাগলাম ওর অতিথি সংকারের আদবকায়দা, তার প্রত্যেকটি ভঙ্গী সুরুচিসম্পন্ন এবং বহু যত্নে শেখা। উৎকৃষ্ট চা এনে আমাদের খাওয়ালে, সিগারেট মুখে তুলে দিয়ে স্বহস্তে দেশালাই জ্বেলে ধরিয়ে দিলে। অবলীলাক্রমে আমাদের কাছে বসে বেশ আতিথেয়তা কবতে লাগলো। অথচ তার কথাও আমরা একবর্ণ বুঝি না, আমাদের কথাও সে একবর্ণ বোঝে না। কিন্তু তাতে কোনো পক্ষেই কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। চক্রবর্তী তাকে ইসারা ক'রে ডাকে, সে তখন খুব কাছ ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়ায়। চক্রবর্তী নানা কথা ব'লে আদর করতে থাকে, সে কিছু না বুঝলেও ঘাড় নেড়ে তার জবাব দেয় আর মৃদুমৃদু হাসতে থাকে। আমি কিছু বলছি না দেখে আমার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চায়, আবার যেন লজ্জা পেয়ে চক্রবর্তীর দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়।

মেয়েটির মুখখানি অনেকটা নেযাপাতি ডাবের মতো নিটোল এবং গোলালো। মাথার ওপরে তার শক্ত বোঁটার মতো বর্মী ঝুঁটি বাঁধা, চিবুকের নিচে ঈষৎ একটু টোল খাওয়া। সেটা মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে। একবার দেখলে

আরো কিছুক্ষণ দেখতে ইচ্ছে হয়। পল্লবঘন কালো কালো চোখ দুটিতে মনে হয় যেন কাজল পরেছে।

বিদেশী সৌন্দর্য আর বিদেশী হাসির একরকম চমৎকারিত্ব আছে, দেখলে নতুন কি একরকম মোহ জাগে। এই বিদেশিনীর অপরূপ তারুণ্য আর মার্জিত ব্যবহার দেখে আমি মুগ্ধ হলাম, প্রশংসার চোখে ওর ক্রিয়াকলাপ দেখতে লাগলাম। ও বোধ হয় সেটা বুঝতে পেরে কিছু উৎসাহ পেলে। চক্রবর্তী ইসারা করবামাত্র ও গান গাইতে শুরু ক'রে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে পোয়ে নৃত্যের অনুকরণে একটু একটু নাচতে লাগলো আর আমার দিকে বক্র দৃষ্টিতে চেয়ে মাঝে মাঝে হাসতে লাগলো। গান শেষ ক'রে হাঁপাতে হাঁপাতে বুকভরা দ্রুতস্পন্দন নিয়ে সে আমার খুব কাছে এসে দাঁড়ালো, আমার কাঁধে হাত রেখে কি একটা কথা বললে।

বিদ্যুৎ ঝিলিকের মতো চকিতে আমার মনে পড়ে গেল মীরাকে। একদিন সিঁড়ি দিয়ে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে ঠিক এমনি ভাবে সেও আমার কাছে এসে কি একটা কথা বলেছিল। সেদিন মীরার সান্নিধ্যে আমার মনে জেগে উঠেছিল একটা উন্মত্ত বাসনা। তাই স্মরণ করবামাত্র আজ এই মেয়েটির সান্নিধ্যে অকস্মাৎ জেগে উঠলো একটা বিজাতীয় ঘৃণা। সাপের গায়ে হাত ঠেকলে যেমন চমকে উঠতে হয়, তেমনি ভাবে আমার সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত হ'যে উঠলো, ভয়ে আর ঘৃণায়। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। চক্রবর্তীকে বললাম,—আমার শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছে, বড়ো গা বমি বমি করছে, আমি আর থাকতে পারছি না। চক্রবর্তী বললে,—দাঁড়ান দাঁড়ান, একলা যাবেন না, পেরিমিটারের কাছে গেলেই গুলি খাবেন। কিন্তু তখন কে শোনে সে কথা, ঊর্ধ্বশ্বাসে আমি ছুটলাম। ভাগ্যক্রমে সেদিন জ্যোৎস্না ছিল, পাহারায় ছিল চেনা লোক, বন্ধুত্বের সাড়া দিয়ে অক্লেশে আমি তাঁবুতে ফিরে গেলাম।

পরের দিন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হতেই সে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে,—ভয় পেয়ে হঠাৎ পালিয়ে এলেন কেন?

আমি উল্টোচাপ দিয়ে বললাম,—আপনার না নতুন বিয়ে হয়েছে, বৌএর সম্বন্ধে আমাদের কাছে এত ব্যাখ্যা করেন, আর আপনার এই প্রবৃত্তি ?

চক্রবর্তী হাসতে হাসতে বললে,—বৌএর জন্যে সত্যিই বড়ো কষ্ট হয়, সেইটে ভোলবার জন্যেই তো ওর কাছে যাই। ও আমাকে ভারী ভালোবাসে, কিছুতে ছাড়তে চায় না।

—ছি ছি, ওকে আপনি ভালোবাসা বলেন ? আপনার স্ত্রীর যেমন ভালোবাসার কথা বলতেন, তার সঙ্গে ওর কোনো তুলনা হয় ?

—সে হচ্ছে অন্য জিনিস, আর এ হচ্ছে অন্য জিনিস। বৌ তো এখন কাছে নেই, কেমন ক'রে থাকি বলুন, আপাতত ওর কাছ থেকেই একটু আনন্দ নিয়ে আসি। ইচ্ছে করলে আপনিও একটু ভাগ পেতে পারতেন।

—আপনার তাতে কিছু রাগ কিংবা হিংসে হোতো না ?

চক্রবর্তী হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললে,—হিংসে হবে কেন ? ওরা আমাদেব মতো সকলকে আনন্দ দেবার জন্যেই আছে। এ তো আর স্ত্রীর ভালোবাসা নয়, এ ভালোবাসায় ভাগাভাগি চলে। চলুন না, আজকে আবার যাওয়া যাক।

নির্লজ্জ চক্রবর্তী আমাকে নির্বাক দেখে আবার হাসতে থাকে।

কিছুদিন পরেই খবর পাওয়া গেল শত্রুপক্ষ এসে পড়েছে অতি নিকটে। জাপানীরা পিগু অধিকাব ক'রে নিয়েছে, দ্রুতগতিতে রেঙ্গুণের দিকে আসছে। ওরা যে এত তাডাতাড়ি অগ্রসর হ'য়ে আসতে পাববে এটা কেউ কল্পনাই করেনি। আমাদের পক্ষ এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না, উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণ এসে পৌঁছয়নি, বিমানশক্তি খুব কম,—আমাদের পক্ষ তাই পিছু হটতে লাগলো। অনেক অগ্রগামী সেনাদল পিছু হটে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিতে লাগলো। কর্তৃপক্ষেরা স্থির করলেন যে আমাদের এখন শক্ত হ'য়ে খানিকটা পিছনে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে, শত্রুপক্ষ এসে পড়লে যথাসম্ভব বাধা দিতে হবে।

এই সময় বর্মাপ্রবাসী ভারতীয়দের ইভাকুয়েট ক'রে দেশে ফিরে যাবার আদেশ দেওয়া হোলো। তারা দলে দলে বর্মা ত্যাগ ক'রে দুর্গম হাঁটাপথে দেশের দিকে ফিরতে লাগলো। তখন আর জাহাজ নেই, এই পথ ছাড়া অন্য কোনো পথে ফিরবার উপায় নেই। ট্রেণে, মালগাড়িতে, লরিতে, গরুর গাড়িতে, মোটরে, নৌকায়, পায়ে হেঁটে, যখন যে যেমন ভাবে পাবলে পালাতে লাগলো। কর্তৃপক্ষ স্থানে স্থানে রিলিফ ক্যাম্প খুলে পলাতক যাত্রীদের চাল ডাল বিতরণের ব্যবস্থা করে দিলে বটে, কিন্তু দস্যু আর সংক্রামক রোগ নিবারণের সম্বন্ধে কোনোই ব্যবস্থা করতে পারলে না।

আমরা উত্তর দিকে একটু পিছিয়ে গিয়ে যেখানটায় শক্ত ঘাঁটি গেড়ে রইলাম সেখানটাও মান্দালয়ের কাছাকাছি। ঐ জায়গাটাকে বলা হয় শান রাজ্য। ওখানে শান কেরীন প্রভৃতি দুর্দান্ত জাতিরা বাস করে। তারা অত্যন্ত হিংস্র প্রকৃতির, হাতে ধারালো কাটারি নিয়ে সর্বদা ঘুরে বেড়ায়। বর্মাত্যাগী পথিকদের দল সেখান দিয়ে সারে সারে চলেছে, শানেরা সুবিধা পেলেই তাদের আক্রমণ করে, খুনজখম ক'রে তাদের যথাসর্বস্ব লুটে নেয়। আমরা প্রায়ই দেখতে পাই ছিন্নমুণ্ড অবস্থায় পথের ধারে দু চারটে মৃতদেহ পড়ে আছে।

আমরা যেখানে ঘাঁটি নিয়েছি তার চারিদিকেই পাহাড় আর শাল সেগুনের বন। মাঝে মাঝে পার্বত্য ঝর্ণার ধারা কল্ কল্ ক'রে বেয়ে চলেছে। পথ অতি দুর্গম ও বন্ধুর। এ পথ দিয়ে নিতান্ত দরিদ্র ভারতীয়দের দল ছাড়া আর কেউ যায় না। তার মধ্যে অধিকাংশই চাটগেঁয়ে মুসলমান অথবা পশ্চিমা হিন্দুস্থানী। দেখতে পাই যে এখন আর হিন্দু মুসলমানে কোনো পার্থক্য নেই, সকলে মিলে একজোটেই চলে। ওদের যা নিয়ে বিরোধ সেই সম্পদও আর নেই, চাকরিও আর নেই, সুতরাং ওদের মধ্যে আর কোনো সম্প্রীতির অভাব নেই। ওরা হিন্দু মুসলমানে মিলে চলতে চলতে সন্ধ্যার পূর্বেই একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গা বেছে নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে, পরবর্তী আরো অনেক দল এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়, সকলে একটি বৃহৎ দল বেঁধে সেখানে রাত্রিযাপন করে।

এই সব স্থানে যথেষ্ট দস্যুভয়ও আছে, আবার হিংস্র জানোয়ারের ভয়ও আছে, দলে ভারী না হ'লে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। অবস্থাপন্ন লোকদের কিংবা ইউ-রোপীয়দের পক্ষে এমন ভাবে যাওয়া অসম্ভব। তারা চলেছে ট্রেণে কিংবা লরিতে কিংবা অন্যান্য রকমের যানে।

একদিন এই দুর্গম পথে আমরা এক দুর্দশাপন্ন বাঙালী ভদ্র পরিবারের সাক্ষাৎ পেলাম। বৃহৎ একটি পরিবার, ছেলে মেয়ে যুবা বৃদ্ধ নিয়ে সংখ্যায় প্রায় চল্লিশ জন হবে। তাদের অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। শুনলাম তারা দু দিন নিরাশ্রয় অবস্থায় গাছতলায় বসে বৃষ্টিতে ভিজেছে। ছেলেমেয়েগুলিকে কোনোমতে খেতে দিয়েছে কিন্তু অন্যান্য সকলে তিন দিন একরকম অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে। এর আগে কয়েকদিন তারা মান্দালয় স্টেশন থেকে ট্রেণে ওঠবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুতে উঠতে পারে নি। অনন্যোপায় হ'য়ে তারা হাঁটাপথ ধরবে মনে করেছে, কিন্তু বেশিদূর অগ্রসর হ'তে পারেনি। পরিবারের যিনি বড়ো কর্তা তিনি পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছেন, উঠে দাঁড়াতে পারেন না, চাকর আর ছেলেরা কয়েকজন মিলে তাঁকে বয়ে নিয়ে চলেছে। মেয়েরা চলেছে এক একটি শিশুকে কোলে নিয়ে। এমন ভাবে চললে এরা কতটা পথ অতিক্রম করবে? যারা সমর্থ তারা অনায়াসে অগ্রসর হ'য়ে চলে যেতে পারে, কিন্তু কেউ কাউকে ছেড়ে যেতে চায় না। হয়তো এদের মধ্যেও এক সময় কত বিরোধ ছিল, কিন্তু এখন সবাই সবাইকে আঁকড়ে ধরে আছে। মরতে হয় তো সকলে একসঙ্গেই মরবে।

আমাদের ক্যাম্পের পাশে খচ্চর থাকবার জন্যে একটা খোঁয়াড়ের মতো ছোটো চালাঘর ছিল, আমরা অফিসার-কম্যাণ্ডিংএর অনুমতি নিয়ে সেখানে এক রাত্রির জন্যে এদের আশ্রয় দিলাম। ভিন্ন ভিন্ন মেস থেকে বাসি চাপাটি প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে এনে এদের খেতে দিলাম, তাই এরা ভাগাভাগি ক'রে গোগ্রাসে খেয়ে ফেললে। পরিচয় নিয়ে শুনলাম এরা ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ, বরিশালে এদের দেশ। রেঙ্গুণে এদের মস্ত কাঠের কারবার ছিল, তিন চার ভাইএর তিন চারটে স্বতন্ত্র বাড়ি ছিল,

প্রত্যেকের চার পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ছিল। রেঙ্গুণে যখন বোমার আক্রমণ হয় তখনও এদের চৈতন্য হয়নি। যখন শহর পরিত্যাগের আদেশ জারি হোলো তখনও এরা সেখানে টিঁকে রইল, বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে চলে আসতে ইতস্তত করছিল। তার পরে মগেরা সেখানে লুঠতরাজ শুরু করে, জেলের কয়েদীরাও ছাড়া পেয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। যেদিন ওদের চোখের সামনে রাস্তার ওপরে পাঁচ ছয়টা খুন হ'য়ে গেল সেদিন ওদের ভয় হোলো। ওরা বন্দুক লাঠি প্রভৃতি নিয়ে সম্পত্তি রক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু দস্যুদলের দুজন বর্মী সর্দার এসে বললে,—যদি প্রাণে বাঁচতে চাও তাহ'লে তোমাদের যা কিছু জিনিস যেমন অবস্থায় আছে সমস্ত ফেলে রেখে এখনই চলে যাও, সঙ্গে পথখরচা ছাড়া আর কুটোটিও নিয়ে যেতে পাবে না। ভয় পেয়ে এরা তখনই বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ফেলে রেখে নিজেদের দুটি মোটরে উঠে মাল বোঝাইএর মতো হ'য়ে রওনা দেয়। কিন্তু যতটুকু পেট্রোল সঞ্চয় করা ছিল, মান্দালয়ের কাছাকাছি এসে সমস্তই ফুরিয়ে যায়। অব্যবহার্য মোটর দুটি সেইখানেই পরিত্যাগ ক'রে এরা রেশন ভিক্ষা করতে করতে এই পর্যন্ত এসে পৌচেছে।

আমরা পাঁচজনে মিলে পরামর্শ করতে লাগলাম, এদের দেশে ফিরে যাবার কি উপায় করা যেতে পারে। খবর নিয়ে জানলাম যে মান্দালয় থেকে মনুয়া পর্যন্ত যাবার রেলপথ আছে। ট্রেণে চড়ে সেখানে পৌছতে পারলে তখন সেখান থেকে নৌকো পাওয়া যাবে। চিন্দুইন নদী বেয়ে কালেবা পার হ'যে চিগনে পৌছতে ওদের পনেরো কুড়ি দিন সময় লাগবে। চিগন থেকে গরুর গাড়ি নিয়ে টামু পর্যন্ত যেতে পারলে ওরা ভারতের মণিপুর রাজ্যের সীমায় গিয়ে উপস্থিত হবে। সুতরাং আপাতত যদি ট্রেণে চড়িয়ে ওদের মনুয়া পর্যন্ত পৌছে দেবার উপায় করা যায় তাহ'লেই অনেকটা সাহায্য করা হবে।

আমি, দাদা, আর ক্যাপ্টেন সিং, তিনজনে মিলে মান্দালয় স্টেশনে গিয়ে ওদের ট্রেণে উঠিয়ে দেবার জন্যে বিস্তর চেষ্টা করলাম, এমন কি স্টেশনের কর্মচারীদের ঘুষ পর্যন্ত দিতে চাইলাম। কিন্তু মিলিটারি পোষাক পরা থাকলে কি

হয়, তবুও আমরা সেই কালো চামড়ার লোক, আমাদের কথা কেউ গ্রাহ্যই করে না। তারা বললে, ট্রেণে এখন কালা আদমির কোনো স্থান হবে না, আরো অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের চোখের সামনে একটা ট্রেণ ছেড়ে চলে গেল, সেদিন আর কোনো ট্রেণ নেই। ওদের স্টেশনে বসিয়ে রেখে অনন্যোপায় হ'য়ে আমরা আমাদের অফিসার-কম্যাণ্ডিংকে গিয়ে বললাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সঙ্গে একজন ইংরেজ অফিসারকে পাঠিয়ে দিলেন। তাকে বলে দিলেন,—হাতে বিভলভার নিয়ে যাও, যে গাড়ি দেখবে সেই গাড়িতেই ওদের জোর ক'রে তুলে দেবে, যদি কেউ বাধা দিতে আসে তাকে শুট্ করবে। ইংরেজ অফিসারকে দেখেই স্টেশনের কর্মচারীরা একেবারে তটস্থ। স্টেশনের কাছে একখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেখানা অনেক মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে মন্তয়াতে। আমাদের অফিসারের আদেশে তারই একখানা ওযাগন থেকে মালপত্র কতক নামিয়ে ওদের জন্যে জায়গা ক'রে দেওয়া হোলো। ওদের সেই গাড়িতে তুলে দিয়ে আমরা কিছু টাকা দিতে গেলুম, কিন্তু টাকা ওরা কিছুতে নিলে না। ভট্টাচার্য ভদ্রলোকটি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন,—টাকাই আমার সবনাশ করেছে মশাই, আর টাকা দেবেন না। অনেক টাকা উপার্জন করেছি, এখনও সঙ্গে চার পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে। মেয়েদের গায়েও গয়না রয়েছে, সেইজন্যেই তো আমার ভয়। দেশে যদি কখনো পৌছতে পারি, আপনাদের উপকার কোনো দিন ভুলবো না। মিলিটারি লোকেরা যে এত পরোপকার করে এ ধারণা আমার ছিল না।

কিছুদিন কাটতে না কাটতেই মান্দালয়ে দারুণ বোমার আক্রমণ শুরু হোলো। আমরা ভেবেছিলাম যে জাপানীরা বৌদ্ধ, অতএব এই প্রাচীন বৌদ্ধ-রাজ্যের রাজধানীটার ফায়াগুলোকে অন্তত ওরা বাঁচিয়ে আঘাত করবে, কিন্তু দেখলাম ওদের সে সব কুসংস্কার নেই। বড় বড় ফায়া আর রাজপ্রাসাদগুলো সমস্তই ভেঙে পড়লো, দেখতে দেখতে শহরটা ভস্মীভূত হ'য়ে গেল। আমরা অনেক দূর থেকে এই অগ্নিকাণ্ড দেখলাম।

যুদ্ধ আমাদের আরো কাছে এসে পড়লো, আমাদের সৈন্যদলের রীতিমত কার্যকলাপ তখন শুরু হ'য়ে গেল। এতদিন পর্যন্ত যা কৃত্রিম শিক্ষার বিষয় ছিল এখন তা হ'য়ে উঠলো অকৃত্রিম। এখন থেকে চলতে থাকলো সত্যিকার প্যারেড, সত্যিকার গুলি মারা, সত্যিকার আক্রমণ। শত্রুকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু বজ্রনিনাদকে লাঞ্ছিত ক'রে দেবার মতো প্রচণ্ড কামান গর্জনের দ্বারা মাটি কাঁপিয়ে তার আগমনবার্তা ঘোষিত হয়, আর আমাদের সৈন্যদল তখনই তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে থাকে। মুহুর্মুহু দূরপাল্লার কামানের শব্দে, মেশিনগানের শব্দে, মর্টার শেল ফাটার শব্দে, বিমান থেকে উপর্যুপরি বোমা ফাটার শব্দে কান বধির হ'যে যায়। বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ ক'রে ওঠে, পায়ের তলা পর্যন্ত হিম হ'য়ে যায়, মুখের হাসি মিলিয়ে যায। কোনো কাজ করতে গেলে হাত পা কাঁপে, কোনোমতে নিজের ডিউটিতে হাজির হ'য়ে কাঠের মতো শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তবু তো আমরা অনেক পিছনে থাকি, গুলির নাগাল সীমার বাইরে। শব্দটা আমাদের কানে অনেক মৃদু হ'য়েই আসে। তাতেও দেখতে পাই সকলেই যেন ভীত, সন্ত্রস্ত। সন্ধ্যার পরে যখন যুদ্ধটা থেমে যায় তখন সকলে হাঁপ ছেড়ে ভাবে আজকের দিনটা বাঁচলাম,—আবার ভোর না হ'তেই মৃত্যুভীতি শুরু হয়।

প্রায়ই আমরা পিছু হটতে থাকি। শত্রুপক্ষের আক্রমণ যতই তীব্র হ'তে থাকে ততই আমরা পিছু হটতে বাধ্য হই। প্রত্যহই যে আমরা পিছু হটে যাই তা নয়। কোনো কোনো দিন এমনও হয় যে আমরা খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে গেলাম, শত্রুপক্ষ পিছিয়ে গেল,—কিন্তু সে খুব কম। সৈন্যদের মুখে শুনতে পাই শত্রুর সৈন্যসংখ্যা আর যুদ্ধ-সরঞ্জাম দুইই অনেক বেশি। তারা মরিয়া হ'যে লড়ছে।

আমার এখন প্রধান কাজ হচ্ছে ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের ডিউটি করা। স্ট্রেচার-বাহীদের নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়, যেখানে কিছুক্ষণ পূর্বে মর্টার কিংবা মেশিনগানের একচোট আক্রমণ হ'য়ে গেছে এবং আমাদের সৈন্যরা হতাহত হ'য়ে

পড়ে আছে, সেখান থেকে তাদের তুলে আনতে হয়। তারপরে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা। শত্রুর গুলির উদ্দিষ্ট স্থানের সীমানার মধ্যে গিয়ে আহতদের তুলে আনা, এটা যে খুব দুঃসাহসের কাজ তাতে সন্দেহ নেই। যুদ্ধটা আপাতত থেমে গেলেও কে জানে শত্রুপক্ষ এখনও ওৎ পেতে আছে কিনা, আমাদের স্ট্রেচার প্রভৃতি দেখলে বিনা দ্বিধায় আবার গুলি ছুড়বে কিনা। যুদ্ধক্ষেত্রে উচিত অনুচিতের কোনো বিচার নেই। আর সকলের চেয়ে বেশি ভয় চোরা স্নাইপারদের গুলিকে। তারা যুদ্ধ-সীমার থেকে অনেক দূরে এসে গাছের ওপর উঠে ঝোপের আড়ালে তাক বুঝে লুকিয়ে থাকে, আমাদের পক্ষের লোক দেখলেই তারা গুলি করে। স্নাইপারদের নিশানা একেবারে অব্যর্থ। একবার তাড়া খেয়ে ট্রেঞ্চের মধ্যে একজন সৈনিক লুকিয়েছিল, তার পা-টি শুধু দেখা যাচ্ছিল, স্নাইপারের গুলিতে সেই পা-খানি উড়ে গেল। একবার চক্রবর্তী আহতদের আনতে আনতে এই স্নাইপারদের পাল্লায় পড়েছিল, তাদের গুলিতে অনেকগুলো আহত সৈনিক আর স্ট্রেচারবাহী পটাপট্ খতম হ'য়ে যায়, চক্রবর্তী কোনো রকমে নিজের প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে আসে। সেই থেকে চক্রবর্তী আর এ-কাজে সহজে অগ্রসর হ'তে চায় না, যুদ্ধ থেমে যাবার অনেক পরে যায়। যদি কেউ কিছু বলে, এই ভয়ে সে আগের থেকেই খানিকটা দূর পর্যন্ত সাহস ক'রে এগিয়ে চলে যায়, তারপরে স্ট্রেচারবাহীদের এগিয়ে দিয়ে নিজে কোনো ট্রেঞ্চের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

দাদা ওকে অনেক সাহস দেন। বলেন,—ওরে ভাই, বাঁচবার জন্যে এত ভেবে মরিস কেন? নিউর্যাস্থিনিয়ার রোগীরা যেমন বাঁচবার জন্যে ভেবে ভেবেই মরে অথচ বেঁচেও থাকে, তুইও যে তাই করলি। তোর শুধু বেঁচে থাকবার জন্যে এতটা সন্ত্রস্ত হ'য়ে বেড়াবারও দরকার নেই, এত রকম লুকোচুরি করবারও দরকার নেই। একবার ভয়টা ছেড়ে দিয়ে দেখ, তবুও তুই এমনি খাসা বেঁচে থাকবি। জ্যান্ত থাকাটা অতি সহজ ব্যাপার, তার জন্যে এত বুদ্ধি খরচ করতে যাবি কেন? তোর চেয়ে কত বোকা লোকেরাও দিব্যি কেমন জ্যান্ত রয়েছে, এত

দেখছিস তবুও বুঝতে পারছিস না ? ওরে বোকা, পৃথিবীটা ভয় পাবার মতো এত মারাত্মক জায়গা নয়, এখানে সমস্তই খুব সোজা। তার মধ্যে বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া এই দুটো জিনিস একেবারে সকলের চেয়ে সোজা, কারণ ঐ দুটিতে আমাদের নিজেদের কোনো হাত নেই। মরবার যদি বরাত না থাকে তাহ'লে কিছুতেই তুই মরবি না।

তবু চক্রবর্তীর ভয় ঘোচে না। মর্টারের শব্দ শুনলেই আতঙ্কে চক্রবর্তীর মুখ চূণ হ'য়ে যায়। দাদা তখন ঠাট্টা শুরু করেন। আমাদের ডেকে বলেন,—ওরে, আজ একটা নতুন খবর আছে জানিস ? চক্রবর্তীর আজ একখানা চিঠি এসেছে বৌমার কাছ থেকে। বৌমা লিখেছে,—তুমি বর্মা মুল্লুকে গেছ শুনে খুব খুশি হয়েছি, ও দেশে ভালো ভালো বর্মী শাড়ি কিনতে পাওয়া যায়, আমার জন্যে একটা খুব ভালো শাড়ি এনো। চক্রবর্তী তার কি জবাব দিয়েছে জানিস ? ও লিখেছে,—শাড়ি আর তোমাকে পরতে হবে না, জাপানীরা যে মর্টার ছোটাচ্ছে তাতে দুদিনের মধ্যেই তুমি নির্ঘাত বিধবা হবে, এবার থেকে থান পরবার দরকার হবে। সেইজন্যে আগের থেকেই তোমার জন্যে ভালো ভালো বর্মী থান কিনে রাখলাম, নিজে না নিয়ে যেতে পারলেও সুবিধা মতন পাঠিয়ে দেবো।

চক্রবর্তীকে আমরা সকলেই বিদ্রূপ করতাম, সে বেচারা চুপ ক'রে থাকতো। ইদানিং গুণ্‌গুণ্‌ ক'রে গান করা ওর ঘুচে গেল। আমাদেরও প্রাণে অবশ্য যথেষ্টই ভয় ছিল। মাঝে মাঝে যে সব বীভৎস দৃশ্য দেখতাম তাতে আমাদের অন্তরাত্মা শিউরে উঠতো। এক একদিন গুলিগোলার শব্দ থেমে যাবার পরে আহতদের আনতে গিয়ে দেখতাম, মাঠে কাটা ধান যেমন ভাবে পড়ে থাকে, মৃত সৈন্যেরা ঠিক তেমনিভাবে সারে সারে পড়ে আছে, ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একজনও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু বীভৎস দৃশ্যও যখন গতানুগতিক হ'য়ে যায় তখন তার বীভৎসতা আর থাকে না। অনভ্যাসে যাতে আমরা অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে উঠি, অভ্যাস হ'য়ে গেলে তাতে আমাদের মনকে ততটা বিচলিত

করতে পারে না। শ্মশানঘাটে মুর্দাফরাশেরা অনবরতই মড়া পুড়িয়ে যায়, তাতে কি তারা একটুও বিচলিত হয়?

দাদার সাহস কিন্তু আমাদের সকলের চেয়েই বেশি। তিনি অবলীলাক্রমে সব কাজে এগিয়ে যান, যারা ভয় পাচ্ছে তাদের সাহস দেন, যারা কাঁদছে তাদের কান্নাকে বোকামি ব'লে ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দেন। যে সব স্ট্রেচারবাহী আগে যেতে চায় না তাদের বলেন—তোরা আমার পিছু পিছু আয়, আমি যাচ্ছি তোদের আগে আগে। দাদা আহত রোগীদের মনে দেন অভয়, যন্ত্রনা তাদের কিছুতেই পেতে দেন না, কষ্ট হচ্ছে দেখলেই মর্ফিয়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন। দাদাকে দেখলে আর তাঁর কথাবার্তা শুনলে সকলেই আশ্বস্ত হয়, সকলেরই মন থেকে অন্তত কিছুকালের জন্যে সমস্ত ভয় ভাবনা দূর হ'য়ে যায়।

একদিন দাদারও একটা খুব কঠোর পরীক্ষা হ'য়ে গেল। একটা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল জায়গায় এগিয়ে গিয়ে কতকগুলো সৈন্য আহত হ'য়ে আটকে পড়েছিল, আমাদের অফিসার-কম্যাণ্ডিং বললেন যে এখনই ওদের উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসা দরকার। ওদের কাছে আর গুলিবারুদ নেই, দেরী করলে আবার শত্রুপক্ষের গুলি ছুটবে, ওদের একজনও জীবন্ত অবস্থায় ফিরবে না। তখনও যুদ্ধটা ঠিক থামেনি, সুতরাং আমাদের সেখানে যেতে তখন বাধ্য করা চলে না, কিন্তু তিনি কাতরভাবে অনুরোধ ক'রে বললেন যে একটু সাহস ক'রে যদি কেউ যেতে পারে তাহ'লে অনেকগুলো লোকের প্রাণরক্ষা হয়। শুনেই দাদা বললেন,—আমি যাবো। তাঁর নিজের অধীনস্থ কতকগুলি স্ট্রেচারবাহীকে তিনি নিজের মতোই কতকটা অসমসাহসিক তৈরী ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি একলা সেখানে বেশি কিছু করতে পারবেন না, আমাদের মধ্যে আরো একজন সঙ্গে গেলে ভালো হয়। ডাক্তারদের মধ্যে আর কেউই যখন যেতে স্বীকার হোলোনা, তখন আমি বললাম, আমি যাচ্ছি। দুজনে মিলে লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছবামাত্রই আবার নতুন উদ্যমে শত্রুর গুলিবৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেল। তাড়াতাড়ি আমরা সদলবলে কয়েকটা ট্রেঞ্চের মধ্যে মাথা গুঁজে আশ্রয় নিলাম। গুলির শব্দ একবার

থামবামাত্রই আমরা কালবিলম্ব না ক'রে যতগুলোকে পারলাম তুলে নিয়ে সরে পড়লাম। এক একটা স্ট্রেচারে দুটো তিনটে ক'রে লোক বোঝাই ক'রে নিলাম। ফেরবার সময় আরো মুশকিল, গাছে গাছে মারাত্মক স্নাইপার লুকিয়ে আছে। খুব সাবধানে ঝোপজঙ্গলের আড়ালে গুড়ি মেরে নিঃসাড়ে গা ঢাকা দিয়ে আমরা কোনোমতে অক্ষতদেহে পালিয়ে এলাম। যখন একটু ফাঁকায় এসেছি তখন একটা স্নাইপারের গুলি ছুটে এলো, কিন্তু সেটা কারো গায়ে লাগলো না। ছুটতে ছুটতে আমরা নিরাপদ স্থানে এসে হাঁপ ছাড়লাম। অনেকগুলি জীবন রক্ষা পেলো দেখে অফিসার-কমাণ্ডিং দাদার পিঠ ঠুকে বললে,—ক্যাপ্টেন দাদা, আজ যে অসমসাহসিক কাজটা করলে এর জন্যে তুমি এম্. সি. (মিলিটারি ক্রস্) পাবে, আজই আমার ডেস্প্যাচে আমি লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দাদা বললেন,—না না, আমি কেবল সঙ্গে ছিলাম মাত্র। যা কিছু বাহাদুরির কাজ করেছে ক্যাপ্টেন চৌধুরী, এম্. সি. পাবার যদি কেউ উপযুক্ত হয় তবে সে ওই। অফিসার-কমাণ্ডিং বললে,—তাই নাকি, তবে উনি নিশ্চয় এম্. সি. পাবেন, যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করতে আমরা কখনই কৃপনতা করবো না।

আড়ালে গিয়ে দাদাকে বললাম,—দাদা, এটা তোমার কি কাণ্ড হোলো? সবই করলে তুমি, অথচ তার পুরস্কার পাবো আমি? দাদা বললেন,—তুই নেহাৎ গাড়োল, কিছুমাত্র বুদ্ধি নেই। আমার কি আর দ্বিতীয়পক্ষ হবে রে বাঁদর, যে তার গলায় এম্. সি.-টা নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে দেবো? এই বুড়ো বয়সে কেউ আর আমাকে মেয়ে দেবে না। তার চেয়ে ওটা নিয়ে গিয়ে তুই বৌমাকে দিস, বৌমা হারের সঙ্গে লকেট্ ক'রে রাখবে। ঐ থাকলো আমার স্যুভেনীর। সেদিন যা বলে দিয়েছি মনে আছে তো? বৌমাকে অবিশ্বাস যদি কখনো করিস্ ওটা দেখলেই সেটা মন থেকে ঘুচে যাবে।

দাদার ঐ কথায় মীরা আর চম্পকী দুজনকেই আমার মনে পড়ে গেল।

দাদা আমার সেদিনের কথাটি ঠিক মনে ক'রে রেখে দিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত ভোলেন নি। কিন্তু দাদা তো জানেন না যে চম্পকীকে আমি যে অবিশ্বাস করি

সেটা একেবারে চিরস্থায়ী, কোনো কিছুতেই সেটা ঘুচতে পারে না। মীরাকেই আমি ঠিকমতো এখনো বিশ্বাস করতে পারি না, যদিও তাকে বিশ্বাস করবার জন্যে আমার একান্ত কামনা। দাদার সুভেনীর সেখানেই বরং কিছু কাজে লাগতে পারে। দুজনকেই আমি অবিশ্বাস করি, কিন্তু তবু দুইএর মধ্যে অনেকখানি তফাৎ আছে। একজন আমাকে কখনো ভালোবাসতেও পারেনি, আর ভালোবাসা আদায় করতেও পারেনি। তার প্রতি আমার যে অবিশ্বাস সেটা দূর করবার জন্যে আমার নিজের কোনোই আগ্রহ নেই। কিন্তু মীরা আমাকে ভালোবেসেছে এবং ভালোবাসিয়েছে। তাই তার সম্বন্ধে আমি অনেক আশা রাখি, অবিশ্বাসের কারণ কিছু থাকলেও সেটা অগ্রাহ্য করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করি। দাদার দেওয়া এম্. সি. আমার স্ত্রীর কাছে থেকে কোনো লাভ নেই, ওটা অবশ্য মীরার কাছেই থাকবে। মীরার হাতের চিঠি অনেকদিন পাইনি। এখন আমার সম্বন্ধে তার মনোভাবটা কেমন তা কে জানে? চিঠিতে লোকে কতই কিছু লেখে। আমার প্রতি তার ভালোবাসা আছে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন তার প্রকৃতি, কতখানি পর্যন্ত তার দৌড়, তার স্রোতধারা শেষ পর্যন্ত সাগরগামী হবে, না অর্ধপথেই থেমে যাবে তা কে জানে? মনে মনে আমার নানারকমের প্রশ্ন জাগে।

যুদ্ধ করতে করতে আমরা ক্রমশ আরো পিছু হটতে লাগলাম। যুদ্ধে হারজিত অবশ্যই আছে। কিন্তু পিছু হটে যাওয়া মাত্রই পরাজয় নয়। একটা দল যখন পিছু হটছে তখন অন্য দল হয়তো অন্যস্থানে শত্রুকে পিছু হটিয়ে দিচ্ছে। আজকালকার যুদ্ধ আগেকার মতো তেমন সমবেত যুদ্ধ নয়, যে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী অপর বাহিনীর সম্মুখীন হবে, আর এক একটা যুদ্ধেই হারজিতের চরম মীমাংসা হ'য়ে যাবে। এখনকার যুদ্ধ অনেকটা খণ্ডযুদ্ধের মতো। একটা সৈন্যদল সুবিধা পেলেই শত্রুর একটা সৈন্যদলকে চারদিক থেকে ঘেরাও ক'রে

ফেলে। সেই দলটি যদি ব্যূহভেদ করতে পারে তো পালিয়ে যায়, নতুবা শেষ পর্যন্ত বেয়োনেটের খোঁচা খেয়ে মরবার আগে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। এমনি ভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকে, যে দল যখন সুযোগ পায় সেই দল তখন জেতে। যারা পিছিয়ে যাচ্ছে তারা যে পরাভূত হ'য়ে গেল এমন নয়, তারা পিছিয়ে গিয়ে আবার শক্তি সঞ্চয় ক'রে নিয়ে পুনরাক্রমন ক'রে নিজেদের স্থান পুনরধিকার ক'রে নিতে পারে। এইজন্যে আজকালকার যুদ্ধ এত দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। কে হারছে আর কে জিতছে, শেষ মীমাংসার আগে পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না।

যুদ্ধের রীতি আমরা অনেকটা বুঝে নিয়েছিলাম, সুতরাং পিছু হটতে থাকার দরুণ আমরা বিশেষ হতাশাগ্রস্ত হইনি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আমাদের অবস্থা হ'য়ে উঠলো দারুণ শোচনীয়। খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহের আর তেমন সুবিধা নেই, যেমন-তেমন খাদ্য খেয়ে আমাদের কাটাতে হয়। টাট্‌কা জিনিস কিছুই পাইনা, যা কিছু পাই তা টিনে ভরা অখাদ্য। সব চেয়ে বেশি কষ্ট, স্নান করবার জল পাইনা, দশ পনেরো দিন একাদিক্রমে অস্নাত অধৌত অবস্থায় কাটিয়ে দিতে হয়। আমার মনে আছে, যেদিন প্রথম চিন্দুইন নদীর ধারে উপস্থিত হলাম, সেদিন একটু স্নান ক'রে কতটা আরাম পেলাম। সে নদীতে অত্যন্ত স্রোত আর অনেক হিংস্র জন্তুও আছে, সেইজন্যে জলে নামা নিষিদ্ধ, কিন্তু জলের ধারে বসে মগে ক'রে জল তুলে স্নান ক'রে তাতেই কত আরাম।

রাত্রে স্থানে স্থানে আমরা বিশ্রাম করি, কিন্তু তাঁবু খাটাবার অবসর নেই। ছয় ফুট গভীর খোলা ট্রেঞ্চে শুয়েই সারা রাত কাটাতে হয়। সঙ্গে থাকে মাটিতে পাতবার একটি গ্রাউণ্ড-শীট, দুটি কম্বল, আর একটি মশারি। ঐ মশারির চালটাই মাথার ওপরে যা কিছু আচ্ছাদন। কোথাও কোথাও এমন শীত যে দুখানি কম্বলে মোটেই সে শীত ভাঙে না, মাটিতে পাতবার আস্তরণটা তুলে নিয়ে তার ওপরে চাপা দিতে হয়। যুদ্ধের মধ্যে নাওয়া খাওয়া আর ঘুমের কষ্টগুলোই সব চেয়ে সাংঘাতিক। এ কষ্ট একাদিক্রমে বেশিদিন সহ্য করা যায় না। কিন্তু সহ্য না ক'রেই বা আর উপায় কি?

আমরা হেরে যাচ্ছি বলেই যে আমাদের এত কষ্ট, আর জাপানীরা জিতছে বলে তাদের কোনো কষ্টই হচ্ছে না, এ কথা মনে করাই ভুল। জাপানীদের কষ্ট বরং আমাদের চেয়ে আরো বেশি। এই যুদ্ধটাকে যতই যান্ত্রিক যুদ্ধ বলা হোক না কেন, তবুও এটা মানুষে মানুষেই যুদ্ধ। অবশ্য দুই পক্ষের মানুষগুলো স্বতন্ত্র রকমের আদর্শ অনুসারে স্বতন্ত্র রকম শিক্ষায় শিক্ষিত। আমরা শিখেছি শৃঙ্খলা মেনে চলতে, অধ্যক্ষের হুকুম মেনে চলতে, যথাসম্ভব নিজেদের কর্তব্য পালন করতে। আমরা যে কষ্টসহিষ্ণুতা শিখেছি তাতে কর্তব্যসীমা লঙ্ঘন করতে হয় না। কিন্তু ওরা শিখেছে অসমসাহসিকতা, অসাধ্যসাধন, নিজেদের শরীর সম্বন্ধে অনিয়ম ও অত্যাচারে ওরা অনেকটা অভ্যস্ত, শেষ পর্যন্ত যাতে আত্মহত্যা করতে পারে তাও নাকি ওদের শিক্ষা দেওয়া আছে। আমাদের পক্ষ হেরে গেলেও তবু পিছনে একটা আশ্রয় নেবার ভূমি আছে, কিন্তু ওদের পিছনে রয়েছে অনন্ত মহাসমুদ্র, পিছু হটলেই ওদের মরতে হবে। বারে বারে খাদ্য সরবরাহ পাবার ওদের কোনো সুবিধা নেই, একবার সরবরাহ পেলে তাই নিয়েই ওদের কিছুদিন চালিয়ে দিতে হয়। আমাদের মতো ওদের পোষাকও নেই, হাল্কা পোষাকে হাল্কা রকমের হাতিয়ার নিয়েই লড়তে হয়। এই সমস্ত অসুবিধার বিষয়ে অভ্যস্ত হ'য়েই ওরা যুদ্ধে নেমেছে, মরিয়া হবার মন্ত্রও হয়তো ওরা শিখে এসেছে,—কিন্তু তবুও ওরা সেই মানুষ। কষ্ট যে ওরাও যথেষ্ট পাচ্ছিল সেটা আমরা ক্রমশ জানতে পারলাম।

আমরা দেখলাম যে ওদের কোনো একটা দল আমাদের কাছে হেরে গেলে ওদের মৃত কিংবা আহত সৈন্যদের ফেলে রেখেই সবাই পালিয়ে যায়, তাদের উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাবার জন্যে প্রায়ই কোনো চেষ্টা করে না। আহতদের মধ্যে যারা সচল থাকে তারা কোনোক্রমে নিজের চেষ্টাতেই নিজের দলে ফিরে যায়, আর যারা অচল তারা যেখানে পড়ে আছে সেখানেই পড়ে থাকে, অনাহারে অযত্নে তাদের নিতান্ত শোচনীয় ভাবে মৃত্যু ঘটে।

একদিন একটা বনের ভেতর দিয়ে স্ট্রেচার নিয়ে যেতে যেতে আমরা দেখলাম

সেখানে একজন জাপানী সৈনিক বসে আছে, সে দূর থেকে হাত তুলে আমাদের ইসারা ক'রে ডাকছে। কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে তার পা দুখানি দেখালে। দুই পায়েই গুলি খেয়ে হাড়গুলো ভেঙে গেছে, সে একেবারে চলৎশক্তি রহিত। ইংরেজী কথা বেশ বলতে পারে, সে আমাদের সম্বোধন ক'রে বললে,—কোনোরকমে বনের মধ্যে ঢুকে সাতদিন লুকিয়ে রয়েছি, কিছুই খেতে পাইনি। সঙ্গে যে জলটুকু ছিল তাও ফুরিয়ে গেছে। আমাকে তোমাদের বন্দী ক'রে নিয়ে চলো, আগে একটু জল খেতে দাও। জল না পেলে আমি মরে যাবো।

তাকে স্ট্রেচারে তুলে আমাদের শিবিরে নিয়ে গেলাম। পূরো দু বোতল জল খেয়ে তার মুখে হাসি দেখা দিল। আমাদের দিকে চেয়ে তখন বললে,—এইবার একটা সিগারেট যদি খেতে দাও, সাতদিন সিগারেট খেতে পাইনি।

আমরা সিগারেট দিতে একটু ইতস্তত করছিলাম, আমাদের অফিসার-কম্যাণ্ডিং তৎক্ষণাৎ নিজের পকেট থেকে সিগারেট কেস্ বের ক'রে তার সুমুখে ধরলে। ধন্যবাদ দিয়ে সে একটি সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে মহা আরামে ধূমপান করতে লাগলো।

আমাদের অফিসার-কম্যাণ্ডিং তাকে জিজ্ঞাসা করলে,—আমরা যদি তোমাকে তোমার দলে পৌঁছে দিতে পারি তাহ'লে ফিরে যেতে এখন ইচ্ছা করো কি?

সে হাসতে হাসতে নিজের পা দুখানা দেখিয়ে দিলে।

আমি বললাম,—পা দুটো অত্যন্ত সেপ্‌টিক হ'য়ে উঠেছে, এখনই অ্যাম্পুটেশন ক'রে ফেলা দরকার, ও পা আর বাঁচানোর কোনো উপায় নেই।

অফিসার-কম্যাণ্ডিং বললে,—আচ্ছা মনে করো, আমাদের হাসপাতালে থেকে চিকিৎসার পরে যখন তুমি সেরে উঠবে, তখন তোমার দেশে আবার ফিরে যেতে চাইবে তো?

সে একমুখ হেসে বললে,—ফিরে গিয়ে কি লাভ আছে, আমি আর দেশের

কোন কাজে লাগবো ? তার চেয়ে তোমাদের কাছে বন্দী হ'য়ে থাকলেও আমার লাভ আছে। তোমাদের ব্যবহার খুব ভালো, তোমাদের সিগারেট-গুলোও খুব ভালো, বেশ ফ্লেভার আছে। এগুলো বুঝি আমেরিকান সিগারেট, না ইংলিশ ?

জাপানীদের হাসিমুখ বড়ো মজার দেখতে, সমস্ত মুখখানা দিয়ে ওরা হাসে। ভালো কিংবা মন্দ, প্রত্যেক কথাতেই ওদের এই রকমের অদ্ভুত হাসি।

এই এক জীবিত জাপানী সৈনিককে আমি দেখেছি। বড়ো হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবার স্নবিধা হয়নি ব'লে ওকে আমাদের চিকিৎসাতেই রাখতে হয়েছিল। ওর সঙ্গে অনেক রকমের কথা বলে দেখেছি, অনেক রকমের প্রশ্ন ক'রে দেখেছি। তাতে এইটুকু বুঝেছি যে ওরাও আমাদেরই মতো দুর্বলচিত্ত মানুষ, ওরাও কষ্টকে ভয় পায়, মায়া-মমতা আর স্নেহ-ভালোবাসা ওদের মধ্যেও যথেষ্ট আছে। সবই ঠিক আমাদের মতো, তা ছাড়া অধিকন্তু যা কিছু করে সেটা নিতান্ত ঝোঁকের মাথায়। বিচারবিহীন ভাবপ্রবণতা ওদের আমাদের চেয়েও বেশি, ওদের অসমসাহসিক হবার সেইটেই এক প্রধান কারণ।

জাপানীদের মৃতদেহও আমি অনেক দেখেছি। চিন্দুইনের স্রোতে প্রায়ই দু চারটে ভেসে আসতো, পচে গিয়ে ফুলে বিকটাকার হ'য়ে আমাদের ছাউনির কাছে এসে লাগতো। ও রকম পচা মড়া জলের ওপর ভাসতে দেওয়া আমাদের সৈনিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর, বিশেষত তারা যখন ঐ জল ব্যবহার করে। আমরা সেগুলোকে উঠিয়ে এনে গর্ত কাটিয়ে পুঁতে ফেলবার ব্যবস্থা করতাম, কিন্তু আমাদের সৈনিকরা মড়া ছুঁতে কেউ রাজি নয়। জীবন্ত মানুষকে মারতে কোনো ভয় নেই, কিন্তু মরে যাবার পরে তার মৃতদেহটা ছুঁতে বড়ো ভয়। অগত্যা আমি আর দাদা সেগুলোকে জল থেকে টেনে এনে সৎকারের উদাহরণ দেখাতাম। ক্যাপ্টেন পিলাই এবং চক্রবর্তীও আমাদের কাজে সহায়তা করতো, কিন্তু ক্যাপ্টেন সিং বরাবর তফাতে থাকতো।

চক্রবর্তীর ইদানিং খুব সাহস বেড়ে গিয়েছিল। সে ক্রমে ক্রমে এইটুকু বুঝে

নিয়েছিল যে অ্যাম্বুল্যান্স কিংবা হস্‌পিট্যাল-ইউনিটের ওপরে গুলি নিক্ষেপ করা যুদ্ধের আইনবহির্ভূত, সুতরাং যেখানে রেড্-ক্রসের নিশানা উড়ছে সেখানে যারা আছে তাদের সহজে প্রাণহানির কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য হঠাৎ গুলি ছুটে এলে কিংবা বোমা ফাটলে কি হয় কিছুই বলা যায় না, কিন্তু তবু অন্যান্য লোকদের চেয়ে ডাক্তাররা অনেকটা নিরাপদ। এমন কি শত্রুপক্ষ এসে আমাদের সেনাদের ঘেরাও ক'রে ফেললেও ডাক্তারদের কিছু অনিষ্ট করবে না। এই সাহসে চক্রবর্তী আজকাল খুব ফূর্তিতে থাকে। দূরে মেশিনগান ছুটলে আজকাল ভয় না পেয়ে গান গাইতে শুরু ক'রে দেয়,—'নূপুর বেজে যায় রিনি রিনি, আমার মন কয় চিনি চিনি'—।

আমরা যখন ব্রহ্মদেশের প্রায় সীমান্তে এসে পৌছেচি তখন আমাদের সৈন্য-দলের মধ্যে আমাশা রোগের এপিডেমিক শুরু হ'য়ে গেল, সেই সঙ্গে অনেকের মারাত্মক রকমের ম্যালেরিয়াও হ'তে লাগলো। ওষুধ যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও এই সব রোগে বড়ো ভুগতে হয়, মানুষকে এতে অত্যন্ত কাবু ক'রে ফেলে। একবার আমাকেও আমাশা ধরলো, তাতে শরীরটাকে নিতান্তই দুর্বল ক'রে ফেললো। অখাদ্য খেয়ে খেয়ে আগেই অনেকটা অসুস্থ হয়েছিলাম, তার ওপরে এই রোগের আক্রমণে আমি নিস্তেজ হ'য়ে পড়লাম। কয়েকদিন শয্যাগত রইলাম। আবার উঠে কাজে হাজির হ'তে হোলো, কারণ এ সময়ে বসে থাকাও অন্যায়।

একদিন আমাদের সৈন্যেরা শত্রুপক্ষের একটা দলকে আক্রমণ ক'রে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল, তারা কিছুমাত্র প্রতিরোধ না ক'রেই পালিয়ে যায়। আমাদের সৈন্যেরা মনে করলে জিতেছি, তারা পূর্ব ঘাঁটি থেকে খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে রইল। কিন্তু শত্রুপক্ষের এটা চালাকি। আমাদের দলটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবার সুযোগের জন্যেই এই উপায় তারা অবলম্বন করেছিল। পরের দিন সকালে দেখা গেল যে আমাদের পিছন দিক থেকে অতি নিকটে এসে প্রায় তারা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। একদিকে অল্প একটু ফাঁক পেয়ে আমাদের সৈন্যেরা পালিয়ে

গিয়ে নিজেদের প্রাণরক্ষা করলে, কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্স ও বড়ো বড়ো হাসপাতালের গাড়ি নিয়ে আমরা পালাতে পারলাম না, সেখানেই থেকে গেলাম। দাদা বললেন যে বন্দী হ'লেও আমাদের বিশেষ উদ্বেগের কোনো কারণ নেই, আমরা যে ক'জন আছি সকলেই ডাক্তারি বিভাগের লোক, আমাদের কাছে কোনো হাতিয়ার নেই। দেখেশুনে হয়তো আমাদের ছেড়েও দিতে পারে।

জাপানীরা এসে আমাদের বন্দী করলে, নিয়ে গেল তাদের ক্যাপ্টেনের কাছে। ক্যাপ্টেন মহা আড়ম্বরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ নিজের কোমর থেকে একটা লম্বা সামুরাই তরোয়াল কোষমুক্ত ক'রে আমাদের মাথায় ঠেকিয়ে দিলে, অর্থাৎ আমরা রীতিমত বন্দী সাব্যস্ত হ'য়ে গেলাম। জাপানীদের বন্দী করবারও অনেক রকম আদবকায়দা আছে। বন্দী করবার পরেই সে আমাদের হাসপাতাল দেখতে চাইলে। হাসপাতালে ঢুকে প্রথমেই দামী দামী যন্ত্রপাতিগুলো আত্মসাৎ করলে, তার পরেই হাসপাতালে যে কয়টি রোগী ছিল তাদের গুলি ক'রে মারলে। আমরা প্রতিবাদ করতে গেলে কড়া ভাষায় আমাদের জবাব দিলে যে এরা তেমন মারাত্মক রোগী নয়, সুতরাং এদের শত্রু হিসেবে অনায়াসে মারা যেতে পারে।

আমাদের প্রতি ব্যবহারও ওদের খুব চমৎকার। বন্দী করবার পরেই আমাদের শাসানো হোলো,—তোমাদের সৈন্যেরা কোনদিকে পালিয়েছে দেখিয়ে দাও, নইলে তোমাদেরও গুলি ক'রে মারা হবে।

দাদা কোনো কথা না বলে চুপ ক'রে রইল, আমিও চুপ ক'রে রইলাম, কিন্তু কি জানি কেন চক্রবর্তীর সাহস তখন বেজায় বেড়ে গেছে। সে বললে,—সৈন্যেরা তো আমাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পালায় নি, তারা যেদিকে সুবিধা পেয়েছে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালিয়েছে।

—ও-সব বাজে কথা শুনতে চাই না, যদি দেখাতে পারো তবে প্রাণে বাঁচবে, নইলে তোমাদের সকলকেই গুলি ক'রে মারা হবে।

চক্রবর্তী বললে,—আচ্ছা চলো, যেদিকে পালিয়েছে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।

খানিকটা দূর পর্যন্ত অগ্রসর হ'য়েই চক্রবর্তী একদিকে আঙুল দিয়ে দেখালে। সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করবার জন্যে জাপানীরা সেই দিকে কয়েকটা গুলি ছুড়লে। আশ্চর্যের কথা, সেই দিক থেকে তখনই মেশিনগানের ঘন ঘন প্রত্যুত্তর এলো। বেশ বোঝা গেল ওদিকে আমাদের পক্ষের একটা বিরাট বাহিনী প্রস্তুত হ'য়ে আছে, এইবার তারা আক্রমণ করবে। জাপানী ক্যাপ্টেন তখন আমাদের অগ্রসর ক'রে দিয়ে বললে,—তোমরা আগে আগে যাও, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো।

—তোমরাই এবার যাও না, আমরা কেন যাবো, এখনই যে মেশিনগানের গুলি খেয়ে মরবো।

—সেইজন্যেই তো তোমাদের আগে যেতে বলছি, নিজেদের গুলিতেই তোমরা নিজেরা মরো, আমরা গুলি খরচ ক'রে তোমাদের মারতে চাই না। আগে চলো, নইলে গুলি করতে বাধ্য হবো।

দাঁড়িয়ে থাকলেও মৃত্যু, অগ্রসর হ'লেও মৃত্যু। অগত্যা আমরা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু আশঙ্কা করতে করতে অগ্রসর হ'য়েই যাচ্ছিলাম, কিন্তু বেশি দূর যেতে হোলো না। একটা বনের অন্তরাল থেকে আমাদের বিরাট সৈন্যবাহিনী দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসছে দেখতে পাওয়া গেল। জাপানীরা যখন বুঝতে পারলে যে জয়ের আর কোনো আশা নেই, তখন ওরা নিজেদের প্রাণরক্ষা করবার জন্যে একেবারে খেপে উঠলো। পালিয়ে গেলেই ওদের প্রাণ বাঁচবে, কিন্তু বন্দীদের ছেড়ে পালায় কেমন ক'রে? তখন সেই ক্যাপ্টেন বিনা দ্বিধায় রেড্-ক্রসের ব্যাজ্ পরা আর গলায় স্টেথোস্কোপ ঝোলানো আমাদের পাঁচজন মৃত্যুভীত নিরস্ত্র ডাক্তারকে একটা ট্রেঞ্চের সুমুখে দাঁড় করিয়ে রেখে সৈন্যদের হুকুম দিলে গুলি করতে। আমাদের বললে ফাঁক ফাঁক হ'য়ে চোখ বুজে দাঁড়াতে।

আমরা নিরুপায় হ'য়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক সঙ্গে পাঁচটা গুলি ছুটলো, সঙ্গে সঙ্গে আমরা ট্রেঞ্চের মধ্যে পড়ে গেলাম।

ঘটনাটা এখন যেন একটা ডিটেকটিভের কাহিনীর মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু

তখন মোটেই তেমন মনে হয়নি। পড়ে গিয়েই প্রথমে ভাবলাম যে আমি মরে গেছি। কিন্তু মরে গেলেও কি তার পরে আবার জীবন্তের মতো ভাব যায়? হয়তো যায়, এ সম্বন্ধে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। মৃত্যুর পূর্বের ঘটনাগুলো এমন তাড়াতাড়ি ঘটে গেল, এতই তাড়াতাড়ি মরে যেতে হোলো যে তার আগে একবারও অন্তত মীরার কথাটা স্মরণ করবার অবকাশ আমি পাইনি। ভাবলাম যে মনটা বেঁচে থাকতে থাকতে তার কথাটা একবার ভেবে নিই, এর পরে হয়তো মনেরও অস্তিত্ব থাকবে না। আমার নাবালক ছেলেমেয়ে রইল, আর—আর চম্পকী রইল, তাদের কথাও একবার ভেবে নিই। যতই দুঃখ হোক, এটা অন্তত পক্ষে আমার সান্ত্বনার বিষয় যে তাদের খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না। কত টাকা পেন্‌শন ওরা পাবে? একজন অফিসারের উপযুক্ত পেন্‌শন দেবে, নিতান্ত অল্প হবেনা আশা করি। এম্. সি.-টা ওরা কোথায় পাঠাবে? নিশ্চয় মীরার কাছেই পাঠিয়ে দেবে। যাক্, তবু আমার একটা চিহ্ন ওর কাছে থাকবে। বেচারা,—মীরা, মীরা,—কত কষ্টই ওকে দিয়ে এলাম,—অথচ কায়মনোবাক্যে আমাকেই সে চেয়েছিল, সে আমাকে কতই ভালোবেসেছিল! ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল আমার ছেলেবেলাকার কথা,—সেই ঠাকুরদাদার পাতে বসে মাছের মুড়ো খাওয়া,—সেই ছটু,—সেই বাদ্‌লা—

অনবরত বন্দুক ও কামানগর্জনের শব্দে আর কিছু ভাবা গেল না, শব্দগুলো ক্রমশ নিকটবর্তী হ'য়ে আসছিল। কিন্তু তবু ওর মধ্যেই হঠাৎ একবার ভেবে দেখলুম যে এখনও হয়তো মৃত্যু ঘটেনি, এখনও আমি বেঁচে আছি, নইলে শব্দগুলো এখনও শুনতে পাচ্ছি কেমন ক'রে? একবার পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক বেঁচে আছি কিনা। বুটের ভেতর থেকেই পায়ের আঙুলগুলো একবার নেড়ে দেখলাম, বেশ অনুভব করতে পারলাম সেগুলো নড়ছে। তবে কোথায় আমার আঘাতটা লাগলো, কেমন ক'রে আমি পড়ে গেলাম? যাক্, সে কথা এখন আর জেনে কাজ নেই, চুপচাপ মড়ার মতো পড়ে থাকি, নইলে একটুও

নড়তে দেখলেই ওরা তৎক্ষণাৎ আবার গুলি করবে। একেবারে অসাড়ের মতো পড়ে রইলাম, খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরে গুলিগোলার শব্দগুলো একেবারে থেমে গেল। কারা হারলো এবং কারা জিতলো কিছুই বুঝতে পারলাম না, ট্রেঞ্চের মধ্যে একভাবেই চুপচাপ পড়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে ট্রেঞ্চের ওপর থেকে কে যেন ইংরেজী ভাষায় বললে,—ট্রেঞ্চের ভেতরে কেউ বেঁচে আছো কি? যদি বেঁচে থাকো তো সাড়া দাও।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলে ক্যাপ্টেন পিলাই। সে বললে,—আমি বেঁচে আছি, কিন্তু আমার পায়ে গুলি লেগেছে।

—আচ্ছা সবুর করো, আমরা তোমাকে তুলে আনছি। আর কেউ বেঁচে আছে?

আমি তখন চারিদিকে চেয়ে দেখলাম। আমার পাশাপাশি দাদা, চক্রবর্তী, আর ক্যাপ্টেন সিং তিনজনেই মরে পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে চীৎকার ক'রে আমি বললাম,—আমি অক্ষত হ'য়ে বেঁচে আছি, গুলি আমার গায়ে মোটে লাগেনি। হাতটা ধরলেই আমি ওপরে উঠতে পারবো।

কে একজন আমার হাত ধরে টেনে তুললে। কিন্তু ট্রেঞ্চের ওপরে উঠে দাড়াবামাত্রই আমি কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে গেলাম। তার পরে যে কি হোলো তার কিছুই আমি জানিনা।

মীরার কথা

অমর বাবুর কাছ থেকে সেই যে শেষ চিঠিখানা পেলুম, যাতে উনি লিখেছিলেন ওঁর যুদ্ধযাত্রার কথা, তার পর থেকে ওঁর কোনো খবরই আমি পেলুম না। উপর্যুপরি তিন চার খানা চিঠি লিখলুম মিলিটারি পোষ্ট অফিসের মারফত দিয়ে, তার কোনো জবাবই এলো না। বুঝতে পারলুম যে যুদ্ধের ক্ষেত্রে এমন জায়গায় উনি গিয়ে পড়েছেন যেখানে চিঠি পাবার কিংবা দেবার কোনোই উপায় নেই।

নতুন চিঠি যখন আর একখানিও এলো না, তখন ওঁর সেই পুরোনো চিঠিগুলিই হলো আমার সম্বল। সেগুলো আমার নিজস্ব ড্রয়ারে চাবিবন্ধ হ'য়ে তোলা থাকে একটা চন্দন কাঠের ছোটো বাক্সের মধ্যে। ওটা ছিল আমার ছেলেবেলাকার পুতুল খেলার বাক্স। তার মধ্যে ঐ চিঠিগুলোর সঙ্গে আরো রাখা আছে আমার বাবার দেওয়া নীলা পাথরের জোড়ভাঙা দুলটা (অন্যটা কোথায় হারিয়ে গেছে খুঁজে পাওয়া যায় নি), আর আছে সেই ছিঁড়ে যাওয়া মুক্তোর হার গাছটা (যেটা আজও গাঁথিয়ে নেবার ফুরসৎ হয় নি), আর আছে আমার জানকীমায়ীর আশীর্বাদী একটা পুরোনো হাফ্ গিনি (তাতে সিঁদুর লাগানো)। বাবার আমলের একটা পুরোনো আতরের শিশিও তার মধ্যে আছে, তাতে এখন এক ফোঁটাও আতর নেই। কিন্তু তবু খালি শিশিটাই এমন চমৎকার যে বাক্স খুললেই আমার ছেলেবেলাকার সেই পুতুল সাজানোর গন্ধটা টাটকা যেন তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।

রাত্রি এগারোটার পরে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু কিছুতে আমার ঘুম আসে না, বিছানায় শুতে যেতে যখন মোটে ইচ্ছে হয় না, তখন ড্রয়ার খুলে সেই চিঠিগুলি বের ক'রে একটির পর একটি পড়তে থাকি। সেগুলো ঠিক পর পর তারিখ অনুসারে সাজিয়ে রেখেছি। পড়ে পড়ে দেখি তাতে লেখা

রয়েছে কত সব চমৎকার কথা,—আমার কথা ওঁর সর্বদাই মনে হয়, এ ছাড়া আরো অনেক কথা নাকি ওঁর বলবার ছিল,—কী কথা, সে কী কথা? আবার লেখা আছে,—ঐ মুখে একটু হাসি ফুটুক আর ঐ গায়ে একটু মাংস লাগুক, এই দুটি জিনিস আমি দেখতে চাই,—কবে দেখতে আসবেন? তারপরে আবার,—হাজার মাইল দূরের মানুষটিকে আমি এক ফুট কাছে দেখতে পাচ্ছি,—এক আঁচড়ে এমন সহজ কথাটি কৈ আমি তো লিখতে পারি না! শেষের চিঠিটায় লিখেছেন,—কুকুর বেড়ালের মতো নিশ্চিন্ত জীবন নিয়ে থাকাই কী সব চেয়ে ভালো রকমের থাকা? তা তো নয় জানি, কিন্তু অষ্টপ্রহর এমন উদ্বিগ্ন হ'য়েও যে আমি আর থাকতে পারি না। কোথায় আছেন আর কেমন আছেন এইটুকু জানবারও কোনো উপায় নেই!

হাতের লেখাটি কী সুন্দর! চেহারার সঙ্গে হাতের লেখার কী আশ্চর্য রকমের মিল! যেমন মোটা মোটা আঙুলগুলি, তেমনি মোটা মোটা হরফগুলি। চিঠি পড়তে পড়তে মনে হয় যেন উনি সশরীরে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, চিঠির কথাগুলি যেন নিজের মুখ দিয়ে বলছেন। সেইজন্যেই আমার আরো ভালো লাগে ঐ চিঠিগুলি পড়তে। অনেকবার পড়ে পড়ে কথাগুলি আমার মুখস্থ হ'য়ে গেছে, কিন্তু তবু চিঠি পড়লেই যেন আবার সেই কথাগুলি নতুন ক'রে শুনি। বারংবার পড়ি আর বারংবার তার উত্তর রচনা ক'রে নিজের মনে মনে আওড়াতে থাকি।

কে শুনবে আমার উত্তর? শোনবার মানুষটি কোথায় জানি না, চারিদিকেই শুধু ধোঁয়া। ধোঁয়াগুলোই আমার মেঘদূত। তারা যেন পুঞ্জীভূত হ'য়ে এসে আমার সুমুখে দাঁড়ায়, আমার কথাগুলো তাদের কাছে শোনাই। কখনো বা মেঘের মতো সেগুলো উড়ে চলে যায়, কখনো বা আমার কথায় ভারী হ'য়ে উঠে করতে থাকে বারিবর্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের শেষের লেখা কবিতাগুলো আমি বারে বারে পড়ি। তার প্রত্যেকটি কথার অর্থ এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি।

"রূপ-নারানের কূলে জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,—
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,"—

তাঁর আশী বছর বয়সের জীবনে যে কথা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন তাই লিখে রেখে গেছেন এই ক'টি লাইনের মধ্যে। সত্যের নিদারুণ মূল্যটুকু যে কত দুঃখে লাভ করতে হয় তা আমার এই অল্প বয়সেও আমি নিজের মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি।

শরৎকাল কেটে গিয়ে শীতকাল পড়লো, আমার স্বামীকে নিয়ে আমি আরো বিব্রত হ'য়ে উঠলুম। কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে তিনি এখন সর্বক্ষণ ঘরে বসে থাকেন। খেতে রুচি নেই, ওজন কমে যাচ্ছে, আর ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর হচ্ছে। ডাক্তারেরা বলে যেমন পরিপূর্ণ বিশ্রামের কথা, তেমন ভাবে ওঁকে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। মেজাজটা আবার বেজায় রুক্ষ হ'য়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোথায় চলে যান, বারণ করলে শোনেন না। মংরুকে যদি সঙ্গে পাঠাই তাহ'লে রেগে ওঠেন, বলেন—বেশি বাড়াবাড়ি কোরো না। তাঁকে আরোগ্য ক'রে তুলতে যেন আমারই যত গরজ, যেটুকু কথা শোনেন তা যেন আমারই প্রতি নিতান্ত দয়াপরবশ হ'য়ে। একেবারে বেয়াড়া রকমের অবুঝ, কোনো বিষয়েই একটু গ্রাহ্য নেই। আমি তাই একবারও তাঁকে কাছছাড়া হ'তে দিই না। সর্বক্ষণই কাছে কাছে থাকি, নানারকম বই পড়ে শোনাই, বাজনা বাজিয়ে শোনাই, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কত আবোল-তাবোল গল্প করি, প্রাণপণে চেষ্টা করি ভুলিয়ে রাখতে। বুড়ো শ্বশুর আর বুড়ী শাশুড়ী উদ্বিগ্ন হ'য়ে বারে বারে খবর নিতে আসেন উনি কেমন আছেন, বারে বারেই আমি তাঁদের মিথ্যা বলে ভোলাই,—আজকে উনি খুব ভালোই আছেন, খিদেটা বেশ হয়েছিল, জ্বর মোটে নেই বললেই হয়। আশ্চর্য এই যে আমার সেই শাশুড়ী আজকাল বড়ো

একটা ছেলের কাছে ঘেঁষেন না, দূর থেকে খবর নিয়েই যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে সরে পড়েন, ঠাকুরঘরে গিয়ে পূজোআর্চায় মনোনিবেশ করেন। শ্বশুর তো ভীতু মানুষ, ভয়েই ঘরে ঢোকেন না, আমার কথাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করেন। ওঁদের সকলকে আমি স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে রাখি,—কিন্তু আমাকে কে ভোলাবে?

দাদা আমার স্বামীকে প্রায়ই দেখতে আসে। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বলে,—যোগেন বাবুর অসুখটা হওয়া থেকে তুই একেবারে বদ্‌লে গেছিস দেখচি। আজকাল আর ঝগড়া করিস না, বিরক্ত হ'স না, দিনরাত দেখতে পাই ওঁর কাছে কাছে রয়েছিস, ব্যাপারটা কী বল দেখি?

আমি একটু হেসে বলি,—বেচারা অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে, নিজের ভালোমন্দ নিজেই বুঝতে পারে না, এখন আমি ছাড়া ওঁকে আর কে দেখবে বলো?

দাদা বলে,—তুই আমার কথা বুঝচিস না। রোগটা খারাপ কিনা, তাই বলছি। রোগীর গায়ের সঙ্গে অনবরত গা লাগিয়ে থাকলেই কী সেবা করা হয়? হাসপাতালে দেখেছিস তো, নার্সেরা দূর থেকে সেবা করে, রোগীর গায়ের কাছে ঘেঁষে না। এ সব রোগীর যারা সেবা করবে তাদের পক্ষে নিয়ম হচ্ছে এই, যে রোগীর মুখের কাছ থেকে অন্তত তিন ফুট দূরে সরে থাকতে হবে। তার চেয়ে বেশি কাছে আর যাবে না, কারণ রোগী কাসলে কিংবা কথা বললে হাওয়ার ভেতর দিয়ে তার রোগের ড্রপ্‌লেটগুলো নাকে এসে ঢুকে যেতে পারে।

আমি তখন হাসতে হাসতে বলি,—তোমার কোনো ভয় নেই দাদা, আমাকে আর কোনো রোগেই ধরবে না, তুমি দেখে নিও।

দাদা বলে,—কে তোর সঙ্গে পারবে বল, যখন যার ওপর ঝোঁক পড়বে তখন তাকে নিয়েই একেবারে মেতে উঠবি। তখন ঝোঁক পড়েছিল অমর বাবুর ওপরে, যেমনি তিনি চলে গেলেন অমনি সেটা কেটে গেল, এখন ঝোঁকটা পড়লো যোগেন বাবুর ওপরে। একেই বলে মেয়েদের মন, যখন যার দিকে খেয়াল হয় তখন তাকে নিয়েই উন্মত্ত।

সুরেন ঠাকুরপো একদিন বললে,—ইস্ বৌদি, একটা নতুন রকমের পোজ্ নিয়ে আজকাল খুব সেবাটা করছো দেখছি, যেন মনের মতো একটা কাজ পেয়ে বেঁচে গেছো। এটাকে কী বলবো,—ভক্তি, না বাৎসল্য, না করুণা?

—এটা হচ্ছে স্বামী সেবা।

—একেবারে পতি পরম গুরু? না, তোমার আড়াল দেবার দেয়ালটুকু যাতে বজায় থাকে সেইজন্যে এই প্রাণপণ চেষ্টা?

—তুমি আমাকে ভাবো কী? তুমি আমার বন্ধু না শত্রু?

—বন্ধু ব'লেই স্পষ্ট কথাটা স্পষ্ট ভাষায় বলে ফেললুম। তা কাজটা তুমি অবশ্য ভালোই করছো বলতে হবে, কারণ ও দিকটা যখন একেবারে ফাঁক হ'য়ে গেছে তখন অন্তত এ দিকটা রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু আমি বলতে চাইছি এই, যা করছো একটু সাবধান হ'য়ে করো, নিজের দিকটায় একটু লক্ষ্য রাখো। তাতে কোনো দোষ হবে না। রোগটা অত্যন্ত সংক্রামক। মেয়েদের ওটা খুব চট্ ক'রে ধরে, আর একবার ধরলে তখন রক্ষা নেই। বিরহের সময় তোমাদের নিজেকে নির্যাতন করতে থাকাই একটা প্রথা বটে, কিন্তু এ সব রোগ নিয়ে অমন ছেলেখেলা করাটা উচিত নয়।

—তোমরা সবাই দেখছি খুব ভয় পেয়ে গেছ, তবে কী সত্যিই ওঁর সেই ভয়ানক রোগটাই হয়েছে ঠাকুরপো? সত্যি কথা বলো, আমার কাছে লুকোবার দরকার নেই।

—এখনো তা বলা যায় না, কিন্তু হবার মতন তো বটেই।

—ও রোগ হ'লে আর সারানো যায় না শুনেছি, কিন্তু হবার আগের থেকে ভালো রকম চিকিৎসা করলেও কী সারতে পারে না?

—আজকাল সেই আসল রোগটা হ'লেও তার ভালো রকম চিকিৎসা আছে, অনেক সময় বাড়াবাড়ি অবস্থা থেকেও সারিয়ে তোলা যায়। কিন্তু যে রোগটাকে মোটে ধরাই যাচ্ছে না, তাকে সারানো কঠিন কথা।

—যেমন ক'রেই হোক ওঁকে ভালো ক'রে তুলতে হবে। এর জন্যে যত

টাকা লাগে আমি খরচ করতে রাজি আছি, ভালো ভালো ডাক্তারদের এনে তোমরা চিকিৎসা করাও ঠাকুরপো। তোমার বাবাকে কিছু বোলো না, আমার কাছে যা টাকা আছে সব তোমাকে দিচ্ছি. তুমি অন্যরকম একটা চিকিৎসার ব্যবস্থা করো। এ রকম হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সত্যি বলছি তুমি একটু ভেবে দেখ, ওঁকে যদি ভালো ক'রে তুলতে না পারি তাহ'লে আর আমার গতি কী হবে বলো?

—যথাসাধ্য চেষ্টা তো অবশ্যই করতে হবে. সে কথা কী আমরাও ভাবছি না? তবে যিনি এখন দেখচেন তিনিও একজন স্পেশালিষ্ট। আরো কিছুদিন দেখা যাক. তারপর দরকার হ'লে অন্য ডাক্তারদের আনা হবে বৈকি। কিন্তু মনে করো,—তবুও যদি না সারে, তাহ'লে তুমি কী করবে?

—সে কথা আমি ভাবতেও পারি না।

—তা কী হয়, নিশ্চয় মনে মনে একবারও অন্তত সব দিকটাই ভেবেচিন্তে দেখে নিয়েছ।

—অতটা পর্যন্ত ভাবতে গেলেই যেন কেমন গুলিয়ে যায়। মনে হয় উনি না থাকলে বেঁচে থাকাটা আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠবে।

—কেন, তাই বা কেন হবে? একজনের জীবন রইল না বলেই অন্যের জীবনের সব উদ্দেশ্য ফুরিয়ে গেল? ওটা তোমার একটা গড়া কথা। ধরো, দাদা যদি কোনোদিন মরেই যান, তোমার জীবনে আর কোনো আসক্তি থাকবে না, এ তুমি কেমন ক'রে বলছো? অমর বাবুর কথাটা একেবারে চেপে যাচ্ছো বুঝি? যে বাধাটা এখন রয়েছে সেটা যদি দৈবক্রমে কেটেই যায় তাহ'লে তুমি তখন আবার স্বচ্ছন্দে অমর বাবুকে বিয়ে করতে পারবে, এ বিষয়টা কী একবারও চুপি চুপি ভেবে নিয়ে তুমি খুশি হওনি? লুকিও না, সত্যিকথা বলো।

—সত্যি কথাই বলছি, ও-দিক দিয়ে আমি মোটে ভাবিই নি। আবার আমি বিয়ে করতে যাবো? তুমি আমাকে চিনতে পারোনি তাই বলছো, ওটা একেবারেই সম্ভব নয়।

—কেন সম্ভব নয় ? তুমি তো বলেছিলে যে অমর বাবুই তোমার মনের মতো লোক, সকলের চেয়ে বেশি তাঁকেই তুমি ভালোবাসো, তবে কেন সেটা সম্ভব নয় বলছো ? তোমার ছেলেপুলে নেই, দাদা চলে গেলে আর তোমার কোনো-দিক থেকে কিছু বাধা নেই। আমরা তো তখন দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন মাত্র, তবে বাধা কী আছে ?

—আমার বাধা না থাক, তাঁর আছে। এ কখনো সম্ভব নয়। আর তোমরাও আমার নিতান্ত পর নও, তোমাদের মনেই বা অনর্থক কষ্ট দিতে যাবো কেন ? এতগুলি লোকের মনে কষ্ট দিয়ে—না না, ও জিনিস আমি চাইনা।

—তার মানে ওর বিশৃঙ্খলাটা তুমি পছন্দ করো না, গতানুগতিক জীবন ছেড়ে এক পাও এগিয়ে যেতে চাওনা, এইতো তোমার কথা ?

—না না, তা নয় ঠাকুরপো। বিয়ে করা জিনিসটার ওপরেই আর আমার শ্রদ্ধা নেই। তুমিও তো নিজের বেলায় এই কথা বলো, আমার বেলায় আবার অন্য কথা বলছো কেন ? দেবতা-মানুষকে সাক্ষী রেখে কায়েমী বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখা এই যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা, আগেকার দিনে হয়তো এর প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এখন আর তেমন নেই। ও-রকম ভাবে বেঁধে রাখবার নিয়মটা সংসার থেকে এবার উঠে যাক, মানুষগুলো তবু কতকটা হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হোক। কারো বিয়ে হচ্ছে শুনলেই এখন আমার ভয় করে, মনে হয় আবার বুঝি একজন অতল জলে ডুবলো। কিন্তু তোমার আজ হলো কী বলতো ? তোমার দাদার জীবনরক্ষার চেয়ে এখন কী আমার ভবিষ্যতের বিয়ের সমস্যাটাই তোমার কাছে এত বড়ো হ'য়ে দাঁড়ালো ?

—তা ঠিক নয়, তর্ক ক'রে দেখছি তোমার মনের কতখানি দৌড়। নইলে ধরো, দাদা যদি নাই থাকেন, তবু আমি তো রয়েছি, তোমার আবার ভাবনা কিসের ? কিন্তু অমর বাবুর কথাটা তুমি চেপে যাচ্ছো। তাঁর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধটা তখন কী রকম দাঁড়াবে তাই জিজ্ঞাসা করছি।

—তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকবেন, আমিও যেমন আছি তেমনি

থাকবো। তুমি ভুল করছো ঠাকুরপো, তোমার দাদার জায়গায় এসে বসবেন তিনি? তা কখনই নয়, তাঁর জায়গা আরো অনেক ওপরে। তোমার দাদা দিয়েছেন আমাকে সারা জীবনের একটা সঙ্গ, তাই তাঁর ওপরে আমার একটা মমত্ব জন্মে গেছে, তার বদলে আমি তাঁকে দিয়ে যাচ্ছি আমার যথাসাধ্য সেবা। আর অমর বাবু দিয়েছেন আমাকে জীবনের আনন্দ, দিয়েছেন মনের তৃপ্তি, তার বদলে আমি দেবো তাঁকে শুধু আমার শ্রদ্ধার নিবেদন। দুটো একেবারে আলাদা জিনিস।

—দাও, দাও, শ্রদ্ধাই দিয়ে যাও, আর তো কাউকে কিছু দিতে পারলে না। দাদাকে দিলে সেবা, অমর বাবুকে দিলে শ্রদ্ধা, আমাকে দিলে বন্ধুত্ব, অথচ নিজেকে তুমি কারো কাছেই ধরা দিলে না। কিন্তু তোমার চেয়েও চালাক ঐ অমর বাবু। এমন বশীকরণ মন্ত্র দিযে মেরে রেখে গেছে যে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেও তবু তোমার মোহ কাটছে না। সে কিন্তু তোমার কথা একবারও আর ভাবে না। হয়তো আবার একটা নতুন কিছুর সন্ধান পেয়েছে, তাই এতদিনে একখানা চিঠি লেখবারও ফুরসৎ নেই। এই সহজ কথাটা যে তুমি কতদিনে বুঝবে, আমি কেবল তাই ভাবি।

—ওটা তোমার মনের ধারণা হ'তে পারে, কিন্তু সত্যি কথাটা তা নয়।

—সত্যি কথাটা কী তাই শুনি?

—সেটা খুব সহজ কথা। তিনি এমন জায়গায় গিয়ে পড়েছেন যেখান থেকে চিঠি পাবারও কোনো উপায় নেই, লেখবারও কোনো উপায় নেই।

—আশ্চর্য, তোমাব মনে অবিশ্বাসও একটু হয না? কেমন ক'রে জানলে এত কথা?

—তার কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবো না, কিন্তু আমাদের মন এ সমস্ত বিষয়ে আপনাআপনিই জানতে পাবে। যদি সন্দেহের কিছু থাকতো তাহ'লে আমার মন কোনো প্রমাণ পাবার আগের থেকেই তা ঠিক জানতে পারতো। তোমাকে কেমন ক'রে এ কথা বোঝাবো বলো, কিন্তু এই আমার বিশ্বাস।

বিশ্বাস মানেই ভালোবাসা, আর ভালোবাসা মানেই বিশ্বাস। পুরোপুরি ভালোবাসলে পুরোপুরি বিশ্বাসটা আপনা থেকেই এসে পড়ে। যদি কখনো তোমার ভাগ্যে হয় তখন এ কথা বুঝবে। সত্যি বলছি, তাঁর সম্বন্ধে ভুলেও আমার কোনো সন্দেহ জাগে না, সেইজন্যে কোনো খবর না পেয়েও আমি স্থির হ'য়ে আছি। আমি জানি যে কোনো খবর দেবার উপায় থাকলে তিনি যেমন ক'রেই হোক আমাকে জানাতেন। তুমি দেখে নিও, আমার কথাই সত্যি। তিনি ঠিকই আছেন আর সুযোগ পেলেই আমাদের কাছে এই বাড়িতে আগে এসে হাজির হবেন, এখানে না এসে তিনি আর কোথাও যাবেন না।

—হোপ্‌লেস, হোপ্‌লেস, তোমাদের জাতটাই এমনি হোপ্‌লেস। আচ্ছা দেখা যাবে আমার কথা সত্যি না তোমার কথাই সত্যি।

আমার স্বামীর অসুখটা তেমনি একরকম ভাবেই রয়ে গেল। অনেক বড়ো বড়ো ডাক্তারদের এনে দেখানো হলো, নানাভাবে চিকিৎসা করানো হলো, কিন্তু রোগ যেমন তেমনি রইল। কোনো উন্নতিও নেই অবনতিও নেই। অ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলতে থাকলো, তাতেও যেমন তেমনি। তখন অবধৌতিক উপায়ে ওঁকে দৈবশক্তির দ্বারা আরোগ্য কববার নানারকম চেষ্টা চলতে থাকলো।

শোনা গেল বিন্ধ্যাচল থেকে একজন সাধু এসেছেন, তিনি নাকি সর্বজ্ঞ। মানুষের দুঃখদুর্দশার উপায় তিনি বলে দিতে পারেন, কারো কঠিন রোগ যদি সারবাব হয তাহ'লে তার উপায় কী হবে সে কথাও তিনি বলে দিতে পারেন। শোনা গেল অমুক মহারাজার স্ত্রী ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছিল, তাকে তিনি কেবল ঠাকুরের আশীর্বাদী ফুল ধারণ করতে বলেই আরোগ্য ক'রে দিয়েছেন। অমুক জজ সাহেবের দ্বিতীয়পক্ষ বাতে পঙ্গু হ'য়ে শয্যাগত ছিল, ওঁর আদেশ পেয়ে সে এখন দিব্যি উঠে হেঁটে বেড়াতে পারছে। আমার শাশুড়ী বললেন,—চলো বৌমা,

একবার সাধুদর্শন ক'রে আসি। তোমার যদি সুকৃতি থাকে তাহ'লে ঐ সাধুই যাহোক একটা উপায় দেখিয়ে দেবেন, যোগেন আমার ভালো হ'য়ে উঠবে।

সাধুসন্ন্যাসীর ক্ষমতার কথা আমি জানি না, কিন্তু ঠিকুজী কোষ্ঠীর গণনাকে আমি বিশ্বাস করি। আমাদের বুদ্ধির অজানা কোনো শক্তির দ্বারা জগৎ চলছে এ-কথা আমার মাঝে মাঝে মনে হয়। মন আমার চারিদিক থেকেই ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল, একটা যদি কোথাও কিছু দৈব সাহায্য পাওয়া যায়, সেই আশাতে গেলুম আমি সাধুদর্শন করতে।

সাধু বসে আছেন একটি মৃগচর্ম পেতে, চারিদিকে অনেক লোকের ভিড়। সাধুর চোখে এমন একটা তীক্ষ্ণদৃষ্টি যে দেখলে ভয় করে। কাউকে তিনি কোনো প্রশ্ন করতে দেন না, যাকে যা বলবার থাকে তা নিজেই বলে দেন। দর্শনপ্রার্থীরা একে একে তাঁর সুমুখে গিয়ে প্রণাম করে, তিনি কিছুক্ষণ তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, তারপর তাকে যা বলবার থাকে তাই বলেন। আবার যদি সে কিছু প্রশ্ন করে, তার আর কোনো জবাব দেন না, কেবল মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। অপ্রস্তুত হ'য়ে লোকটি তখন উঠে যায়। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই এটা হয়। উনি যাকে যে কথাটি বলে দেন তার পক্ষে যেন সেইটুকুই যথেষ্ট, কারণ প্রায়ই দেখলুম যে অধিকাংশ লোকেই সেইটুকু শুনে খুশি হ'য়ে চলে যাচ্ছে, দ্বিতীয় কোনো প্রশ্ন করছে না।

ঘরের মধ্যে মেয়েদের বসবার জায়গা পুরুষদের থেকে একটু স্বতন্ত্র। আমার পাশের একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলুম,—উনি যে একটির বেশি দুটি কথা বলেন না, কেমন ক'রে উনি জানবেন যে তাতেই আমার কাজ হবে? এমনও তো হ'তে পারে যে কারো হয়তো দুটো তিনটে প্রশ্ন আছে, সব গুলোর জবাব না পেলে তার চলবে কেমন ক'রে?

যে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলুম তারও পরণে আছে গেরুয়া, হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, হয়তো সে ঐ সাধুর কোনো শিষ্যা। সে একটু হেসে বললে,—তা কী হয় বাছা? মানুষ যখন দেবতার কাছে ছুটে আসে তখন তার মনের মধ্যে একটা

প্রশ্নই সব চেয়ে বড়ো হ'য়ে উঠেছে, সেইটির জন্যেই সে আসে। অন্য কোনো প্রশ্ন যদিও থাকে, সেগুলো তুচ্ছ। উনি যে সর্বজ্ঞ, কার পক্ষে কোন কথাটা বেশি দরকারী তা উনি জানতে পারেন, সেইজন্যে শুধু সেই বিষয়টা নিয়েই উনি বলেন। তাতেই লোকের উপকার হয়।

মেয়েটির মুখে এই কথা শুনে আমার বড়ো ভয় হ'য়ে গেল। উনি যদি এমনই সর্বজ্ঞ হন তাহ'লে তো আমার মহা মুশকিল। যদি ঐ সাধু আমার স্বামীর অসুখের সম্বন্ধে কিছু না ব'লে এত লোকের সামনে কেবল সেই কথাটিই বলে ফেলেন যা অহোরাত্র আমার মনের মধ্যে জেগে রয়েছে? যদি এতগুলি লোক জানতে পারে যে স্বামীর আরোগ্যের সম্বন্ধে জানতে এসেও আমি কার বিষয়ে সর্বক্ষণ ভাবছি, কার মঙ্গলের জন্যে সর্বক্ষণ প্রার্থনা করছি, তাহ'লে সে নিদারুণ লজ্জা আমি রাখবো কোথায়? অপবাদ বটুক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমার অসুস্থ স্বামী যদি সে কথা শোনেন তাহ'লে কী মর্মান্তিক কষ্ট তাঁর হবে? তাঁর মনে কষ্ট দিলে যে প্রেমকে আমি অন্তরে অন্তরে কত মহিমান্বিত ক'রে তুলেছি সে যে একেবারে ম্লান হ'য়ে যাবে, সেই অপবাদের মলিনতা নিয়ে কেমন ক'রে আর আমি আমার প্রিয়জনের মঙ্গল কামনা করতে পারবো? আমার স্বামীকে প্রাণপণে সেবা ক'রে তার ফলটা যে মনে মনে কোথায় পৌঁছে দিতে চাই তা যে সমস্তই জানাজানি হ'য়ে যাবে।

ভয়ে আর উদ্বেগে আমার বুকটা ভুবুভুবু করতে লাগলো। মনে হলো এখান থেকে উঠে যাই। কিন্তু সেখান থেকে ওঠা তখন অসম্ভব, লোকে হয়তো তাহ'লে আরো কিছু সন্দেহ করবে। তখন মনে হলো, ঐ সাধুর চেয়েও যিনি বড়ো, যিনি সবার চেয়ে বড়ো দেবতা, তাঁর কাছে আমি আমার প্রার্থনা জানাই। ব্যাকুল হ'য়ে বললাম,—তুমি তো অন্তর্যামী, তুমি জানো আমার প্রাণের কামনার কথা, আমার প্রেম তোমার কাছে পাপ নয়। কিন্তু লোকে সে কথা বুঝবে না। লোকের কাছে আমার সেই পরম গোপন কথাটিকে তুমি প্রকাশ হ'তে দিও না। এখানে এসে আমি ভুল করেছি, আমাকে তুমি বাঁচাও।

দেবতা বোধ হয় শুনলেন আমার প্রার্থনা। আরো অনেক লোক যখন একে একে বিদায় হ'য়ে গেল, খুব অল্পই যখন অবশিষ্ট রইল, তখন সাধু আমাদের দিকে চেয়ে একবার হাসলেন। তারপরে উঠে দাঁড়িয়ে শিষ্যদের বললেন,—আজ আমি ক্লান্ত হয়েছি, এঁদের কাল আসতে বলে দাও।

আমি সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ি ফিরলুম, আর মোটেই সেখানে গেলুম না।

যত ডাক্তার আমার স্বামীকে দেখেছে তারা সকলেই বলেছে—এ রোগে পরিপূর্ণ বিশ্রাম দিয়ে এবং, ভাবনাচিন্তা ছাড়িয়ে রোগীকে নিশ্চিন্ত রাখতে পারলে, প্রচুর আলো হাওয়া আর সুনিদ্রার ব্যবস্থাগুলো বজায় রেখে ভালো রকম সেবাযত্ন করতে পারলে, আর ভালো ভালো পথ্য খাওয়াতে পারলে তাতে চিকিৎসার চেয়ে অনেক বেশি উপকার হয়। সেটা তো রয়েছে আমারই হাতে। দৈব অনুগ্রহ লাভের জন্যে চেষ্টা না ক'রে আমি উঠেপড়ে লাগলুম,—দেখবো নিজের ক্ষমতায় ঐ গুলোর কতদূর কী করতে পারি। কোনো প্রয়োজনেই আমার স্বামীকে কিছুমাত্র পরিশ্রম করতে দিইনা, বেশিক্ষণ জেগে থাকতে দিইনা, কোনো বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি হ'তে দিইনা। ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়াই, পথ্য খাওয়াই, ঘড়ি ধবে ঘুম পাড়াই এবং ঘুম থেকে জাগাই। যে সব পথ্য উনি কিছুতেই খেতে চান না সেগুলোকে নানা উপায়ে লোভনীয় আর মুখরোচক ক'রে ওঁকে খাওয়াই। দুধ উনি কিছুতেই খেতে রাজি নন, তাই অনেক লুকোচুরির সাহায্য নিতে হয়। কোকোর সঙ্গে এবং কফির সঙ্গে একটুও জল না দিয়ে সমস্তটাই দিই দুধ—যদি উনি বলেন এতে দুধটা আজ বেশি দেওয়া হ'য়ে গেছে, আমি বলি কাল থেকে আরো কমিয়ে দেবো। পরের দিনে কোকো কিংবা কফির মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিই, সেদিন আর ধরতে পারেন না। দুধকে জমিয়ে বিভিন্ন রকমের রং ক'রে বিভিন্ন রকমের গন্ধ মিশিয়ে খাওয়াই, ছানা দিয়ে নতুন ধরণের মিঠাই তৈরী ক'রে খাওয়াই, পুডিংএর মতো তৈরী ক'রে খাওয়াই, দুধের ক্ষীর থেকে ভাপা দৈ তৈরী ক'রে খাওয়াই। ডাক্তারদের আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিয়েছি কোন কোন জিনিসগুলো

ওঁর খাওয়া দরকার, সেগুলো আমি নানা ছলে সমস্তই খাওয়াই, উনি তার কিছুই ধরতে পারেন না। এই সব কথা যখন মনে মনে ভাবি তখন আমার হাসি পায়। পুরুষেরা এমনি বোকা, আমাদের ছলাকলাগুলো ওরা কিছুই বুঝতে পারে না, একটু চেষ্টা করলেই কত সহজে ওদের ভুলিয়ে দেওয়া যায়। বেশি রাত্রি পর্যন্ত ধরে রাখবার জন্যে অমর বাবুর কাছে যখন গল্পের ফাঁদ পেতে বসতুম তখন তিনিও কিছু বুঝতে পারতেন না।

কিন্তু এ সব কাজে কেবল বুদ্ধি খরচ করলেই চলে না, সেই সঙ্গে যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হয়। ঐ রকম একটি অরুচিগ্রস্ত খুঁৎখুঁতে রোগীর রীতিমত পরিচর্যা করা আর নিয়ম বজায় রেখে দিনের পর দিন সমস্ত কাজগুলি নিখুঁতভাবে ক'রে যাওয়া সোজা কথা নয়। কাজ করতে করতে আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি, মনে হয় যে আর পারি না, তবু সমস্ত অবসাদ ঝেড়ে ফেলে আমাকে সব কিছু করতেই হয়। মাঝে মাঝে মাথার গোলমাল হ'য়ে যায়, হাত পায়ের ঠিক থাকে না, তখন কাজের মধ্যে ত্রুটি বেরিয়ে পড়ে। কোনোদিন হাত থেকে থার্মোমিটার পড়ে ভেঙে যায়, কোনোদিন কাচের গ্লাস ভেঙে চারিদিকে ছত্রাকার হ'য়ে যায়, আমার স্বামীর কাছে ভর্ৎসনা খেতে হয়। প্রায়ই তিনি খিট্‌খিট্ করেন। তাঁকে খুশি রাখা এখন বড়ো মুশকিল। অনেক সময় অযথাও তিনি রেগে ওঠেন, তবু পারতপক্ষে আমি কিছু বলি না, মনে মনে হাসি।

একবার এক বাটি তরল পথ্য আনতে আনতে দরজার চৌকাঠে আমার কপালটা ঠুকে গেল, কেটে গিয়ে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে গেল। আঘাতটা লেগে আমার হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল, তবু হাতের বাটি সাম্‌লে নিয়ে আমি হাসতে হাসতে পথ্যটা ওঁকে দিতে গেলুম। উনি এক ধমক দিয়ে বললেন—ওটা টেবিলে রেখে আগে কপালটা ধুয়ে এসো। চেহারাটা যা চমৎকার দেখাচ্ছে, ঐ হাতে কিছু খেতে ইচ্ছে করে নাকি? একটা বাটি বয়ে আনতেও যখন পারো না তখন নিজে না এনে ওটা মংরুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হতো, সে তোমার চেয়ে ঢের বেশি কাজের লোক।

আজকাল মংকুর ওপরে খুব নেকনজর পড়েছে দেখতে পাই। সকল বিষয়েই মংকুকে ডেকে পাঠান। রোগীদের চরিত্রে ঐরকম এক একটা অহেতুক পক্ষপাত হ'তে দেখা যায়, অত্যন্ত আপনার লোককেই তখন তারা পছন্দ করে না, পছন্দ করে হয়তো বাইরের একজন সামান্য লোককে। সে জন্যে কিছুই নয়, কিন্তু সেদিন আমার বড়ো অপমান বোধ হয়েছিল। যেখানে প্রাণপণে এত করলেও কোনো কৃতজ্ঞতা পাওয়া যাবে না, সেখানে কেন আমি মিথ্যা এমন বেগার খেটে মরি? মনে পড়ে গেল অমর বাবুর সেই কথা। একদিন চা আনতে আনতে অল্প একটু চা আমার হাতে চল্‌কে পড়ে গিয়েছিল, তিনি তাতেই কত ব্যস্ত হ'য়ে উঠে তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে কাপ্‌টা নিয়ে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, গরম চা লেগে 'আমার হাতটা' ঝল্‌সে গেছে কিনা। আজ তিনি কোথায়? তিনি নাকি আমার কষ্ট সহ্য করা দেখতে চেয়েছিলেন, আজ এসে একবার দেখে যান কতখানি আমি সহ্য ক'রে যাচ্ছি।

তবে আমার স্বামী যে সব দিনই আমার প্রতি অমন বিমুখ হ'য়ে থাকতেন তা নয়। এক একদিন আবার দেখতুম অতি মাত্রায় সদয় হ'য়ে উঠেচেন। তখন আমাকে কাছে ডেকে বসিয়ে মাথার এলো চুলগুলোকে হাতে জড়িয়ে নিয়ে কত আদর করা হতো, আমার স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি পড়তো, বলা হতো যে খেটে খেটে আমি নাকি বড়ো রোগা হ'য়ে গেছি। আমারও শরীরের দিকে একটু দৃষ্টি রাখা দরকার, কাজের জন্যে আমার সাহায্যকারী একজন লোক রাখা উচিত কিংবা একজন নার্স রাখা উচিত। এই সব কথা শুনেও আমি মনে মনে হাসতুম। মনে মনেই বলতুম, আমি ওঁর রাগও চাই না অনুরাগও চাই না, উনি শুধু সেরে উঠুন,—তাতেই আমি খুশি।

যথাসাধ্য স্বামীর সেবা ক'রে যাচ্ছিলুম, নতুন রকমের একটা চিকিৎসায় আর নানাবিধ শুশ্রূষায় কিছু উপকারও হচ্ছিল, কিন্তু ক্রমে উপযুক্ত ওষুধ আর পথ্য পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ হ'য়ে উঠলো। কলকাতায় শীঘ্রই বোমার আক্রমণ হবে

ব'লে গুজব উঠল। শহর ছেড়ে লোকজন পালাতে লাগলো, সকল বিষয়েই একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলো।

এর আগে শীতের প্রারম্ভে যখন থেকে জাপানীরা মালয় আক্রমণ শুরু করেছে তখন থেকেই কলকাতায় পালাও পালাও রব শুরু হ'য়ে গেছে। এত বড়ো একটা শহর, যেখানে দিনের আলোর চেয়েও রাত্রের আলো প্রখর হ'য়ে জ্বলতে থাকে, সেখানেও যখন ব্ল্যাক্-আউট হ'য়ে রাত্রের অন্ধকারকে আরো বেশি অন্ধকার ক'রে তুললে, তখন লোকের মনে একটা ভয় দেখা দিল। কলকাতায় থাকা নিরাপদ নয় ভেবে সকলেই নিজের নিজের প্রাণ আর সম্পত্তি নিয়ে পালাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। কলকাতার বাইরে যাদের যাদের থাকবার জায়গা আছে তারা সবাই একে একে সরে পড়তে লাগলো। যারা রইল তারা সন্ধ্যার পরে আর পথে বেরোয় না, সিনেমা থিয়েটারও খুব কম দেখতে যায়। সন্ধ্যার পরে পথে বেরোলেই অনেকের পকেট মারা যায়, অনেকের পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙে। একদিন আমার দাদা গিয়েছিল সিনেমা দেখতে, রাত্রে বাড়ি ফেরবার সময় একটা কালো ষাঁড়ের শিঙের গুঁতো খেয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে বাড়ি ফিরলো, পনেরো দিন পর্যন্ত শয্যাগত হ'য়ে রইল। অন্ধকারে সেই কালো ষাঁড়টাকে সে ঠাহর করতে পারেনি, তাই একেবারে ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়েছিল।

অল্পদিনের যুদ্ধে জাপানীরা যখন সুরক্ষিত সিঙ্গাপুর জয় ক'রে নিলে তখন কলকাতা থেকে আরো বেশি বেশি লোক পালাতে শুরু করলে। তারপরে আবার যখন ওরা রেঙ্গুণ পর্যন্ত অধিকার ক'রে নিলে তখন কলকাতার অলিতে গলিতে যারা অবশিষ্ট ছিল তারাও তাড়াতাড়ি মোটমাটরি বেঁধে বহু দূরদূরান্তে সরে পড়লো। জাপানীরা যখন এত কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে তখন আর রক্ষা নেই। বোমা তো এবার পড়বেই,—যদিও জলপথে কিংবা স্থলপথে আসছে তা বলা যায় না, কিন্তু এবার ওরা কলকাতা পর্যন্ত আক্রমণ করবে। কিছুকালের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল, বর্মা জয় করবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে বোমা

পড়তে শুরু হলো। প্রথমে বোমা পড়লো ভিজগাপট্টমে আর কোকনদে, তার পরে পড়লো চট্টগ্রামে। তাহ'লে কলকাতায় বোমা পড়তে আর বিলম্ব কী? যে কোনো মুহূর্তেই পড়তে পারে।

বোমার নির্যাতন থেকে সকলকে রক্ষা করবার জন্যে শহরের স্থানে অস্থানে অসংখ্য ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে, ফুটপাথের পথরোধ ক'রে অসংখ্য দেয়াল গেঁথে পথিকদের আশ্রয়স্থান তৈরী করা হয়েছে, প্রত্যেক পাড়ায় মাতব্বর গোছের লোকদের বাড়িতে বাড়িতে এ. আর. পি. আফিস খুলে হলদে রংএর সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক বাড়ির কাচের সার্শিতে আর আয়নাগুলোতে হরেক রকমের কাগজ আঁটা, যাতে কাচ ভাঙলেও টুক্‌রোগুলো ছিট্‌কে না গায়ে পড়ে। বস্তা বস্তা বালি এনে বড়োলোকদের বাড়ির দেয়ালের গা ঘেঁষে থাক থাক সাজিয়ে রাখা হলো, যাতে বোমার আঘাতেও বাড়ির মধ্যে কোনো ক্ষতি না হয়। যারা খোলার বাড়িতে বাস করে সেই সব গরিব লোকেরা অবশ্য কিছুই করলে না, কিন্তু তাদের রক্ষা করবারই বা কোন বহুমূল্য জিনিস আছে? এদিকে বোমার হিড়িকে শহরে লুঠতরাজ নিবারণ করবার জন্যে অতিরিক্ত পুলিস আর সিভিক্ গার্ডদের মোতায়েন করা হলো, তারা হাতের কাছে উপস্থিত কোনো কাজ না পেয়ে মোটরগাড়িতে কিংবা লোকের বাড়িতে একটু জোরালো গোছের আলো জ্বলতে দেখলেই বেজায় ধরপাকড় করতে লাগলো।

অতঃপর সাইরেণ বাজা শুরু হলো। হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে ওঠার মতো সাই-রেণের বিকট আওয়াজ শুনলেই সকলের বুক দুরুদুরু করে। সবাই মনে করে যে আগের দিনকার সাইরেণটা যদিও মিথ্যা বেজেছিল বটে, কিন্তু আজ নির্ঘাত বোমা পড়বে। ঠাকুরপো এসে খবর দেয়—হাসপাতালগুলি রোগীশূন্য, বিছানা সব খালি ক'রে রাখা হয়েছে, বোমায় যারা আহত হ'য়ে আসবে তাদের আগে স্থান দিতে হবে, রোগীদের চিকিৎসার কথা তার পরে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কোথাও জনপ্রাণী দেখা যায় না, দেখা যায় কেবল পুলিস আর সিভিক গার্ড আর এ. আর. পি। মোটরের ভিড়ে যে সব রাস্তায় মানুষ চলতে পারতো না সেই সব

রাস্তা খাঁ খাঁ করছে, তার মাঝখান দিয়েই এখন অনায়াসে চোখ বুজে হেঁটে যাওয়া চলে। ক্বচিৎ দু একখানা মোটর দেখা যায়, তাতে এ. আর. পি.-র লেবেল মারা। আর দেখা যায় কেবল কতকগুলো রিক্‌শ গাড়ি,—পথিকেরা পারতপক্ষে পায়ে হেঁটে চলে না, রিক্‌শতে চেপে অতি ভয়ে ভয়ে যাতায়াত করে। কলকাতার কোনো গলিতে আর মানুষ নেই, কেবল ষাঁড়গুলো ঘুরে বেড়ায়, আর রাস্তার কুকুরগুলো মাটি শুঁকে বেড়ায়।

কিছুকাল এমনি ভাবেই কাটলো। এ অঞ্চলে কোথাও যদিও তখন বোমা পড়লো না কিংবা জাপানীদের আক্রমণও হ'তে দেখা গেল না, কিন্তু আমরা যে দুর্দশায় পড়লুম তার আর সীমা নেই। সব জিনিসেরই দাম অতিরিক্ত রকমে বেড়ে গেল। কিন্তু তাতেও তত দুঃখ ছিল না, বেশি দাম দিলেও যে অনেক জিনিস আদৌ পাওয়া যায় না এই হলো সকলের চেয়ে মুশকিল। বেশি কথা কী, দোকানে নুন কিনতে গেলে পাওয়া যায় না, মংরু খালি হাতে ফিরে এসে বলে,—কোনো দোকানে নুন তো মিলছে না মাজী। আমার শ্বশুর তখন নিজে গিয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে চেনা দোকানদারের কাছে গোপনে নুন কিনে আনেন। স্টোভ জ্বালবার কেরাসিন তেল পাওয়া যায় না, তাও গোপনে সংগ্রহ করতে হয়। কয়লা অত্যন্ত দুর্মূল্য, অনেক সময় পাওয়াই যায় না।

ওগুলো তবু যেমন ক'রে হোক সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু রোগীর জন্যে যা বিশেষ প্রয়োজন সেইগুলোর জন্যেই বেশি ভাবনা। প্রথমত, ডাক্তার পাওয়া যায় না। আমার স্বামীকে যিনি চিকিৎসা করছিলেন তিনি কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছেন। মেডিকেল কলেজের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে নিযুক্ত করা হলো, কিন্তু তিনি রোগী দেখতে প্রায়ই আসতে পারেন না, অনেকদিন সাধ্যসাধনা করবার পরে একদিন আসেন। তিনি নাকি প্রয়োজনমত পেট্রোল পান না, কুপনের সাহায্যে যতটুকু পান তাতেই তাঁকে কায়ক্লেশে চালাতে হয়। দ্বিতীয়ত, ডাক্তার পাওয়া গেলেও ওষুধ পাওয়া যায় না। তিনি যে সমস্ত ওষুধের ব্যবস্থা করেন তার

অধিকাংশই জার্মান কোম্পানির তৈরী, সহজে সেগুলো বাজারে মেলে না, ঠাকুরপো নিজে গিয়ে চেষ্টা ক'রে ব্ল্যাক্-মার্কেট থেকে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করে। তারপরে পথ্যের জন্যে আরো মুশকিল, কারণ সেগুলো প্রত্যহ টাটকা সংগ্রহ করা চাই, একদিন এনে পাঁচদিন ব্যবহার করা চলে না। টাটকা ফল বাজারে প্রায়ই মেলে না, কারণ তার আমদানি হচ্ছে না। টাটকা ডিম অতি দুষ্প্রাপ্য, অনেক দূরে হাতিবাগানের কোন বাজার থেকে মংরু অতি কষ্টে যোগাড় ক'রে আনে। খাঁটি দুধ অনেক দাম দিলেও মেলে না, গোয়ালারা অনেকেই গরু নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়েছে। বাধ্য হ'য়ে আমার মাকে বললুম, তিনি পাথুরেঘাটার বাড়িতে গরু পুষে প্রত্যহ সেখান থেকে দুধ পাঠাতে লাগলেন।

এই সময় সবাই পরামর্শ দিলে, কলকাতা ছেড়ে বাইরে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় আমার স্বামীকে নিয়ে গেলে ভালো হয়। ডাক্তারও বললে, বাইরের জল হাওয়া আর পথ্যের গুণে হয়তো কতকটা উপকার হ'তে পারে, ওষুধের ব্যবস্থা এখান থেকে করা যেতে পারবে। কিন্তু এ পরামর্শ আমার মনঃপুত হলো না। ঠাকুরপো যখন এই নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক করতে এলো তখন আমি তাকে বুঝিয়ে দিলুম যে কেবল জলহাওয়া খেলেই শরীর সারে না। এখানে তবু একটা ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধা হয়েছে। এটা নিজেদের বাড়ি, প্রয়োজন হ'লে এখানে ভালো ডাক্তার পাওয়া যায়, দুষ্প্রাপ্য হ'লেও চেষ্টা করলে তবু ওষুধ-পথ্য কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু বিদেশে অচেনা জায়গায় গিয়ে অব্যবস্থার মধ্যে পড়ে একলাটি রোগী নিয়ে আর বুড়ো শ্বশুরশাশুড়ীকে নিয়ে আমি কোন দিক সামলাবো? সেখানে ভালো ডাক্তার মিলবে না, যদি হঠাৎ রোগটা বেড়ে ওঠে তাহ'লে আমি কী করবো? বাইরে সর্বত্রই ম্যালেরিয়া, যদি ম্যালেরিয়ায় ধরে তাহ'লে কী করবো? যদি বোমা পড়ে' কলকাতায় ফিরে আসবার পথটিও বন্ধ হ'য়ে যায় তখন আমি কী করবো?

ঠাকুরপো বললে,—বোমা পড়বার ভয় বাইরের অন্য জায়গার চেয়ে কলকাতাতেই সবচেয়ে বেশি, কারণ এখান থেকেই যুদ্ধের মাল চালান যায়,

জাপানীরা সে খবর রাখে এখানে বোমা পড়বার ভয় খুব রয়েছে বলেই তোমাদের চলে যেতে বলছি।

আমি বললুম,—তা হোক, কলকাতা মস্ত বড়ো জায়গা, এখানে বোমা পড়লেও তত ভয়ের কারণ নেই, একটা বাড়ি নষ্ট হ'য়ে গেলেও আর একটা বাড়ি ঠিক থাকবে। মনে করো এই বাড়িতেই যদি বোমা পড়ে তাহ'লে আমরা পাথুরেঘাটার বাড়িতে চলে যেতে পারবো। যেখানেই হোক একটা আশ্রয় অন্তত মিলবে।

ঠাকুরপো হেসে উঠে বললে,—এই বাড়িতে যদি বোমা পড়ে তাহ'লে কী তখন তোমরা একজনও পালাবার জন্যে বেঁচে থাকবে? রোজ রোজ এত কাগজ পড়ছো, দেখছো যে এত লোক বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেল, তবুও তোমার প্রাণে ভয় নেই, ঐ রোগী নিয়ে এখনও কলকাতায় থাকতে সাহস করো?

আমি বললুম,—বোমার জন্যে আমার কোনো ভয় নেই, কলকাতা ছেড়ে অন্য জায়গায় ওকে নিয়ে যেতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। এখানেই বেশ আছি। তুমি থামো, তোমায় আর তর্ক করতে হবে না।

যাবো কেমন ক'রে? আমি এই বাড়িটি ছেড়ে এখন যে কোথাও যেতে পারি না। বর্মার যুদ্ধ এখন শেষ হ'য়ে গেছে। সম্ভবত অমর বাবু এতদিন সেখানেই ছিলেন, প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যদলের সঙ্গে নিশ্চয় তিনিও এখন ভারতবর্ষে ফিরে এসেছেন, যে কোনোদিন হঠাৎ এখানে এসে পড়তে পারেন। এখন তাই এ-স্থান ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। হয়তো তিনি ক্লান্ত, হয়তো অসুস্থ, এ সময় হয়তো তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন। সে জন্যে হয়তো আমার কাছেই তিনি ছুটে আসবেন, আমাকে তাই সর্বদা প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে। যদি তিনি এসে দেখেন যে আমি উপস্থিত নেই, তাহ'লে কার কাছে কোথায় গিয়ে তিনি আশ্রয় নেবেন? এই সময়টিতেই আমার সর্বস্ব নিবেদন ক'রে তাঁকে আপন ক'রে নেবার একমাত্র সুবর্ণসুযোগ। আমি প্রত্যহ সেই

প্রত্যাশাতেই উন্মুখ হ'য়ে রয়েছি, এ সময় সহস্র বোমা পড়লেও আমার কোথাও যাওয়া চলে না।

এ বিষয়ে একটা অভাবনীয় সমর্থন পেয়ে গেলুম আমার স্বামীর কাছে। দেখলুম যে তিনিও কলকাতা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হলো না, স্বামীর অনিচ্ছার দোহাই দিয়েই আমি সকলকে থামিয়ে দিলুম। কিন্তু আমার মনে একটা খটকা লাগলো, বরাবরই শুনে আসছি বিদেশে বেডাতে যেতে এঁর খুব শখ, এখন তবে কেন তাতে ইনি এত অনিচ্ছুক, বিশেষ যখন বোমা পড়া সম্বন্ধে এঁর মনে বিলক্ষণ ভয় আছে দেখতে পাই? এই প্রশ্নটা আমাব মনে মনেই হচ্ছিল, কিছুদিন পবে এর একটা সদুত্তর পেয়ে গেলুম।

মংরু সেদিন ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। আবর্জনাগুলো সে ঘর থেকে বারান্দায় এনে ফেললে। তার মধ্যে ছিল একখানা ছেঁড়া খাম। সেই খামটা তুলে নিয়ে সে ঝাঁট দেওযা আবর্জনাগুলো তার মধ্যে ভরতে লাগলো, সমস্তটা কুড়িয়ে নিয়ে রাস্তায় গিয়ে ফেলে দেবে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম, হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়লো ঐ খামটার ওপব। মনে হলো খামটা যেন একটু অস্বাভাবিক রকমের, তাতে বিলাতী এযার-মেলেব নীলবর্ণ একটা লেবেল আঁটা রয়েছে। মংরুকে বললুম,—দেখি দেখি, খামটা নিয়ে আয় তো।

মংরু খামটা এনে আমাকে দেখালে। খামের ওপরে বাঁকা বাঁকা নারীহস্তে আমার স্বামীর নাম লেখা। চিঠিটা বিলাত থেকে এসেছে। মংরুব মুখের দিকে চেয়ে দেখি, সে মৃদু মৃদু হাসচে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম,—তুই হাসচিস কেন? এ চিঠি কোথা থেকে এসেছে তুই জানিস?

মংরু বললে—তোমার নামেও যেমন আগে আগে লিফাফায় ভরা চিঠি আসতো মাজী, তুমি বলতে সে চিঠি আর যেন কারো হাতে না পড়ে, আমি সেইজন্যে পিয়নের কাছ থেকে চেয়ে এনে কেবল তোমার হাতেই দিতুম,—ঠিক তেমনি বাবুর নামেও লিফাফায় ভবা অনেক চিঠি আসে। বাবু বলে দিয়েছে যে

এই চিঠি এলে যেন বাবু ছাড়া আর কেউ না দেখতে পায়। ঐ পিয়নটা আমার দেশের লোক কিনা, আমি আগেই তার কাছ থেকে চেয়ে এনে বাবুর হাতে দিয়ে দিই, চিঠি পেয়েই বাবু আমাকে এক টাকা বকশিশ দেয়। কেমন সব রংবেরংএর টিকিট মারা চিঠি আসে মাজী, তুমি যদি এবার থেকে সেগুলো দেখতে চাও তাহ'লে তোমাকেই আগে এনে দেখাবো।

আমি বললুম,—হাঁ আমি দেখতে চাই, এবার যখন এ রকম চিঠি আসবে তখন আগে আমার কাছে আনবি।

প্রায় মাস খানেকের মধ্যেই এলো আর একখানি এয়ার-মেলের চিঠি। আমার আদেশ মংরুর মনে আছে, সে চিঠিখানি বরাবর পিয়নের কাছ থেকে এনেই আমার হাতে দিলে।

আমি সেই চিঠিখানি নিয়ে গেলুম আমার স্বামীর কাছে। জিজ্ঞাসা করলুম,—এ চিঠি তোমার কোথা থেকে আসে জানতে পারি কী?

তিনি ব্যতিব্যস্ত হ'যে উঠে বসে বললেন,—দাও দাও আমার চিঠি দাও। কোথা থেকে এসেছে সে কথা পরে বলবো, আগে পড়ে দেখি তবে তো?

—তোমায় আর কষ্ট ক'রে পড়তে হবে না, আমিই চিঠিটা খুলে চেঁচিয়ে পড়ছি, তুমি শোনো।

—না না, আমার চিঠি তুমি পড়বে কেন? দাও ওটা আমার হাতে দাও, দেখি কোথা থেকে কে লিখেছে।

—কোথা থেকে কে লিখেছে তা তুমিও জানো, আর আমিও জানি। বিলাত থেকে তোমার চিঠি আসে, মেয়েলি হাতের লেখা। এই একখানি মাত্র আসেনি, এমনি চিঠি তোমার প্রায়ই আসে। মনে করো সে কথা কেউ জানে না, কিন্তু তা নয়। চিঠিগুলো হয়তো পড়েই তুমি ছিঁড়ে ফেল, কিন্তু অসাবধানে খামগুলো ছিঁড়তে ভুলে যাও। খামগুলো আমার নজরে পড়ে, তাতেই সব ধরা পড়ে যায়।

—আমার চিঠি নিয়ে তোমার এত সন্দেহ কেন? এতে ধরা পড়বারই

বা কী আছে? হাঁ, বিলেত থেকেই এসেছে আমার চিঠি, আমার একজন বান্ধবী লিখেছে,—তাতে তোমার কী? প্রত্যেক লোকেরই গোপনীয় বিষয় কিছু থাকতে পারে, সেটা কাউকে জানতে দিতে সে বাধ্য নয়। তোমারও যে কত চিঠি আসে, আমি একবারও দেখতে চাইনা। পরের চিঠির সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করা উচিত নয়, ওটা হচ্ছে অভদ্রতা।

—আমাকে চিঠি লিখতেন কেবল তোমার বন্ধু অমর বাবু, সে তুমি জানোই। আগে লিখতেন বটে, এখন আর লেখেন না। সে চিঠিগুলো সমস্তই আমার কাছে আছে, এখনই এনে তোমাকে দেখাচ্ছি। তার মধ্যে এমন কোনো কথাই নেই যা কাউকে পড়তে দিতে আমার অমন আতঙ্ক হবে। তুমি পড়ে দেখ তার মধ্যে যে সব উপদেশের কথা আছে তা পড়লে তোমারও অনেক উপকার হ'তে পারে। কিন্তু তোমার এই চিঠিখানা আমি তোমার সাম্‌নেই খুলে পড়বো, তাতে আমার যতই অভদ্রতা হোক।

—না না, খবরদার বলছি, আমার চিঠি তুমি পড়বে না।

—তাহ'লে তুমিও এ চিঠি পড়বে না, আগুন লাগিয়ে আমি পুড়িয়ে দিচ্ছি। মনে কোরো না যে হিংসে ক'রে পোড়াচ্ছি। যতদিন অসুস্থ থাকবে ততদিন এই সব গোপনীয় চিঠি একখানিও তুমি পড়তে পাবে না। লুকিয়ে চিঠি পাবার জন্যে সর্বদা উৎকন্ঠিত হয়ে থাকা, মংরুকে তার জন্যে ঘুষ দিয়ে পিয়নের কাছে পাঠানো, লুকিয়ে লুকিয়ে হয়তো রাত জেগে তার জবাব লিখে পাঠানো,—এই সব করলে মনের উত্তেজনা হবে, তাতে শরীর খারাপ হবে। সেইজন্যে এখন এগুলো তোমার পক্ষে বারণ। আগে তুমি সুস্থ হ'য়ে সেরে ওঠো, তখন তোমার যতই চিঠি আসুক, আমি বারণও করবো না, কিংবা তাই নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্যও করবো না।

চিঠিখানা তাঁর সাম্‌নেই দেশলাই জ্বেলে পুড়িয়ে দিলুম। কোনো কথাটি আর না ব'লে তিনি চুপ ক'রে রইলেন। বিজাতীয় একটা আনন্দে আমার মনে হাসি দেখা দিচ্ছিল, কিন্তু সে আমি মুখে প্রকাশ হ'তে দিলুম না।

বর্মার যুদ্ধ শেষ হবার পরেও তিন চার মাস কেটে গেল, তখনও কলকাতায় কোনো বোমা পড়লো না। সাহস পেয়ে তখন পলাতক বাসিন্দারা একে একে শহরে ফিরে আসতে লাগলো। বিদেশে থেকে থেকে শরীর তাদের অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল, প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। চাকরিজীবি বাবুরা সব বুদ্ধি খাটিয়ে মেয়েদের রেখে এসেছিলেন পল্লীগ্রামে, প্রত্যেক উইক্-এণ্ডে গিয়ে দেখাশোনা ক'রে আসতেন। যখন তাঁরা দেখলেন যে সেখানে ঘরে ঘরে হ'তে লাগলো ম্যালেরিয়া, কলেরা, টাইফয়েড, ডিসেন্টি্র, তার ওপরে চোর ডাকাতের উপদ্রব,—তখন তাড়াতাড়ি আবার তাদের কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। এই সব বাবুদের বাড়ির মেয়েরা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে গল্প করতো,—পল্লীগ্রামে খাবার কষ্ট তেমন নেই বটে, কিন্তু রোগে রোগেই সর্বনাশ করে, একদিন সুস্থ থাকতে দেয় না। সে যে কী কষ্ট তা বলবার নয়। এখানে বোমা ফেটে মরি বরং সেও ভালো, কিন্তু এবার কলকাতা ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছিনে। আমাদের খুব শিক্ষা হয়েছে।

ক্রমশ নানারকমের রোগীতে হাসপাতালগুলো আবার দ্বিগুণ ভরে উঠলো, শহরের ডাক্তারদের কাজ অনেক বেড়ে গেল। ওষুধ আর পথ্য যাও আগে কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছিল তাও আর পাওয়া যায় না। জিনিসপত্রের দাম মাঝে কিছু কমেছিল, আবার অনেক বেড়ে গেল। যে ডাক্তার আমার স্বামীকে দেখতেন তিনি আগে বলতেন পেট্রোল পাচ্ছি না, ইদানিং বলতে শুরু করলেন ফুরসং পাচ্ছি না। ওষুধওয়ালারা আগে বলতো—বেশি দাম দিলে সবই আনিয়ে দিতে পারি, ইদানিং বলতে শুরু করলে—ঘরে অনেক মালই রাখা ছিল বটে কিন্তু পনেরো দিনের মধ্যে সব ফুরিয়ে গেল।

কলকাতা শহর আবার দেখতে দেখতে জনাকীর্ণ হ'য়ে উঠলো। পথে পথে আবার তেমনি গাড়ি চলাচল হ'তে লাগলো, পেট্রোল রেশনিংএর খুব কড়াকড়ি সত্ত্বেও অনেক মোটরগাড়ি দেখা যেতে লাগলো। লোকের মুখে আবার হাসি দেখা গেল, যেন কোথাও কিছু হয়নি। কেবল রাত্রে ব্ল্যাক্-আউট হওয়া ছাড়া কলকাতা শহর আগে যেমন ছিল তেমনি আছে।

সবাই এলো ফিরে,—কিন্তু যাঁর আমি নিত্য প্রত্যাশা করছি, তিনি এলেন না। কবে আসবেন তাও জানি না, আসবেন কিনা তাও জানি না। তবে আমি হতাশ হইনি, জানি যে একদিন তিনি নিশ্চয়ই আসবেন। বেঁচে আছেন তাতে সন্দেহ নেই, ভালো আছেন তাতেও সন্দেহ নেই, নইলে আমার মন কিছু একটা অমঙ্গলের ইঙ্গিত পেতো। কিন্তু তবু মাঝে মাঝে অস্থির হ'য়ে উঠি,—আর তো আমার সহ্য হয় না, সহ্যের কী কোনো সীমা নেই? যখন আমার এমনি মনোভাবটা এসে পড়ে তখন আমি জোর ক'রে স্মরণ করি যে—সহ্য করবার এই ব্রতই আমি নিয়েছি। আগেকার মেয়েরা নিষ্ঠালাভের জন্যে যে-সব ব্রত পালন করতো তার চেয়ে এ ব্রত অনেক কঠিন, এত অল্পে আমার অধৈর্য হ'লে চলবে কেন? আরো অপেক্ষা করো, আরো সাধনা করো, আরো সহ্য করো। যতই বেশি সহ্য করবে ততই তোমার ব্রত সার্থক হ'য়ে উঠবে।

এক বর্ষার পরে দ্বিতীয় বর্ষাও কেটে গেল। আষাঢ়-শ্রাবণে আমার মনের মেঘদূতগুলো আবার তেমনি ঘনঘটা ক'রে এলো, আবার তারা আমার পুরোনো স্মৃতিগুলোকে নতুন ক'রে জাগিয়ে খানিকটা বর্ষণ করিয়ে দিয়ে কোথায় উড়ে চলে গেল। নীরব থেকে ক্রমশ নীরবতম হ'য়ে আমি আমার স্বামীর রোগের সেবা ক'রে যেতে লাগলুম। আমার আর অন্য কোনো কাজ নেই, এখন আমার সহ্যব্রতের শুধু এই সাধনা। বুকভাঙা কষ্টসহিষ্ণুতার জীবন কেবল মানুষেরই জন্যে, নিশ্চিন্ত নির্ঝঞ্ঝাট জীবন কুকুর বেড়ালদের জন্যে। উনি তাই লিখেছেন।

পূজোর ছুটি ফুরিয়ে যাবার পরে কলকাতায় আরো বেশি লোকের আমদানি হ'তে লাগলো। পাড়ায় পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে আবার ছেলেমেয়েদের কলরব শোনা যেতে লাগলো। বোমার হুজুগের পরে এখন অনেকদিন কেটে গেছে, ট্রেঞ্চগুলোর মধ্যে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে গেছে, বর্ষার জল জমে সেখানে মশা জন্মাবার খুব সুবিধা হয়েছে। লোকের বাড়ির সাশিতে আঁটা কাগজগুলো এখন উৎসবান্তের ছিন্ন কাগজমালার মতো অধিকাংশই ঝুলে ছিঁড়ে পড়ে গেছে। বড়োলোকদের বাড়ির বালির বস্তাগুলো বর্ষার জলে পচে পচে একেবারে কালো

বিবর্ণ হ'য়ে গেছে, তাকে আর বালির বস্তা ব'লে চেনাই যায় না। সাইরেণের শব্দকে ছেলেরা আর মোটে গ্রাহ্যই করে না, ওর বিকট ভঙ্গীটাকে তারা অনুকরণ ক'রে চীৎকার করতে থাকে। বোমা পড়বার কথাটা লোকে এখন আর সে রকম ভাবে নেয় না, ওটা গল্প জমাবার একটা মুখরোচক বিষয় মাত্র।

কিন্তু ডিসেম্বর মাসে হঠাৎ সত্যিকার বোমা পড়তে শুরু হলো। প্রথমে বোমা পড়লো চট্টগ্রামে, তারপব বড়দিনের সময় পড়তে লাগলো কলকাতায়। প্রথম বারের পরেই যখন দ্বিতীয় বারে আবার প্রায় ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই বোমা পড়লো তখন লোকে বুঝে নিলে যে এটা এবার প্রাত্যহিক চলতে থাকবে। কিন্তু আগে যাবা বোমার নাম শুনেই পালিয়েছিল তারা সেটা প্রত্যক্ষ দেখে এবার আর তত পালাবার জন্যে ব্যস্ত হলো না। এবার পালাতে লাগলো যত ঝি-রাঁধুনি-চাকরবাকর মুটে-মজুরেব দল, যাদের না হ'লে আমাদের একদণ্ড চলে না। তারা রেলগাড়ির প্রত্যাশায রইল না, লোটাকম্বল আর মোট-পোটলা বেঁধে নিয়ে দলে দলে পদব্রজেই দেশে ফিবে চলল। শহরের ধাঙড় মেথর সব পালিয়েছে, রাস্তায় রাস্তায় ধুলোজঞ্জালগুলো স্তূপাকার হ'যে জমে আছে। ডাষ্টবিনগুলো আবর্জনায় চাপা পড়ে গেছে, সেখানে ভন্ ভন্ ক'রে মাছি উড়ছে। আমাদের হলো মহা বিপদ। বাড়ির ঝি চাকর আর রাঁধুনি সবাই ছেড়ে গেল, বাকি বইল কেবল মংরু আর আমার শ্বশুবের এক বুড়ো দরোয়ান। মংরু বললে,—এত ভাবনা কিসের মাজী? আমি জল তুলবো, বাসন মাজবো, ঘরদোর পরিষ্কার করবো, বাজার ক'রে আনবো; এ-সব কাজ আমি একলাই ক'রে দেবো, আপনি শুধু রান্না করুন। কিন্তু যে-রোগীর নড়াচড়া করা নিষেধ তার সর্বক্ষণ সেবা করা আব সংসারের সমস্ত রান্না করা একজনের পক্ষে অসম্ভব। আমার শাশুড়ী এখন কিছুই করতে পারেন না। কাযক্লেশে তবু আমি একাই সব কাজ চালিয়ে দিতে লাগলুম।

ভদ্রলোকদের মধ্যে যারা খুব বেশি ভয় পেয়ে গেছে তারা কেউ কেউ তখন কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। আমার দাদা শঙ্করও দেখলুম সেই দলে। সে

একে অত্যন্ত ভীতু মানুষ, বোমার শব্দ মোটে সহ্য করতে পারে না, তার ওপরে বৌটি রয়েছে, তাকে রক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয় বারের রাত্রে বোমা পড়বার পরেই তৃতীয় দিন সকালে সে এসে আমাকে বললে,—বনগাঁয়ে একটা বাড়ি ঠিক ক'রে ফেলেছি, সেখানে আমাদের পৌঁছে দেবার জন্যে দুশো টাকা দিয়ে একটা লরিও ভাড়া করেছি। আজই খাওয়াদাওয়ার পরে চলে যেতে হবে, কলকাতায় আর একটা রাত্রিও থাকা উচিত নয়। ওরা দুদিন পরখ ক'রে দেখে নিলে, এবার আজকের বোমাগুলো নিশ্চয় খুব জোরালো হবে, কলকাতায় একটাও বাড়ি আর আস্ত থাকবে না। এই বেলা তোরাও তৈরী হ'য়ে নে, আজই আমাদের সঙ্গে যাবি। যোগেন বাবুকে এখানে রাখা আর কিছুতেই উচিত নয়। তোরা সবাই চল, কেবল সুরেন এখানে থাকুক বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে।

আমি বুঝতে পারলুম ঠাকুরপোর সম্বন্ধে কোনখানে ওর ভয়। একটু হেসে বললুম,—ঠাকুরপোকে না নিলে কেমন ক'রে চলবে, ওঁর ওষুধপত্রের হাঙ্গামা কে পোয়াবে?

দাদা বললে,—না না, ওকে নিয়ে গিয়ে এখন কাজ নেই। সেখানে তো মাত্র তিনখানি কুঠুরি পেয়েছি, কোথায় ওকে জায়গা দেবো? মেয়েরা যে ঘরে থাকবে সে ঘরে তো আর ওকে থাকতে দিতে পারি না।

—তবে থাক দাদা, আমাদের গিয়ে কাজ নেই। তিনখানি ঘর নিয়ে তোমাদেরও কষ্ট হবে, আর ঐ রোগী নিয়ে আমাদেরও কষ্ট হবে।

—তুই বুঝছিস না গীরা। বোমার শব্দ শুনে যোগেন বাবুর কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে, এমন কি উনি হার্টফেল হ'য়ে মারাও যেতে পারেন। আগে ঐ বাড়িতে গিয়েই সবাই প্রাণে বাঁচুক, তার পরে আরো একখানা বাড়ি দেখেশুনে নেওয়া যাবে, তখন সুরেনও সেখানে যেতে পারবে। নে নে, তাড়াতাড়ি তৈরী হ'য়ে নে।

—না দাদা, তোমরাই আগে যাও। একটা বাড়ি ঠিক ক'রে আমাদের খবর দিলে তখন না হয় আমরা যাবো। আর বনগাঁয়ে শুনেছি ভীষণ ম্যালেরিয়া

হয়। ঐ রোগী নিয়ে সেখানে কী যাওয়া উচিত? এর ওপরে যদি ম্যালেরিয়া ধরে তাহ'লে আরো বিপদ হবে।

—আরে দূর করো ছাই ম্যালেরিয়া, আগে প্রাণে বাঁচি, তারপরে না হয় ম্যালেরিয়ার কথা ভাবা যাবে। বেশি কথা কাটাকাটি করিস নে, আমি বলছি তৈরী হ'যে নিয়ে পালিয়ে চল। অনেক কষ্টে একটা লরি জোগাড় করেছি, এর পরে লরিও আর মিলবে না। রেল লাইনগুলো বোমায় চূরমার হ'য়ে যাবে, ট্রেণও আর তখন চলবে না। আজ না গেলে আর যেতেই পারবি না।

—তা হোক দাদা, তোমরা যাও, আমরা এখানেই থাকবো। কোনো ভাবনা নেই, এখানে বোমা পড়লেও আমাদের কিছু হবে না।

—বড্ডো তোর সাহস দেখছি। জানিস না তো, আজকের রাত্রে যে বোমা পড়বে তাতে সমস্ত শহরটাই ধুলোর মতো গুঁড়িয়ে যাবে। কথাটা ভেবে দেখ, সবাই তোরা একসঙ্গে মারা যাবি।

—তা হোক দাদা, তবুও আমরা যাবো না, তোমরা যাও।

দাদা আমাকে বিলক্ষণ চেনে, আর বেশি জেদাজেদি করলে না, মুখখানা অত্যন্ত বিমর্ষ ক'রে চলে গেল।

দাদার কথা-সত্যি হলো, সেদিন রাত্রে শহরের লোকালয়ের মধ্যেই অতি প্রচণ্ডভাবে বোমা পড়লো। হাতিবাগানের বাজারের একটা অংশ ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। কয়েকটা বাড়িও ধ্বংস হলো, অনেক লোক জখম হলো, কয়েকজন মারাও গেল। সাইরেণ বাজার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন আমার স্বামীকে নীচের ঘরে নিয়ে গিয়ে সেখানেই সকলে আশ্রয় নিয়েছিলুম। জাপানী বোমারুগুলো গুম্‌গুম্ শব্দ করতে করতে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল, তারপরেই যে ভীষণ বোমা ফাটার শব্দ হ'তে লাগলো তাতে বাড়ির দেয়াল সুদ্ধ কাঁপতে লাগলো। দেখেশুনে আমিও ভয় পেয়ে গেলুম। বাবা বলতেন, বুঝে দেখলে কোনো জিনিসেই ভয় লাগেনা, না বুঝতে পারলেই যত ভয়,—সেই কথা তখন আমার মনে পড়লো। আমি বুঝে দেখলুম যে, বাড়ির মাথার ওপরে বোমা

পড়লে তখন ভয় ক'রেও কোনো পরিত্রাণ নেই, কিন্তু তা না হ'য়ে একটু দূরে বোমা পড়লে হয়তো তার ধাক্কাটা বাড়ির গায়ে লাগবে বটে, কিন্তু দরজা জানলা বন্ধ ক'রে কানে তুলো দিয়ে বসে থাকলে ভয় পাবার বিশেষ কারণ নেই।

পরের দিন সকালে আমার শাশুড়ী বললেন,—চলো বৌমা এখান থেকে চলে যাই, এখানে থাকলে আর আমার যোগেনকে বাঁচাতে পারবো না।

আমি বললুম,—কোনো ভয় নেই মা, এখানে তবু একটা চিকিৎসা চলছে, পাড়াগাঁয়ে ম্যালেরিয়ার দেশে গেলে আরো খারাপ হবে। দেখলেন না যারা আগের বারে পালিয়েছিল তারা কী অবস্থা নিয়ে ফিরে এসেছে? এখন তারা আর কেউই কোথাও যেতে চায় না।

আমার শ্বশুর বললেন,—চলো বৌমা বনগাঁয়েই বরং যাওয়া যাক। এখানে আর দুধ মাছ তো দূরের কথা, কাঁচকলাটিও বরং পাওয়া যাবে না। তখন নিজেই বা খাবে কী আর ওকেই বা খেতে দেবে কী?

আমি বললুম,—কিছু ভয় নেই বাবা, আমি অনেক জিনিস কিনে কিনে সংগ্রহ ক'রে রেখেছি। বাজারে যদি কিছু নাও মেলে তবু সাত আট দিন এমনি চালিয়ে দিতে পারবো। আরো দুটো দিন দেখুন না, নিতান্ত যদি বেগতিক হ'যে ওঠে তখন না হয় যাওয়া যাবে। এখানে চাল ডাল অনেক কেনা রয়েছে, সেগুলো ফেলে যাবোই বা কোথায়? গেলেই সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।

আমার স্বামী বললেন,—এখানে আর থাকা উচিত নয়, চলো পুরী কিংবা ওয়ালটেয়ার চলে যাই। বিলেতের লোকেরাও বোমার ভয়ে বড়ো বড়ো শহর থেকে ইভ্যাকুয়েট করচে, আমাদেরও তাই করা উচিত। নইলে প্রত্যেক রাত্রে সাইরেণ বাজবে আর ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যেতে হবে, এটা একটা নুইসেন্স। ওতে আরো আমার শরীর খারাপ হ'য়ে যাবে। জাপানী ব্যাটারা তো সহজে ছাড়বে না, হয়তো কোনোদিন মাথার ওপরেই বোমা ফেলবে। কী মুশকিলেই পড়া গেছে।

আমি বললুম,—তুমি যেখানকার নাম করছো সেখানে সমুদ্রের ধারে তো আরো ভয়ের কথা। আর আমি একাই বা তোমাকে নিয়ে সামলাবো কেমন ক'রে? ঠাকুরপো হয়তো যেতেই চাইবে না, বিদেশে একটা কিছু হ'লে তখন তোমাকে নিয়ে আমি মহা বিপদে পড়বো। এখানে তো আরো কত লোক রয়েছে, আমরা কী কেবল একাই আছি? তুমি বরং আজ থেকে নীচের ঘরেই শুয়ো, তাহ'লে আর রাত্রে উঠতে হবে না।

ঠাকুরপো বললে,—আর এখানে একদিনও থাকা উচিত নয় বৌদি, আমরা সবাই মিলে কোথাও যাই চলো। বনগাঁয়ে না যেতে চাও, বর্ধমানে চলো, সেখানে আমার এক ফ্রেণ্ড আছে, তাদের বাড়িতে গিয়েই ওঠা যাবে। সেখানে ভয়ের কোনো কারণ নেই। ভালো ভালো ডাক্তার আছে, আর আমিও সঙ্গে থাকবো। শুনেছি সেখানে অনেক বেড়াবার জায়গা আছে, তোমাকে রোজ বেড়িয়ে আনবো। বেশ থাকা যাবে, এখানকার মতো মনমরা হ'য়ে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে না।

আমি বললুম,—এখান থেকে কোথাও আমি নড়ছি না। শহরের মধ্যে আর বেশি বোমা পড়বে না, প্রথমটায় যা হবার তা এই হ'য়ে গেল। এর পরে যতই উৎপাত হোক, আমাদের তাতে আর বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে না, তুমি দেখে নিও।

—জাপানীরা তোমার কানে কানে ব'লে গেছে বুঝি এই কথা? যেখানে স্বয়ং তুমি অধিষ্ঠান করছো সেখানে কী তারা কোনো অনিষ্ট করতে পারে? যেখানেই যাই করুক, এই বাড়িটিকে তারা বাদ দিয়ে যাবে।

—তা নাই বা হলো, ভয় পেয়ে আঁকুপাকু না ক'রে ব্যাপারটা বুঝে দেখতে হবে তো? নিরীহ লোকদের মেরে ওদের কী লাভ আছে? হয়তো দু'একবার তাই ক'রে ফেলেছে, কিন্তু বার বার করবে কেন?

—যুদ্ধের সময় তোমার মতো অত 'কেন'র বিচার কেউ করে না, যেখানে সুবিধে পায় সেখানেই বোমা মারে। আজকালকার যুদ্ধে তাই দেখছো

না, সৈনিক তত বেশি মরে না, তার চেয়ে অসৈনিক সাধারণ মানুষরাই বেশি মারা পড়ে।

—বেশ তো, তাও যদি হয়, এটুকু আমাদের সহ্য করা উচিত। সব দেশের লোকে তাই করচে। দুর্যোগের যুগে পৃথিবীতে বাস করবো, অথচ নিজের গায়ে আঁচড়টি লাগতে দেবো না, তা কখনো হয় না। চীন দেশের লোকেরা কত সহ্য করচে! তার তুলনায় এখানে এমন কিছুই হয়নি যার জন্যে ঘরবাড়ি ছেড়ে, সমস্ত আশাভরসা ছেড়ে এখান থেকে পালিয়ে যেতে হবে।

—আমি সব বুঝি বুঝি, কিসের আশাভরসা ছেড়ে তুমি কোথাও যেতে চাও না, সে কথা আমি জানি। কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি যে সে মহাপ্রভু আর আসছেন না, যতই কেন তুমি আশা ক'রে বসে থাকো। একদিন তুমি নিজেই বলতে বাধ্য হবে যে আমার কথা সত্যি।

—তোমার কথা মিথ্যা হ'য়ে যাবে, কোনো আশাই আমাকে ছাড়তে হবে না।

—এখনো তোমার এত মনের জোর? আচ্ছা, আরো কিছুদিন দেখা যাক।

—কিছুদিন কেন, চিরকালই এমনি দেখবে।

—তুমি কী একবারও ভেবে দেখছো না, যে তোমার নিজের মনের একটা খেয়ালের জন্যে তুমি এতগুলি লোকের জীবনকে বিপন্ন করছো? হয়তো এক-জনকে তুমি নেহাত ভালোই বেসেছো, কিন্তু আর কী তোমার কেউ নেই? যারা রয়েছে তোমার ভক্তির পাত্র, তোমার স্নেহের পাত্র—তোমার স্বামী, তোমার বন্ধু,—এরা কী তোমার কেউ নয়?

—কেউ না, কেউ না। আমার কথায় যেন মনে দুঃখ কোরো না। তুমি বলতে বাধ্য করলে তাই বলছি। মীরাবাঈএর একটা গান আছে, জানো না বোধ হয়। আমার বাবা প্রায়ই সে গানটা গাইতেন। তোমাকে আজ সেটা বলি শোনো—

মেরে গিরিধর গোপাল দুসর ন কোই
যাকে শির ময়ূর মুকুট মেরে পতি সোই।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপন ন কোই
অবতো বাত ফৈল গযি জানে সব কোই।
অঁসুবণ জল সিঁচ সিঁচ প্রেম বীজ বোই
মীরা প্রভু লগন লগি যো হোয সো হোই।

মীরাবাঈ একদিন বলেছিলেন এই কথা,—আমার একমাত্র সেই গিরিধারী গোপাল, তা ছাড়া আর দ্বিতীয় কেউ নেই, কেউ নেই। যাঁর মাথায় রয়েছে ময়ূরের মুকুট, একমাত্র তিনিই আমাব পতি। বাপ মা ভাই বন্ধু কেউ আমার আপনার নয়—এ কথা তো সবত্র প্রচার হ'যে গেছে, এখন সবাই জানে এই কথা, লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। মীরা তার প্রভুব সঙ্গে মিলনের জন্যে প্রেমের বীজ বপন ক'রে সেখানে অনবরত অশ্রুজল সিঞ্চন করছে, এখন যা হবার তাই হোক,—মীরা তাতে ডবায না।

ঠাকুরপো আমার কথাগুলো শুনে মুখখানাকে বিকৃত ক'বে চলে গেল, আর কোনো কথা বললে না।

এবার কিন্তু আমি সকলকে আশ্বাস দেবাব জন্যে যা বলেছিলুম তাই হলো, সেদিন বাত্রে সত্যিই বোমা পড়লো না। অনেক রাত পর্যন্ত প্রতীক্ষায় জেগে থেকে শেষরাত্রে আমবা নিশ্চিন্ত হ'যে ঘুমিযে পড়লুম।

ভোরের ঘুমটা খুব গভীর হয়েছিল, একটা শব্দ শুনে হঠাৎ জেগে উঠলুম। জেগে উঠেই প্রথমে ভাবলুম নিশ্চয সাইরেণ বাজছে, সকলকে জাগিয়ে তুলি। বোমার ভয়ে নীচের তলায় এক ঘরেই সবাই মিলে শুয়েছি। সকলকে জাগাবার আগে একটু কান পেতে শুনলুম,—সাইরেণ নয়, বাইবেব দবজাতে কে সজোরে কড়া নাড়ছে। মংরু শুয়েছিল দরজার এক পাশে মেঝেতে, তাকে তুলে দিয়ে বললুম,—দেখতো দবজায় কে কড়া নাড়ছে?

মংরু একটু পরেই ফিরে এসে অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে বললে,—মস্ত ভারী একজন পল্টনের লোক মাজী, বাবুর নাম ধরে বলছে এখনই ডেকে দাও।

বাইরের জানলা দিয়ে আগে উঁকি মেরে দেখতে গেলুম,—দেখেই চিনতে পারলুম।

অমর বাবু এতদিন পরে ফিরে এসেছেন দেখে বাড়িময় হুলস্থূল পড়ে গেল, ঘুমচোখে উঠেই সকলে মহা কলরব করতে লাগলো। আমি কিন্তু সেখানে আর মোটেই দাঁড়ালুম না,—তাড়াতাড়ি পালিয়ে একেবারে রান্নাঘরে চলে গেলুম চা তৈরী করতে। বহুদিন অদর্শনের পরে আপনার লোককে দেখলে যে তার কাছে যেতে এমন লজ্জা করে এ কথা আমি আগে জানতুম না।

মংরু রান্নাঘরে গিয়ে আমাকে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলে,—ও কে মাজী?

—জানিস না? উনি যে তোদের সেই মনিব রে! তোর ঠাকুরদাদার পুরোনো মনিব।

—বহুৎ ভারী আদমি মাজী। আজই সেই বুড়া দাদাকে চিঠি লিখে জানাতে হবে। দাদা ব'লে দিয়েছিল, যখনই বাবু ফিরে আসবে তখনই তাকে খবর দিতে।

—না না, তাকে আর আসতে লিখিস না, এখন থেকে তুইই ওঁর কাজ করবি। বলতে বলতে হঠাৎ উনি একেবারে রান্নাঘরে গিয়েই উপস্থিত,—কৈ চাএর আর কত দেরী?

আমি ওঁর মুখের দিকে মোটে চাইতে পারি না। নবোঢ়ার মতো লজ্জায় একেবারে জড়িয়ে যাই, গায়ের কাপড়টাও সামলাতে পারি না, মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরোয় না। অনেক কষ্টে মাথা নীচু ক'রে বলি,—চলুন এখনই চা নিয়ে যাচ্ছি। তারপরেই যেন কত ব্যস্ত এমনি ভাবে মংরুকে কাছে ডেকে পিছন-দিকে ফিরে তাকে চুপি চুপি বলি,—ওরে ছুটে গিয়ে সেই আলমারি খুলে টি-সেটটা নিয়ে আয়, আর চিনির কৌটোটা, আর সেই ছোটো চামচ ক'খানা—

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের মজলিশ বসলো, সেই আগেকার দিনের মতো।

কিন্তু কোথা থেকে আমার এমন অদ্ভুত লজ্জা আর আড়ষ্টতা এসে উপস্থিত হলো, কথা বলতেই আমার কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগলো। আমি একটি কোণে চুপ ক'রে বসে ওঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগলুম। অমর বাবু বলছিলেন তাঁর যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা। একেবারে সাক্ষাৎ মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছেন, গুলির মুখে পড়েও অসম্ভব রকমে প্রাণরক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু এ সব কথা শুনেও আমি খুব আশ্চর্য হইনি। যতই বিপদে পড়ুন, আমার কাছে উনি একদিন ঠিকই ফিরে আসবেন এটা আমি জানতুম। শুধু তাই নয়, মারাত্মক রোগেও অনেক ভুগে তার থেকে বেঁচে এসেছেন। এই সব কথাই তো আমি দিনরাত ভাবতুম। যা ভেবেছি তাই হয়েছে। রোগ থেকে সেরে উঠে অনেক চেষ্টার পরে ছুটি পেয়ে বরাবর আমাদের কাছে এসেছেন। মাত্র তিন মাস ছুটি।

খানিকটা রাত্রি হ'তেই সেদিন আবার বোমা পড়তে শুরু হলো। তখনও আমরা হাসচি, গল্প করচি। সেদিন ছিল বড়দিনের সন্ধ্যা. সাহেব মহলে মহা উৎসব চলেছে, আমাদের বাড়িতেও তখন আনন্দের উৎসব। আমরা বলতে লাগলুম, ঠিক সময়েই বোমা পড়েছে, জাপানমন্ত্রী তোজো আমাদের জন্যে বড়দিনের উপহার পাঠিয়েছে। বোমাগুলো পড়ছিল শহরের মধ্যেই, কতক আমাদের পাড়ার কাছাকাছি, কতক ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে। কিন্তু সেদিন একটুও আমি ভয় পাইনি। যদি এখন মাথার ওপরেও বোমা পড়ে তাতেই বা আর দুঃখ কী ?

অমর বাবু আমার স্বামীকে বললেন,—এখানে আর তোমার থাকা উচিত নয়, চলো সবাই মিলে একটা স্বাস্থ্যকর জায়গায় যাওয়া যাক। তোমারও এখন কিছু দিন ভালো রকম বিশ্রামের দরকার, আমারও কতকটা সেই অবস্থা। শরীরটা মোটে ভালো ক'রে সারে নি। আর তোমার যা রোগ, স্যানাটোরিয়মের মতো কড়াকড়ি ব্যবস্থায় না রাখলে তুমি সারবে না। সে কাজটা আমার দ্বারাই এখন হবে ভালো।

—বেশ তো, কোথাও চলো না ভাই, এখানে আমারও আর ভালো লাগছে না। আমি তো অনেক আগেই তোমার কাছে রাওলপিণ্ডিতে পর্যন্ত যেতে চেয়েছিলুম, তুমি হঠাৎ বদলি হ'য়ে যুদ্ধে চলে গেলে, তাতেই আর যাওয়া হলো না। তুমি কাছে থাকলে তো আমি বেঁচে যাই। কোথায় যাবে বলো, যেখানে যেতে বলবে সেখানেই আমি রাজি।

—চলো দার্জিলিং-টার্জিলিং একটা কোথাও যাওয়া যাক।

—কী সর্বনাশ, এই শীতের সময় দার্জিলিং? এ-তো মহা মুশকিলের কথা।

—কেন শীতের সময়ই তো আরো ভালো, বেশ বরফ পড়া দেখা যাবে। বরফ পড়লে স্বাস্থ্য ভালো থাকে, সেই জন্যেই তো রোগীরা সুইজারল্যাণ্ডের স্যানা-টোরিয়মে যায়।

—না ভাই, কাজ নেই অত সাহস ক'রে, শেষকালে ঠাণ্ডা লেগে মরবো? তার চেয়ে চলো বরং গালুডি, সেখানে আমার এক ব্যারিস্টার বন্ধুর বাড়ি আছে, চাইলেই পাওয়া যাবে। জায়গাটা নাকি এই শীতের সময় খুবই স্বাস্থ্যকর।

—চলো, আমি রাজি, কবে যাচ্ছো বলো?

—আগে দেখি নীরা আবার রাজি হয় কিনা, ওকে নিয়েই মহা মুশকিল।

আমি তখন একটু সলজ্জ হেসে বললুম,—উনি যখন সঙ্গে যাবেন বলছেন তখন রাজি হবোনা কেন?

সুরেন ঠাকুরপো আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ওর দিকে আর চাইতে পারলুম না, মুখটা আমি ফিরিয়ে নিলুম। সেইদিন রাত্রেই ঠাকুরপো আমাকে বললে,—সে আমাদের সঙ্গে যাবে না, কলেজ কামাই করলে তার পড়াশোনার ক্ষতি হবে।

অমরনাথের কথা

ট্রেঞ্চ থেকে উঠে সেই যে অজ্ঞান হয়েছিলাম, তার তিন চারদিন পরে আমার জ্ঞান হোলো। তাও মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে, চেয়ে দেখলাম আমি কোথাকার একটা হাসপাতালে রয়েছি। তারপরে আবার অজ্ঞান হ'য়ে পড়লাম। এই রকম অজ্ঞান অবস্থায় আরো দু একদিন কাটাবার পরে ভালো ক'রে জ্ঞান ফিরে এলো।

আমাকে উদ্ধার ক'রে প্রথমে আমাদের দলের লোকেরা ভেবেছিল যে শক্ পেয়ে আমি অজ্ঞান হ'য়ে গেছি। কিন্তু কিছুতেই যখন জ্ঞান হয়না, আবার তার সঙ্গে সঙ্গে খুব জ্বর রয়েছে,—দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। মনে করলে মেনিঞ্জাইটিস্ হয়েছে। তারা স্থির করলে সেখানে আমাকে আর রাখাই উচিত নয়। রোগটা আমার পক্ষে মারাত্মক, আর ওদের পক্ষে সংক্রামকও হ'তে পারে। তখন সেই অবস্থাতেই মাথায় বরফ দিয়ে অন্যান্য আহত সৈনিকদের সঙ্গে আমাকে এরোপ্লেনে ক'রে তারা পাঠিয়ে দেয় ভারতবর্ষে গৌবাটের এক মিলিটারি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার বন্দোবস্ত খুব ভালো, তৎক্ষণাৎ রক্ত পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় যে আমার ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল যে আরো একটি মারাত্মক ব্যাধি গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। রীতিমত চিকিৎসা চলতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে রোগগুলো দমন হ'য়ে এলো।

কিন্তু রোগ দুটি সারবার পরেও আমি বহুকাল দারুণ অসুস্থ হ'য়ে রইলাম। বোধ হয় শক্ পেয়েই আমার স্নায়ুশিরাগুলো বিলকুল বিগড়ে গিয়েছিল। বিছানা ছেড়ে মোটে উঠতেই পারি না, এমন একটা অব্যক্ত যন্ত্রনায় ছটফট করতে থাকি যার কোনো নির্দেশ দিতে পারি না, থেকে থেকে অহেতুক ভয় পেয়ে চীৎকার ক'রে উঠি। খাট থেকে নেমে খাটের তলায় গড়িয়ে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে

থাকি, মাঝে মাঝে ভুল বকতে শুরু করি। ঘুমের ওষুধ খেলেও আমার ঘুম হয় না। দুজন ডাক্তারে মতদ্বৈধ ঘটলো,— একজন বললে শক্ পেয়ে হয়েছে, একজন বললে ম্যালেরিয়াতে হয়েছে। কিন্তু যে জন্যেই হ'য়ে থাক চিকিৎসা চলতে লাগলো,— আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রে, ব্রোমাইড, আরো অনেক কিছু।

হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তিন মাসেরও বেশি, তারপর সেখান থেকে অব্যাহতি পেলাম। সেখান থেকে আমাকে ওরা পাঠালে সিমলার এক ক্যাম্পে। বললে ওখান থেকেই তুমি দেশে যাবার ছুটি পাবে। কিন্তু সেখানে কিছুতেই ছুটি দিতে চায় না। বললে,—ছুটিতে গেলে আবার তুমি অন্য রকমের রোগ নিয়ে আসবে, দেখা যাচ্ছে যে সকলেই এই কাণ্ড করছে। আমি বললাম,— ছুটি দাও আর নাই দাও, ফিল্ড্ সার্ভিসে যেতে এখন পারবো না। ওরা তখন সেখানেই আমাকে একটা হাল্কা রকমের কাজের ভার দিলে। আমি উপরওয়ালা অফিসে অনবরত ছুটির দরখাস্ত পাঠাতে লাগলাম। অনেক কাল পরে পাওয়া গেল সেই অভিবাঞ্ছিত ছুটি। তৎক্ষণাৎ কলকাতা অভিমুখে রওনা হলাম।

সিমলায় থাকতে একজন নৌবিভাগের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারে তার বাড়ি, রয়্যাল নেভিতে সে কাজ করতো। রেঙ্গুণের কাছে কোন এক জাহাজডুবিতে সে আহত হয়, আঘাত সেরে ওঠবার পরে কিছুকাল বিশ্রামের জন্যে তাকে সিমলায় পাঠানো হয়। ওখান থেকে সেও আমার মতো ছুটির দরখাস্ত করেছিল। কিন্তু তাকে ছুটি দিতে গেলে বহুকালের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে, সে এখন অসম্ভব। তার ওপরে হুকুম এলো কলকাতায় গিয়ে কাজে যোগদান করতে এবং সেখান থেকে ছুটির দরখাস্ত করতে। আমরা দুজনেই কলকাতায় যাবার জন্যে এক সঙ্গে ট্রেণে উঠলাম।

লোকটা খুব জোয়ান, কিন্তু ট্রেণে উঠে এমন ভাবে বসলো যেন একেবারে বলশূন্য। মুখখানা অতি বিষণ্ণ, মাথায় হাত দিয়ে এমনি এক শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, যেন ভিতরটা তার অসাড় হ'য়ে গেছে। জামার বোতাম সবগুলো খোলা, প্যাণ্ট্‌টা কোমর থেকে অনেকখানি নিচে নেমে পড়েছে, চামড়ার বেণ্টটা

খানিক ওপরে উঠে গেছে। পায়ের জুতো জুটো হাঁ হ'য়ে আছে, যেন কোনো কালেই তার ফিতে বাঁধা হয় না। আমি তাকে ডেকে বললাম,—এমন হতাশ হ'য়ে চুপচাপ বসে আছো কেন, একটু গল্প করি এসো। সে কোনো জবাবই দিলে না।

একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতে সে নেমে গিয়ে ডাইনিং কার থেকে নিয়ে এলো হুইস্কির বোতল আর সোডা। ফিরে এসে বসেই সে হুইস্কি ঢেলে খেতে আরম্ভ করলে। গ্লাস হাতে নিয়ে চুপ ক'রে বসে বসে কি ভাবে, আর থেকে থেকে কয়েক চুমুক হুইস্কি খায়। পুরো এক গ্লাস খেয়ে নেবার পরে যেন তার ধড়ে প্রাণ এলো, তখন ওদিকের বেঞ্চ থেকে সে উঠে এসে আমার কাছে বসলো, নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আমাকে একটা সিগারেট দিলে। তারপরে বললে,—আমার গল্প শুনতে চাও? তবে শোনো। এই ব'লে নিজের মনেই সে নিজের ঘরের খবর ব'লে যেতে শুরু করলে। তার চল্লিশ বছর বয়স পার হ'য়ে গেছে, এখনো বিয়ে হয়নি। ইচ্ছে ছিল ছুটি পেলে দেশে গিয়ে একটা ভালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ক'রে দিনকতক জীবনটা এন্‌জয় ক'রে আসবে, কিন্তু কে জানে কবে ছুটি পাবে। দু বছর হ'য়ে গেল দেশ ছেড়ে এসেছে, দেশের বাড়িতে কেবল এক বুড়ো মা আছে, তারও কোনো চিঠিপত্র আসে না। দুটো ভাই ছিল, তার মধ্যে একটা ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধে মারা গেছে, আর একটা ভাই এরোপ্লেন চালায়, আট মাসের মধ্যে তারও কোনো চিঠি পায়নি। তবে তার মা আর ভাই নিশ্চয় এখনো বেঁচে আছে, ঘরে গেলে যাহোক একটা খবর আসতো।

নিজের কাহিনী বলতে বলতে হঠাৎ সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে,—একটু হুইস্কি খাবে? আমি বললাম,—না থ্যাংক্‌স, হুইস্কি আমি খাই না। সে বললে,—হুইস্কি খাবার দরকার নেই, এমনিতেই তোমার যথেষ্ট ফুর্তি আছে দেখতে পাচ্ছি। কলকাতায় যাচ্ছো, সেখানেই বুঝি তোমার বাড়ি? সেখানে তোমার স্ত্রী আছে বুঝি? আশা করি তুমি বিবাহিত?

আমি বললাম—হাঁ, আমার স্ত্রী আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের কাছেই যাচ্ছি।

মুখখানা তার হাসিতে ভরে গেল। উত্তেজিত হ'য়ে বললে—আমি ঠিক ধরেছি। ট্রেণে ওঠার পর থেকেই তুমি যে বাড়ি পৌছবার জন্যে কত ছট্‌ফট্ করছো, তোমার মুখ দেখেই তা আমি বুঝতে পেরেছি। তোমার সৌভাগ্যে আমি কন্‌গ্রাচুলেট করি। আপনার লোকের কাছে ফিরে যাওয়ার মতো আনন্দ মানুষের জীবনে আর কিছুই থাকতে পারে না। তোমার পক্ষে সেটা আজ অতি সহজ, কিন্তু আমার পক্ষে কত কঠিন। ভগবান যে আছেন, সে কথা নিশ্চয় এখন তুমি স্বীকার করবে ?

বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টস্‌টস্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়লো।

কলকাতায় এসে মীরাকে দেখে আমি আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। এরই মধ্যে সে আরো কত অপরূপ হ'য়ে উঠেছে! ওর রূপের মধ্যে এবার এক নতুন জিনিসের সন্ধান পেলাম যা আগে কখনো দেখিনি। একটু রোগা হ'য়ে গেছে, যেন তপস্যাক্লিষ্ট গৌরীর মতো। কিন্তু চোখে কিছুমাত্র অতৃপ্তির জ্বালা নেই, বিনম্র দৃষ্টিতে যেন কি এক অনির্বচনীয় মিষ্টতা ভরা। ফুলের যে সুরভি, তাই যখন ভিতরে ভিতরে জমতে থাকে, সেই তো হয় মধু। যে ফুলে মধুর সঞ্চয় হয়েছে তার চেহারা হয় স্বতন্ত্র রকম। বাইরের লোকে এতটা বুঝতে না পারলেও ভ্রমর দূর থেকে দেখলেই বুঝতে পারে। মীরার হৃদয়ের মধু বহুদিনের সঞ্চয়ে নির্যাসের মতো ঘনত্বপ্রাপ্ত। তারই গুরুভারে সে আমার দিকে মুখ তুলে চাইতে পারে না, যেন আমাকে দেখেনি এমনি ভাবে মংকুর দিকে চেয়ে কথা বলে। ওটি শুধু ওর লজ্জা নয়, ওটি ধরা পড়ে যাবার ভয়। হৃদয়ের মধ্যে কত মধু ছাপাছাপি হ'য়ে আছে সেই খবরটা আমার কাছে জানাজানি হ'য়ে যাবার ভয়। জানে যে ও কিছুই ঢাকতে পারবে না, তবু মিছামিছি কেবল চেষ্টা করে।

ঠিক হ'য়ে গেল যে এক সপ্তাহের মধ্যে ওদের গালুডি যাওয়া হবে, আমিও যাবো সঙ্গে। ইতিমধ্যে আমি দিন পাঁচেক দেশে কাটিয়ে এলাম।

মা আর ঠাকুমা আমার জন্যে মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করতেন, অনেক দিন চিঠিপত্র না পেয়ে মনে করতেন আমি আর বেঁচে নেই। কিন্তু মাসে মাসে টাকা আসতো দেখে আশ্বস্ত হতেন। চম্পকী ততটা উদ্বিগ্ন হয়নি, সে জানতো যে আমি ঠিকই আছি, নিতান্ত মরবার ছেলে নই। আমাকে দেখে সে অন্য সকলের মতো আনন্দে আত্মহারা হবার ভাবটা দেখালে না বটে, কিন্তু বুঝতে পারলাম খুশি হয়েছে। আমার ছেলে আর মেয়ে খুব খুশি, কলকাতা থেকে যে উপহারগুলো কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম তাই পেয়ে আরো খুশি। ছেলেটি বেশ বড়ো হয়েছে, গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে, এবার সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে। মেয়েও খানিকটা লম্বা হ'য়ে উঠেছে। সুবল যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে, হাসতে হাসতে বললে, খাজনা আদায় কিছুই হচ্ছে না। বাদলার সঙ্গেও দেখা হোলো, আবার তার একটি ছেলে হয়েছে। আমার কুকুর দুটি এখনো বেঁচে আছে, আমাকে দেখেই তারা চেন ছিঁড়ে লাফিয়ে আমার কাছে ছুটে আসতে চায়। এতদিনের অদর্শনের ফাঁকটা তারা পাঁচ মিনিটেই পূরণ ক'রে নিয়ে শান্ত হোলো।

দেশ থেকে যখন কলকাতায় ফিরলাম তখনও যোগেনরা যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে পারেনি। আরো দিন তিনেক ওদের বাড়িতেই থেকে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা ক'রে বেড়াতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল আমতায়, ঠিকানাটা আমার জানা ছিল, একদিন গেলাম সেখানে। তার মা'র সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি অনেক আগেই ছেলের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছেন, আমি পরিচয় দেবার পরে কান্নাকাটি করতে লাগলেন। চক্রবর্তীর বৌটিকেও দেখলাম। নিতান্ত ছেলেমানুষ, বয়স বোধ হয় পনেরোও হবে না, নিজের বৈধব্য এখনো হৃদয়ঙ্গমই করতে পারেনি। আমাকে দেখে যে খানিকটা বিমর্ষ ভাব প্রকাশ করা উচিত তাই এখনো জানে না। বৌটিকে দেখে চক্রবর্তীর সেই আদর সোহাগের কাহিনী-গুলো যে কতদূর মিথ্যা তা বুঝতে পারলাম।

আমাদের ক্যাপ্টেন দাদার জামাইএর সঙ্গেও একদিন দেখা করলাম। সে

আলিপুরের আদালতে ওকালতি করে, অবস্থাও ভালো, আর ইতিমধ্যে বেশ পসারও জমিয়েছে। তার কাছে দাদার সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনলাম। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকেই তিনি সংসারবিরাগী হ'যে মুক্ত পুরুষের মতো থাকতেন। লোকের বাড়ি রোগী দেখতে গিয়ে ফী নিতেন না, উপরন্তু গরিব হ'লে নিজের পকেট থেকে রোগীর পথ্যের খরচটাও যোগাতেন। আগে যথেষ্ট পয়সাকড়ি জমিয়েছিলেন, সে সমস্ত তাঁর দেশের স্কুলে দান ক'রে গেছেন। যুদ্ধে যাবার আগে বাড়িঘর সমস্তই জামাইএর নামে লিখে দিয়ে গেছেন। যুদ্ধ থেকে যে আর ফিরবেন না সে কথা তিনি জানতেন, ঠাট্টার ছলে অনেকবার সে কথা বলেছিলেন। জামাইকে আর মেয়েকে প্রায়ই তিনি বলতেন,—আমরা পুরোনো মানুষ, কেবল পুরোনো বুলিই আওড়াতে থাকবো, যা শুনে শুনে তোমাদের অরুচি ধরে গেছে. আমাদের মতো লোক যারা কিছুতেই মরতে চায় না, তাদের মারবার জন্যেই তো যুদ্ধ বেধেছে। সেখানে তোমাদের বদলে আমাদেরই যাওয়া উচিত ; আমাদের সেখানেই যেতে দাও, তোমরা বেঁচে থেকে জগৎকে নতুন কথা শোনাও।

একদিন কলকাতার রাস্তায় রেঙ্গুণ-পলাতক সেই ভট্টাচার্য পরিবারের বড়ো ছেলেটির সঙ্গে দেখা হোলো। একটা ওয়ার্ডেন পোস্টের বাড়ির সামনে এ. আর. পি-র নীল পোষাক পরে সে দাঁড়িয়েছিল। আমি তাকে চিনতে পারিনি, সেই আমাকে ডাকলে। তার কাছে শুনলাম কত কষ্টে ওরা দেশে ফিরতে পেরেছে। আমরা যে মালগাড়িতে ওদের তুলে দিয়েছিলাম সেটা মনুয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিলে বটে, কিন্তু তারপরে ওদের মহা কষ্টের শুরু হোলো। বিস্তর টাকা দিয়ে ওরা এক নৌকো ভাড়া করেছিল, চিন্দুইন নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে বাঁশ দিয়ে ঠেলে ঠেলে কালেবা পর্যন্ত পৌঁছতে ওদের বারো দিন সময় লাগে। সেখান থেকে চিগন যেতে স্বতন্ত্র রকমের ছোটো ছোটো সাল্‌তি ভাড়া ক'রে স্রোতের বিরুদ্ধে গুণ টেনে বাইশ মাইল যেতে ওদের আরো ছয়দিন সময় লাগে। চিগন থেকে গরুর গাড়ি নিয়ে টামুতে পৌঁছতে আরো ছয় দিন। এর মধ্যে

অধিকাংশ সময় ওরা খেতেই পায়নি। কখনো বা গাছতলায় কখনো বা দোকানের চালা ঘরের নিচে কাটিয়ে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজে, এক টাকায় এক সের দরের চিঁড়ে মাত্র খেয়ে অনেক কষ্টে টামুতে পৌঁছে ওরা ভারতবর্ষে ঢোকবার পাসপোর্ট সংগ্রহ করলে। সেখান থেকে একখানা লরি ভাড়া ক'রে ওরা গেল কোহিমা, তারপর কোহিমা থেকে ডিমাপুর। এই সময় ওদের তু' একটি ছেলের নিউমোনিয়া হয়। ডিমাপুরে থেকে চিকিৎসা করিয়ে ওরা ট্রেণ ধরতে পেলে। দেশে যে কখনো পৌছতে পারবে এটা ওদের আশাই ছিল না, কিন্তু অনেক কষ্টে দেশে পৌঁছেও ওরা সে আনন্দটুকু ভোগ করতে পেলে না। ওদের পরিবারের যিনি কর্তা তাঁর একেই পা ভেঙে গিয়েছিল, তার ওপরে তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলেন। যে স্টীমারে ওরা দেশে যাচ্ছিল সেটা যখন গোয়ালন্দে পৌঁছলো তখন অতি আনন্দে তাড়াতাড়ি উঠে দেখতে গিয়ে স্টীমারের ওপরেই তিনি হার্টফেল হ'য়ে মারা গেলেন। এখন ওদের অবস্থা খুবই খারাপ। পরিবারের সকলে বরিশালে আছে, এরা তুই ভাই কলকাতায় এসে এ. আর. পি-র চাকরি নিয়েছে।

কলকাতায় ঐ তিন দিন কাটিয়ে আমরা সদলবলে গালুডি যাত্রা করলাম। সুরেন রইল বাড়িতে, সে বললে কলেজের মেসে খাবে আর বাড়ি আগলাবে।

গালুডি বেশ একটি নির্জন জায়গা, অনেকটা আমাদের সেই পশ্চিমের সোন নদীর ধারের ছোটো গ্রামগুলির মতো দেখতে। রেল লাইনের এপাশে গ্রাম, ওপাশে সুবর্ণরেখা নদী। এক দিকে ঘাটশিলা, অন্যদিকে টাটানগর, মাঝখানে এই ছোটো গ্রামটি। সেখানে সাঁওতাল পরগণার রুক্ষ লালমাটি, বাংলাদেশের মতো পাঁক নেই সেখানে। গ্রামটিকে ঘিরে আছে বিশাল শালবন, খরস্রোতা নদী, আর ছোটোবড়ো পাহাড় শ্রেণী,—সেগুলোকে বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে মণ্ডিত ক'রে প্রত্যহ নব নব বিস্ময়কর সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত হ'তে দেখা যায়। পথে প্রান্তরে শোনা যায় কালো কালো সাঁওতালি মেয়েদের সমবেত কলগান।

বেসুরো কলরব কিছু নেই,—চারিদিক শান্ত, নিস্তব্ধ। এই ধ্যানোপম নিস্তব্ধতাকে ক্ষণিকের জন্যে সচকিত ক'রে এক একখানা রেলগাড়ি এসে দাঁড়ায় স্টেশনের ধারে, এঞ্জিনে জল ভরে নিয়ে সেখানা চলে গেলেই গ্রামটি যেন আবার নতুন ক'রে চোখ বুজে ধ্যানস্থ হ'য়ে পড়ে। কলকাতার এত কাছে যে এই অপরূপ পার্বত্য সৌন্দর্যে ভরা স্থানটিতে আজও সভ্যতার আবিল স্রোত প্রবেশ করেনি, এটা চোখে না দেখলে প্রত্যয় করা যায় না।

স্টেশনের ধারেই একটা ঢালু পাহাড়ের ওপরে যোগেনের ব্যারিস্টার বন্ধুর উঁচু বাংলো, ফটকের গায়ে বাড়ির নাম লেখা আছে—'চলাচল'। ওরই চারিদিক ঘিরে আরো কয়েকজন বিদেশপ্রিয় বাঙালীর বাংলোবাড়ি। তার মধ্যে একজন প্রোফেসর, একজন ডাক্তার, একজন রেলকর্মচারী, একজন ব্যবসায়ী, একজন কবি। এঁরা কেউই এখানে সর্বদা বাস করেন না, অবসর পেলে মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে আসেন। এঁদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব আছে, একজন এলে পাঁচজনের বাড়ির খবর করেন। এঁরা এখানকার খানিকটা জায়গা নিজেদের কলোনির মতো ক'রে নিয়েছেন।

আমরা যে বাড়িতে উঠেছি তাতে তিনখানি প্রশস্ত শোবার ঘর। এক পাশের ঘরে থাকে যোগেন, মাঝের ঘরে থাকে তার বাপ মা, অন্য পাশের ঘরে আমি। ঢালু বেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই পাহাড়ের সর্বোচ্চ স্থানে খানিকটা গোল বারান্দায় ঘেরা এই তিনখানি ঘর। অন্য পাশে খানিকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন কোঠায় খাবার ঘর, রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর, বাথ রুম,—সবই কিছু তফাতে। ঘরগুলি হাল ফ্যাশানের ফার্নিচারে সাজানো।

বাড়িটার চতুর্দিক নির্জন আর ফাঁকা। ঘুম থেকে উঠে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেই পাহাড়ের অন্তরাল থেকে চমৎকার সূর্যোদয় হচ্ছে দেখা যায়। গভীর রাত্রে জানলা দিয়ে চাইলেই দেখা যায় দূরে টাটানগরের লোহার কারখানার প্রজ্বলন্ত আগুনের আভায় আকাশের প্রান্তসীমা লাল হ'য়ে উঠেছে, হঠাৎ দেখলে মনে হয় ওদিকে কোথাও আগুন লেগেছে। অন্যদিকে দেখা যায় অন্ধকারের

চেয়েও কালো সিদ্ধেশ্বর পাহাড়, তারও বনে বনে কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। দেখলে মনে হয় পাহাড়ের গলায় কেউ বুঝি পরিয়ে দিয়েছে আগুনের মালা। শীতের সকালে প্রথম মিঠে রোদটি যখন গোল বারান্দার ওপরে এসে পড়ে, তখন যোগেনকে ঘর থেকে বারান্দায় এনে একটা ঈজিচেয়ারে শুইয়ে দিই, সে রোদে পা মেলে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে। যোগেনের বাবা আর মাও এক একখানা চেয়ার নিয়ে সেখানে এসে বসেন, চাএর সঙ্গে গরম পরোটা খাওয়া আর খবরের কাগজ পড়া চলতে থাকে। যোগেনের বাবা আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধের খবরটা চোখ বুলিয়ে একবার দেখে নেন, কলকাতায় আর বোমা পড়লো কিনা সেটা আগে ভালো ক'রে জেনে নেন, তার পরে নাকের ডগায় লাগানো চশমার ভেতর দিয়ে এডিটোরিয়লের লেখাগুলো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে শুরু করেন। মীরা ওদিকের রান্নাঘরে নতুন বাঁধুনিকে দিয়ে নানারকম খাবার প্রস্তুত করানোতে ব্যস্ত থাকে।

ছুটি উপভোগ করতেই এসেছি বটে, কিন্তু তাই ব'লে সকাল বেলায় কুঁড়েমি ক'রে বসে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য। খুব ভোরবেলায় উঠেই একচোট বেরিয়ে পড়ি। বাড়ির পিছনেই একটা ছোটো রকমের খাড়াই পাহাড় আছে, তার নাম নেক্‌ড়ে ডুংরি। পাহাড়কে এদেশের লোকে বলে ডুংরি। আমি তাড়াতাড়ি সেই পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত উঠে একচক্র ঘুরে আসি, শীতের মধ্যেও খানিকটা ঘাম বেরিয়ে পড়ে। বারান্দায় এসে বসে চা-টা খাবার পরে আবার খানিকটা ঘুরতে বেরোই। বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আরো অনেক দূর বেড়িয়ে আসি—সুবর্ণ-রেখার ওপার দিয়ে, শালবনের গহনতার ভিতর দিয়ে।

গালুডিতে থাকবার কিছুদিন পর থেকেই যোগেনের কিছু কিছু উন্নতি হ'তে দেখা গেল। তার টেম্পারেচার কমে গেল, খিদেটাও একটু বাড়লো। দুধে তার একেবারেই রুচি ছিল না, এখানকার দুধ খাঁটি আর সুস্বাদু দেখে সে চেয়ে চেয়ে খেতে লাগলো। জলহাওয়াতে উপকার হচ্ছে দেখে তার কতকগুলো ওষুধ আমি বন্ধ ক'রে দিলাম, প্রাত্যহিক টেম্পারেচার অনুসারে বারান্দার এদিক

থেকে ওদিক পর্যন্ত দু চারবার পায়চারি করবার অনুমতি দিলাম, আব মীরাকে ব'লে দিলাম ওকে না জানিয়ে পথ্যের মাত্রা একটু একটু ক'রে বাড়িয়ে যেতে।

মীবা দিনরাত ঐ কাজ নিয়েই আছে। কেবল আমাদেব খাবার ব্যবস্থা আর সেবার ব্যবস্থা। আগে একজনের সেবা নিয়েই ব্যস্ত ছিল, এখন হয়েছে দুজন। যোগেনের জন্যে তো করেই, আমার জন্যেও এমনি সব ব্যবস্থা কবে, যেন আমিও একজন রোগী। সাঁওতালদেব কাছ থেকে সন্ধান ক'রে ডিম আব মুর্গীব বাচ্চা আনিয়ে রাখে। দুধের সঙ্গে কাঁচা ডিম মিশিযে যোগেনকে খেতে দেয়, আমাকেও দেয খানিকটা। নিজের হাতে মুর্গীর শুরুয়া বানায, যোগেনেব সঙ্গে আমাকেও তাই খেতে হয। রীতিমত খাবাব সময়টিতে ছাড়াও মাঝে মাঝে অনেক বাড়তি খাদ্য খেতে হয। কখনো বা প্লেটে ভরে এক প্লেট চিনি দেওযা পুরু দুধেব সর পাঠাচ্ছে, কখনো ক্ষীরেব সন্দেশ ক'রে পাঠাচ্ছে। প্রথমে পাঠায মংরুর মারফতে। যদি বলি এখন খিদে নেই, তাহ'লে আবার নিয়ে আসে নিজের হাতে। মুখখানা এমনি ম্রিয়মান ক'রে দাঁড়ায যে খিদে না থাকলেও অগত্যা আমাকে খেয়ে ফেলতে হয। যদি বলি, আমিও কি বোগী? সে বলে,—কতখানি রোগা হ'য়ে গেছেন একবার আযনা দিয়ে দেখেছেন কি?

গালুডিতে গিয়ে পর্যন্ত মীরা একদিনও কোথাও বেড়াতে যেতে পারেনি। সর্বদা সে কাজ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাব কাজের বিবাম নেই। আমার সুখসুবিধার প্রতি সর্বদাই তার লক্ষ্য আছে বটে, কিন্তু যোগেনের সেবাযত্ন সে প্রাণপণেই করছে। আশ্চর্য ওর স্মৃতিশক্তি, একটি সামান্য বিষয়েও কখনো ভুল হ'তে দেখা যায না। কেবল সেবাযত্নেব দ্বারাই যোগেনকে সারিয়ে তুলবে, এই যেন ও পণ ক'রে বসেছে। কোনটিব পবে কোনটি কবতে হবে, যেন আগের থেকে সমস্ত রুটিন করা আছে, তাতে কখনো কোনো ফাঁক পড়বার অবকাশ নেই। সন্তানপালনেব পদ্ধতি মেয়েদের মধ্যে অনেকের অনেক রকম দেখছি, মীরার স্বামীপালন পদ্ধতিটা তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

আমার সঙ্গে বসে আগেকার মতো দুটো গল্প করবারও ওর ফুরসৎ নেই। আমি যখন বাড়িতে থাকি তখন মাঝে মাঝে আমার খবর নিতে আসে, দুচারটে কথাও বলে, কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারেনা, তাড়াতাড়ি চলে যায়। দুপুরে যখন রোদে চুল শুকোতে বসে তখনও দেখি ওর বিশ্রাম নেই, হাতে একটা কিছু কাজ নিয়ে বসে।

আমি প্রশংসমান দৃষ্টিতে মীরার কার্যকলাপ দেখে যাই, মনে মনে আমার যোগেনের ওপরে ঈর্ষা হয়। কিন্তু যোগেনকে দেখি, এততেও যেন সে সন্তুষ্ট নয়। মীরা যে এত করছে সেজন্যে ওর মনে কৃতজ্ঞতার কোনো লক্ষণই নেই। সব কিছুতেই যেন বিরক্ত, সকল জিনিসেই সন্দিগ্ধ, ত্রুটি কিছুতে না থাকলেও ত্রুটি কল্পনা ক'রে নিয়ে মীরাকে অনর্থক খাটিয়ে মারে। বিনা প্রতিবাদে মীরাকে খাটতে হচ্ছে এইটেই যেন ওর কাছে উপভোগ্য। রোগে ভুগলে মানুষ খিট্‌খিটে হ'য়ে যায়, কতকটা অত্যাচারীও হয়। কিন্তু যোগেনেরও যে এমন পরিবর্তন হবে এটা আমি আশা করিনি।

মীরাকে দেখলেই আমার মায়া হয়। ও যে পর্যাপ্ত প্রাণ নিয়ে এসেছে পৃথিবীতে, কোথায় তার সার্থকতা? যাকে লোকে নিয়তি বলে, এই কি ওর সেই নিয়তি?

মীরার সম্বন্ধে ভাবি। আমাকে সে ভালোবাসে, ভালোবাসায় ওর মনের কলস পরিপূর্ণ হ'য়ে আছে। কিছু না বললেও আমি তা ওর প্রতি পদক্ষেপে দেখতে পাই। কিন্তু সে ভালোবাসা কেবল ওর অন্তঃকরণে, সে ভালোবাসা কখনো বাইরের বাস্তবে নামতে চায় না। মীরা যেন কেমন হ'য়ে গেছে, কাছে ঘেঁষতে চায় না, সর্বদাই কেমন দূরে দূরে থাকে।

নিজের সম্বন্ধেও ভাবি। দুবেলা বেড়াতে বেড়াতে অনেক কথাই ভাবি। শরীরে এখন আর কোনোই রোগ দেখতে পাই না, তবু যেন আমার কিছুতে ভালো লাগে না। আমার স্নায়ুগুলো এখনও বোধ হয় দুর্বল হ'য়ে আছে। হাসপাতালে যখন শয্যাগত ছিলাম, তখন কেবল একটি জিনিসের অভাবেই

আমার মন ছট্‌ফট্‌ করতো। আমি ক্রমাগতই ভাবতাম যে মীরাকে দেখলেই আমার সব সেরে যাবে—শরীরেও কোনো রোগ থাকবে না, মনেও কোনো কষ্ট থাকবে না। এরই জন্যে আমি দিনের পর দিন অপেক্ষা ক'রে কত সহিষ্ণু হ'য়ে কাটিয়েছি। তারপর সেই বহুপ্রত্যাশিত দিন এসেছে, মীরাকে এখন কেবল দেখতে পাচ্ছি তাই নয়, ভাগ্যক্রমে এই নির্জন দেশটিতে এসে তার সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করছি, সর্বক্ষণই সে আমার কাছে কাছে রয়েছে। সেবাযত্নও বেশ করছে। তবু আমি খুশি হই না। কেন, এখানে এসেও এত খারাপ লাগে কেন? এমনও মাঝে মাঝে মনে হয় যে ছুটি নিয়ে আমি ভুল করেছি, অসুখ সারবার পরে বরাবর কাজে জয়েন করাই যেন এর চেয়ে ছিল ভালো।

সারা জীবনের ইতিহাসটা স্মরণ ক'রে দেখি, নিজের ক্ষুব্ধ অন্তরকে তন্নতন্ন বিশ্লেষণ ক'রে দেখি। বুঝতে পারি বরাবরই আমার কিসের একটা অভাব রয়ে গেছে, আজ পর্যন্ত সে অভাব মেটেনি। কি একটা বস্তু আমার চাই যা কখনই আমি পাইনি—কিন্তু মীরার কাছে পাবার যেন আশা ছিল। তারই আশায় আমি বারে বারে ওর কাছে ছুটে আসি, আবার হতাশ হ'য়ে বারে বারে ওর কাছ থেকে ছুটে চলে যাই। দূরে গেলেই মনে হয় পাবো, কাছে এলেই মনে হয় পাবার নয়। কিন্তু সে কোন বস্তু? তার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারি না, তবু মনে মনে জানি, সে এমন বস্তু যা পেলে আমার জীবন চরিতার্থ হ'য়ে যাবে।

কিন্তু মীরার মনের প্রকৃত রহস্যটা কি? বুঝেও যেন তা বুঝে উঠতে পারি না। আগে যখন অল্পই পরিচয় ছিল তখন সে আমার কত কাছে আসতো, কত গল্প করতো। এখন পরিচয় কতই গভীর, তবু সে আগের মতো আর কাছে আসে না কেন, গল্প করে না কেন? অথচ আমাকে দেখতে পেলে সে অত্যন্ত খুশি হয়, বেড়িয়ে ফিরতে আমার বিলম্ব হ'লে বারান্দায় উৎসুক হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ এক প্রহেলিকা।

গালুডিতে আমাদের সকলেরই শরীরের উন্নতি হচ্ছিল, কিন্তু মীরার শরীরটা যেন ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। তার চোখের কোলে কালি পড়তে দেখা যায়,

মাঝে মাঝে তার মাথা ধরে। একদিন আগের মতো আবার ওর ফিট্‌ হবার উপক্রম হোলো। ও সেটা সাম্‌লে নিলে, কিন্তু শরীরটা নিতান্ত ক্লিষ্ট হ'য়ে পড়লো।

আমি যোগেনকে বললাম,—মীরার শরীর খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে, ওর পরিশ্রম খানিকটা কমিয়ে দেওয়া উচিত।

যোগেন বললে,—পরিশ্রম ও নিজে ইচ্ছে ক'রেই বাড়িয়েছে। যে কাজ মংরুর দ্বারা অনায়াসে হ'তে পারে সে কাজও নিজের হাতে করতে যায়, কাজে কাজেই—তা তুমি একটা কাজ করো না, ওকে রোজ খানিকটা ক'রে বেড়িয়ে আনো না। তাতে ও কতক অন্যমনস্ক হ'তে পারবে, কাজকর্ম থেকে সরে গিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। আমিও আর ভেবে ভেবে পারি না।

—তুমি বললে কি হবে, ওর হয়তো বেড়াতে যাওয়া পছন্দ নয়। যদি ইচ্ছে থাকতো তাহ'লে নিজেই তো আশেপাশে বেড়াতে পারতো।

—বেড়ানো ওর পছন্দ নয়? তুমি ওকে চেনো না, বেড়াতে ও তোমার চেয়েও বেশি ভালোবাসে। কলকাতাতেও চিরকাল এবাড়ি ওবাড়ি ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছে। কিন্তু ওর স্বভাবটা ঐ রকম, যা ওর ভালো লাগে তা ও নিজের থেকে করতে পারে না, কেউ প্রথমে জোর ক'রে ধরে করালে তখন করে। তুমি ওকে দুদিন জোর ক'রে ধরে বেড়াতে নিয়ে যাও, তখন দেখবে নিজের থেকেই ও যেতে চাইবে।

সেদিন বিকেলে মীরাকে আমি সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলাম। সে যেন কত আড়ষ্টভাবে আমার সঙ্গে চলতে লাগলো। পরের দিন থেকে যদিও চেষ্টা ক'রে সংকোচ কাটিয়ে আমার সঙ্গে অনেক কথাই বলতে শুরু করলে, কিন্তু সে নিতান্ত বাজে কথা। এত অনাবশ্যক প্রলাপ, তার কোনো মানে হয় না। শুনলে হাসি পায়, জবাব দিতে ইচ্ছে করে না। মনে হয়, যে এমন ভালোবাসে সে অমন নির্বোধ কেন? ওর এত কঠিন সংকোচ কেন? হৃদয়ের যে মধুভাণ্ডারটিকে অবাধে উদ্‌ঘাটন ক'রে দেবার সুযোগ এসেছে, তার দ্বার এমন সময় রুদ্ধ কেন?

একদিন আমার অত্যন্ত রাগ হ'য়ে গেল। মীরা আমার কাছাকাছি চলেছে ভেবে কি একটা কথা বলছিলাম, জবাব না পেয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখি সে অনেকটা পিছনে রয়েছে। রুক্ষস্বরে তাকে বললাম,—অত দূরে দূরে থাকো কেন? চলতে যদি কষ্ট হয় তাহ'লে আর বেড়িয়ে কাজ নেই, বাড়ি ফিরে চলো। মীরা থতমত খেয়ে আমার পাশে এলো, বললে— না না আমার কোনো কষ্ট হয়নি। তারপরে বরাবর আমার পাশে পাশেই চলে, কখনো আমার কাছ ছাড়া হয় না। কিন্তু এমনি ভাবেই চলতে থাকে, যেন তার পক্ষে এটা একটা শাস্তি।

ঐ সব ভাবতে ভাবতে একদিন অকস্মাৎ আমি এই কথাই নতুন ক'রে আবিষ্কার করলাম যে মীরাকেই আমার চাই, ওকে নাহ'লে আমার চলবে না,— আর আমাকেও ওর চাই, আমি নাহ'লে ওর চলবে না। দেখলাম যে এই সোজা কথাটা আমরা দুজনেই বহুকাল থেকে জানি, অথচ আমরা পরস্পরকে কেবলই ভুল বুঝছি, তাই আর এক পাও অগ্রসর হ'তে পারছি না। আর কিছু না, দুজনের মাঝে যত সংস্কারের বাধা আর অহেতুক ভুল-বোঝা জট পাকিয়ে রয়েছে, পরস্পরকে মন খুলে কাছাকাছি আসতে দিচ্ছে না। ভিতরে চাপা দেওয়া এই রকম জট পাকানো মনের জন্যেই আমরা উল্টো-উল্টো ধরণের আচরণ করতে থাকি। যার কাছে যেতে চাইবো তার কাছ থেকে দূরে পালাই, যাকে খুব নিকটে পেতে ইচ্ছে করে সে নিকটে এলেই যেন ভয় লাগে, যাকে অনেক কথা বলবার আছে তাকে কিছুই বলা যায় না, যাকে নরম কথা বলতে হবে তাকে বলি রূঢ় কথা।

সংকল্প করলাম—এ জড়তা আমাকে ভাঙতে হবে, এ জট আমাকে ছিঁড়ে ফেলতে হবে। এ কাজ আমার, মীরার নয়। যোগেন ঠিক কথা বলেছে, মীরার যেটা আন্তরিক ইচ্ছা, সেইটে ওকে জোর ক'রে করিয়ে নিতে হয়। স্থির করলাম যে মীরাকে এবার খোলাখুলি কিছু বলা যাক। কিন্তু বলতে গিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে দেখি কেমন যেন একটা ত্রস্ত চকিত গোছের ভাব,

যেন আমার মধ্যে কিসের একটা আভাস পেয়েছে, আমার চোখের দিকে চাইতে আজকাল ভয় পাচ্ছে। মুখের কথা আমার বেরোতে গিয়েও বেধে যায়। হায় রে মানুষের সংকল্প! আগের থেকে ভেবেচিন্তে কেউ কখনো ঠিক কাজটাও করতে পারে না, ঠিক কথাটাও বলতে পারেন না। আমরা যা কিছু করি তা আকস্মিক প্রেরণায়।

একদিন বেড়াতে গেলাম সুবর্ণরেখার ওপারে। নদীর ধার থেকেই শুরু হয়েছে বিশাল শালবন, তার ভেতর দিয়ে সরু সরু অনেক আঁকাবাঁকা পথ। আমরা শালবনের ভেতর দিয়ে অনেকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম, কারণ তখনো যথেষ্ট বেলা আছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ আকাশে মেঘ উঠলো, দেখতে দেখতে চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল। এমন অসময়ে ঝড়জল হবার কথা নয়, এর জন্যে আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। বাড়ি যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ফিরলাম, কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেললাম। নদীর ধার পর্যন্ত এসে পৌঁছতেই অনেক দেরী হ'য়ে গেল। যখন নদীর কাছে পৌঁছেচি তখন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে, চোখে মুখে বালি বিঁধছে, কোনো দিকে কিছু দেখা যায় না। নদী পার হওয়া তখন অসম্ভব।

পাহাড়ে দেশের ঝড় অতি প্রচণ্ড। গাছের ডালপালাগুলো ভেঙে পড়ছে, আকাশে গোঁ গোঁ ক'রে বিকট শব্দ হচ্ছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎচমক আর বজ্র-নির্ঘোষ, যেন মাথার ওপরে ঘোরতর আকাশযুদ্ধ হচ্ছে, জাপানীরা এরোপ্লেন থেকে মুহুর্মুহু বোমা ফেলছে।

পারঘাটার কাছে একটা পরিত্যক্ত চালাঘরের মতো রয়েছে দেখে সেখানে আমরা ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বর্ষাকালে নদীতে খুব জল হ'লে যখন লোককে পার ক'রে দেবার জন্যে নৌকো চলে, তখন বোধ হয় মাঝিদের এই চালাঘরটি ব্যবহারে লাগে। এখন সেটা শূন্য পড়ে আছে।

আশ্রয় নেবার কিছুক্ষণ পরে যদিও ঝড়ের দাপট খানিকটা কমে গেল, কিন্তু খুব জোরে বৃষ্টি পড়তে শুরু হোলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শীত। গায়ে যদিও

গরম কাপড় আছে, কিন্তু বৃষ্টি না ছাড়লে সেই আশ্রয় ছেড়ে বেরোনো যায় না। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। কোনো দিকে কোনো জনপ্রাণী নেই। সেই ঘনবর্ষমাণ আবেষ্টনের মধ্যে বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গেছি আমরা দুটি প্রাণী, যারা পরস্পরকে এতকাল শুধু চেয়ে এসেছি কিন্তু পাইনি। মীরাকে যদি আমি একান্তই পেতে চাই, এখন তার চমৎকার সুযোগ। মনে পড়ে গেল, একদিন আমি উন্মত্ত হ'যে ওকে চুম্বন করেছিলাম, তাতে ও গঙ্গাস্নান করেছিল। কিন্তু এখানে ওর সমাজ নেই, সংস্কার নেই, স্বামী নেই, আছি কেবল আমি। এইখানে এই একান্ত নির্জনে মীরাকে আজ আমি আবার একবার ভালো ক'রে জানতে চাই, দেখতে চাই যে আমাকে ও কেমনভাবে গ্রহণ করে। শুধু ভাবধর্মী ভালোবাসায় কি লাভ আছে, যখন আমার জীবধর্মী স্নায়ুকোষগুলো চায় তার প্রত্যক্ষ আস্বাদ?

কোনো কথা না ব'লে ওকে আমার কাছে টেনে আনলাম, প্রায় জোর ক'রে ওকে চুম্বন করলাম,—একবার, দুবার, তিনবার। ও কিছুই বললে না, কেবল মাথাটি নিচু ক'রে নিশ্চল হ'য়ে রইল।

সযত্নে তখন আমি ওর অবনমিত মুখখানি উঁচু ক'রে তুলে ধরলাম। ওর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ ক'রে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কারণ বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—এ কেন মীরা? একবার গঙ্গাস্নান করেছিলে, এবারেও কি তাই?

জলভরা চোখে আমার মুখের দিকে একবার মাত্র অতি করুণ ভাবে চেয়ে তৎক্ষণাৎ ও দৃষ্টি নামিয়ে নিলে। ওর চোখ দুটো লাল, কান দুটো লাল, সমস্ত মুখটাই টকটকে লাল।

—তাহ'লে এবার সে সব কিছুর দরকার নেই তো? চুপ ক'রে থাকলে হবে না, বলো।

—না।

—তবে তুমি কাঁদছো কেন?

—আমার ভয় করছে।

—কেন ভয় কিসের, আমি তো কাছে রয়েছি?

—সে জন্যে নয়, এমনি আমার ভয় করছে।

—কোনো ভয় নেই মীরা, তুমি আমার কাছে সরে এসো।

মীরা ইতস্তত করতে লাগলো। আমি আমার দুই বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম। তখনও মীরা কিছুই করলে না, কেবল চোখ বুজে নিশ্চল আর নরম হ'য়ে গেল।

আমার সকল ইন্দ্রিয়কে উন্মত্ত ক'রে যে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছিল, সেই ঝড়ের দুর্দাম ঘূর্ণিবাত্যা যখন থামলো,—আমার সমস্ত বস্তু এবং সমস্ত সত্তা তখন অন্তরে বাহিরে পরিতৃপ্ত। তখন আর কোনো ক্ষোভ নেই, কোনো সন্দেহ নেই, কোনো অনিশ্চয়তা নেই।

ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কথা উল্লেখ করাটা হয়তো অসুচিত, কিন্তু এ-স্থলে তা মনে করি না। জীবন ধারণের ইতিবৃত্তের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের যেখানে অতি প্রয়োজনীয় স্থান আছে, সেখানে তা বলতে হবে, কোনোমতে এড়িয়ে গেলে চলবে না। অবশ্য ইন্দ্রিয়ের কাজ যেখানে নিতান্তই স্থূল সেখানে তা বলবার বিষয় নয়;— যেমন আমাদের আরো কত শরীরযন্ত্র আছে যার নিত্যক্রিয়া সম্বন্ধে লোকের কাছে আমরা কিছু বলি না। কিন্তু যেখানে সেটা অভিনব সেখানে কিছু বলা প্রয়োজন।

বাল্যজীবন থেকে এখন পর্যন্ত অনেক ভাবে ঐ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির পরিচয় আমি পেয়েছি। সেই ছাত্রযুগে আম কাঁঠালের বাগানে যে প্রথম অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল তাতে ছিল শুধুই একটা অপরিণত শরীরযন্ত্রের তৃপ্তি, হৃদয় তখন আদৌ জন্মায়নি। দাম্পত্য জীবনে মনের দিকে চোখ বুজে প্রদীপ নেবানো রাত্রিশয্যায় যে অভিজ্ঞতার নিয়মিত পুনরাবৃত্তি ঘটতো তাতেও ছিল সেই শরীরযন্ত্রের তৃপ্তি, —হৃদয় সেখানে জন্মেছে কিন্তু তখনকার মতো বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। ক্যাপ্টেন

চক্রবর্তীর সঙ্গে সেই বর্মী সুন্দরীর ঘরে গিয়ে অন্য ধরণের একটা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সম্ভাবনা ঘটেছিল,—কিন্তু খানিকটা পর্যন্ত অগ্রসর হবার পরেই হৃদয় সেখান থেকে বিমুখ হ'য়ে পালিয়ে এসেছিল। আর এখানকার যে অভিজ্ঞতা তাতেও রয়েছে ঐ একই জিনিস, তবু এখানে ইন্দ্রিয়ের কথাটা নিতান্তই গৌণ। ওর ভিতর দিয়ে পেলাম এমন একটা অমূল্য প্রাপ্তির প্রমাণ, যা অনেকদিন আগেই আমি মনে মনে জেনেছি, কিন্তু তবুও পেয়েছি ব'লে কিছুতেই বিশ্বাস হয়নি। এতদিনে এই হোলো আমার সত্যিকার পাওয়া। এর দ্বারা পেয়ে গেলাম একটা চূড়ান্ত জয়ের আনন্দ, পুরুষ-জন্মের সার্থকতার পরাকাষ্ঠা। মনের সেই অনন্যপূর্ব অনুভূতিই এখানে প্রধান।. বস্তু এখানে চিত্তকে ছাপিয়ে ওঠেনি, চিত্তই ছাপিয়ে উঠেছে বস্তুকে। সকল রকমের বাধাবিঘ্ন এবং নীতি শিক্ষার বিরুদ্ধেও যেখানে দুটি নরনারীর অন্তর মিলন চায়, এবং যে মিলনকে তারা নিজেরা কোনোক্রমে নিবৃত্ত করতে পারে না, সে মিলন তো কেবলমাত্র পশু-প্রবৃত্তির পরিচয় নয়, সেখানে আরো কিছু থাকে। যেখানে দুটি মনুষ্যেতর প্রাণীর মিলন ঘটে সেখানকার কথা স্বতন্ত্র, সেখানে তারা নিছক জৈবপ্রকৃতির সৃষ্টিকৌশলে যৌন-মিলনে মিলতে বাধ্য হয়। কিন্তু এখানে ঠিক তাই নয়, এখানে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন দুখানি হৃদয়। উভয়ে উভয়কে নিজের ব'লে চিনবে, মিলনের জন্যে হবে প্রস্তুত, স্বতন্ত্র ধাতুর হৃদয় হ'লেও তার তন্ত্রীগুলো একই সপ্তকে বাঁধা হবে, সুখে দুঃখে আনন্দে আঘাতে একই রকমের ঝঙ্কার দিতে থাকবে,—তখনকার যে অনিবার্য মিলন, সে মিলনে ইন্দ্রিয় বৃত্তির সঙ্গে অন্তরাত্মাও পরিতৃপ্ত হয়। তাই সে মিলন সম্পূর্ণ এবং গ্লানিবিমুক্ত। যেখানে মানুষ শুধুই পশু সেখানে কিছু বলবার নেই, কিন্তু এখানে অনেক কথা বলবার আছে। হয়তো এ-মিলন আইনের হিসাবমত অনুমোদিত হোলো না, হয়তো এ বিপদসঙ্কুল, হয়তো এ-মিলন ঘটলো মাত্র বারেকের জন্যে, মাত্র ক্ষণিকের জন্যে,—তারপরে আর কখনো সম্ভব হোলো না। কিন্তু তবু এই যথেষ্ট। লোকে বলে, দেবতার প্রসাদ কণিকামাত্রই হয়।

বৃষ্টির তখনও বিরাম নেই, নদী প্রান্তর ভাসিয়ে জলধারা বইছে, চারিদিক তখনও ঝাপ্‌সা হ'য়ে আছে। বাইরের দিকে চেয়ে আমি বললাম,—কতক্ষণে বৃষ্টিটা থামবে বলতো ?

মীরা সলজ্জ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চেয়ে আবার মাথা নিচু করলে।

—আর তোমার ভয় করছে কি ?

—না।

পাহাড়ে জায়গার বৃষ্টি জোরে এলেও খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিছু পরেই বৃষ্টিটা ছেড়ে গেল, আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল চাঁদ উঠছে। তার আলোয় পথঘাট সমস্তই চেনা যাচ্ছে। নদীতে এরই মধ্যে খানিকটা জল বেড়ে গেছে, পার হ'তে গেলে হাঁটুর ওপরেও অনেকটা পর্যন্ত ডুবে যায়। কোনোক্রমে নদী পার হ'যেই দেখি দুটো ছাতা কাঁধে ক'রে মংরু আমাদের নদীর ধারে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের দেখতে পেয়েই সে বললে,—এই যে, বৃষ্টিতে আপনারা এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ? ভিজছেন মনে ক'রে আমি তাড়াতাড়ি দুটো ছাতা আনলাম, কিন্তু আপনারা যে দেখি একটুও ভেজেন নি !

আমি বললাম,—ওপারে ঐ সাঁওতালদের চালাঘরে দাঁড়িয়েছিলাম।

বাড়ি ফিরে যেতেই যোগেন জিজ্ঞাসা করলে,—হঠাৎ যখন বৃষ্টি এসে পড়লো তখন তোমরা কি করলে ?

আমাদের কিছু বলবার আগেই জবাব দিয়ে দিলে মংরু। সে বললে,—কি আর করবেন, সাঁওতালরা ডেকে নিয়ে তাদের ঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখলে, বৃষ্টি ছাড়তেই চলে এলেন। আমি তো আর সে কথা জানি না, নদীর ধারে ধারেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

সেদিন রাত্রে আমার ভালো ঘুম হোলো না, সমস্ত রাত্রিটা নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখে কাটলো। তখনও আমার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না যে মীরাকে আমি সত্যিই পেয়েছি। হয়তো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগে একটা কিছু ঘটেছে, তাই ব'লে এটা স্থায়ী গোছের কিছু নাও হ'তে পারে।

পরের দিনেও আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। নদীর ধারে গিয়ে বেড়াতে বেড়াতে যেখানে অনেকগুলো পাথর একত্রে স্তূপাকার হ'য়ে আছে সেখানে আমরা বসলাম। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আমি বললাম,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মীরা, কাল আমার ওপরে তুমি রাগ করোনি তো?

মীরা কোনো উত্তর দিলে না, চুপ ক'রে রইল।

—চুপ ক'রে থাকলে আর হবে না মীরা, আমার কথার যাহোক একটা জবাব দাও। নইলে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আপনার সকল কথার জবাব দেওয়া বড়ো কঠিন, তাই চুপ ক'রে থাকি। বলুন কি জানতে চান।

—জানতে চাই যে আমি কোনো অন্যায় করেছি কিনা।

—ও-কথা আবার কেন জানতে চান? ওর জবাব তো আমি অনেক আগেই দিয়ে রেখেছি। আপনার মনে আছে কিনা জানি না, রাওলপিণ্ডি থেকে আপনি যখন লিখেছিলেন যে আমার মনে কষ্ট দিয়ে চলে যাওয়া আপনার অন্যায় হয়েছে, তখনই ও-বিষয়ে আমার যা কিছু বলবার ছিল চিঠিতে লিখে দিয়েছিলাম।

—কি লিখেছিলে তা আমার কিছুই এখন মনে নেই। চিঠিটার কথা মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু সে পড়েই আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। কি লিখেছিলে বলতো?

—লিখেছিলাম এই যে, আমি কেবল কাব্য চাই না, আমি চাই সত্যিকার মানুষকে,—যাঁর কাছে আমার নিজের নিজস্ব বলতে কিছুই রাখবো না, যাঁর সম্বন্ধে আমার মনে ন্যায়-অন্যায়ের কোনো বিচারই থাকবে না।

—হাঁ হাঁ, মনে পড়ছে। কিন্তু তোমার শুধু ব্যক্তিগত দিক দিয়েই এ-কথা তখন বলেছিলে, এখন যোগেনের দিক দিয়ে হয়তো আরো একটা কথা ভাববার আছে। তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে ভেবে হয়তো মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়েছো, সেই কথা বলো।

—এখনও আপনি সেই গঙ্গাস্নানের কথাটা ভুলতে পারেন নি বুঝি? ওটা

কিছুই নয়, আপনি ভুল বুঝেছিলেন। সংস্কার আমি অনেকদিন আগেই কাটিয়ে দিয়েছি। আমার মনে তখনও কিছুমাত্র দ্বিধা ছিল না, আর এখনও নেই। আর আমার স্বামীর কথা বলছেন? তাঁর যা প্রাপ্য ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি তাঁকে দিয়ে এসেছি এবং এখনও দিচ্ছি, পাছে কোনো কিছুতে কখনো আমার দ্বিধা লাগে।

—তাহ'লে আমার জন্যে তুমি আগের থেকেই প্রস্তুত ছিলে বলো?

—যান, এ-কথার জবাব আমি দিতে পারবো না। লজ্জাসরমও কি আমার কিছুমাত্র রাখতে দেবেন না? এ-সব কথা কি বলা উচিত?

—বলো মীরা, আমার সন্দেহটা ভালো ক'রে ঘুচিয়ে দাও।

—হাঁ তাই, অনেকদিন থেকেই। যখন আপনি এর কিছুই জানতেন না।

—তাহ'লে অন্যায় কিছু হয়নি তো?

—আমার দিক থেকে হয়নি এইটুকু বলতে পারি। তবে আপনার দিকের কথা কেমন ক'রে বলবো? ঘরে আপনার সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে।

—না না, আমার কথা তো সবই তুমি জানো। কিন্তু তাহ'লে তুমি ইদানিং অমন দূরে দূরে থাকতে কেন? মোটেই আমার কাছে ঘেঁষতে চাইতে না কেন?

—আপনি একবারও ডাকেন নি, তাই। ডাকলেই কাছে যেতাম, না ডাকলে কেমন ক'রে যাই? এতদিন তাই অপেক্ষা করতে হোলো।

—অথচ আমি করছিলাম তার উল্টো রকমের মানে। ছি ছি, এই সোজা কথাটা না বুঝে অনর্থক এতদিন নিজেও কষ্ট পেয়েছি আর তোমাকেও কত কষ্ট দিয়েছি।

—তাতে আর আপনার দোষ কি বলুন, সোজা কথাটাই কি শিগ্‌গির বোঝা যায়? আমার পক্ষে দিতে পারা সহজ হ'তে পারে, কিন্তু আপনার পক্ষে তবু নিতে একটু দেরী তো লাগবেই, আপনি যে ঘা খেয়েছেন। আপনাকে বিশ্বাস করাতেই অনেক সময় লাগে। যদি নিজের থেকে আগুয়ান হ'য়ে যেতাম তাহ'লে কেবল অবিশ্বাস নয়, হয়তো আমাকে ঘৃণাই করতেন।

—তা হয়তো করতাম, কিন্তু এ দিকে যে তিনমাস মাত্র ছুটি, শিগ্‌গির ফুরিয়ে যাবে, তখন কি হবে ?

—তখন আবার তিন মাসের ছুটি বাড়িয়ে নেবেন।

কতই সহজ এই মীরা, কতই সহজে নিজেকে ধরা দিলে! অথচ আমি এতদিন কেবল ওকে ভুল বুঝে এসেছি, অনর্থক কত নিষ্ঠুরতা করেছি। সোজা কথাটা বুঝতে আমার এতই দেরী লাগলো। তিন দিনে যেটা বোঝবার কথা সেটা বুঝতে লেগে গেল তিন বছর! আগে যদি জানতাম তাহ'লে মিলিটরি চাকরি নিয়ে চলে যাবার কোনো প্রয়োজনই থাকতো না। কিংবা হয়তো এরই প্রয়োজন ছিল, খুব দূর থেকে খানিকটা ঘুরে না এলে খুব কাছের জিনিসকে কাছে পাওয়া যায় না।

কিছুমাত্র সংকোচ, কোনো রকমের অপরিচয় আর আমাদের মধ্যে রইল না। প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো মীরা তার সমস্ত দলগুলি অনায়াসে আমার কাছে মেলে দিয়ে সহজ দৃষ্টিতে চেয়ে সহজ হাসি হাসতে লাগলো। আমারও জীবনে যেন একটা অসম্ভব রকমের পরিবর্তন ঘটে গেল। এখন সবই খুব হাল্কা, সবই খুব সহজ। কি ভুল দৃষ্টি নিয়েই এতদিন দেখেছি, তাই ভেবে আমি বিস্মিত হলাম।

একদিন সন্ধ্যার পরে অনেক দূর বেড়িয়ে এসে ক্লান্ত হ'য়ে বারান্দায় ঈজিচেয়ারে শুয়েই খুব ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। যেন আমার কাকা আর ক্যাপ্টেন দাদা দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে, তারা হাসতে হাসতে বলছে,—এখনও তুই বুঝলি না, এই কথাটা ?ত জলের মতো সহজ? এখনও বুঝি তোর সন্দেহ হচ্ছে? আর শুয়ে থাকতে হবেনা, উঠে আয়, উঠে আয়, আমরা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ধড়মড় ক'রে আমি উঠে বসলাম। চোখ চেয়ে দেখি মীরা এসে আমাকে ডাকছে,—উঠে আসুন, উঠে আসুন, খাবার দেওয়া হয়েছে। কত ডাকাডাকি করছি তবুও ঘুম ভাঙচে না বুঝি ?

মীরা প্রায় প্রত্যহই আমার সঙ্গে বেড়াতে যায়। কোনো কোনো দিন আমরা

অনেক দূর পর্যন্ত চলে যাই,—হয়তো কোনো জংলী সাঁওতালদের গ্রামে গিয়ে দেখি সেখানকার বন্য যুবতীরা অপরিচিত লোক দেখে বুকে ঢাকা দিতেও অভ্যস্ত হয়নি,— হয়তো নদীর ধার দিয়ে যেতে যেতে দেখি শালগাছে আর গাবগাছে দিলে খানিকটা জায়গা ঘিরে চমৎকার একটি কুঞ্জ রচনা করেছে,— হয়তো কোনো দুর্গম পাহাড়ে উঠে দেখি বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে শীর্ণ রেখায় একটি ঝর্ণা বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এত দূরে আমরা একা একা যাইনা, মংরুকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাই।

একদিন যোগেন বলেছিল,—দেখেছো তো, আমার কথা সত্যি কিনা? মীরা এখন রোজই তোমার সঙ্গে বেডাতে যাচ্ছে। তাতে ওর উপকার হয়েছে,—এরই মধ্যে ওর শরীরের কত উন্নতি হয়েছে। মুখে চোখে আর বিরক্তির ভাব নেই, সব সময়েই ফূর্তিতে রয়েছে। বেডাতে যাবার জন্যে অনেক আগের থেকেই তৈরী হ'য়ে থাকে,—এ সব তুমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছো কি?

ওর কথাগুলো শুনে মনে একটু আশঙ্কা হলো। কথাটা অন্য ভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে আমি তাচ্ছিল্যের স্বরে বললাম,—তা তো হ'তেই পারে, হাঁটলেই খানিকটা পরিশ্রম হয়, আর পরিশ্রম হ'লেই তখন খাবার মাত্রাটাও বেড়ে যায়। এতে শরীর কিছু ভালো হবেই।

যোগেন বললে,—কিন্তু এক একদিন তোমাদের ফিরতে বড়ো দেরী হয়। অনেক দূর পর্যন্ত যাও বুঝি?

—হাঁ, কোনো কোনো দিন বেডাতে বেডাতে খেয়াল থাকে না কতদূর গেলাম।

—অতটা সাহস করা ঠিক নয়। এখানকার বনেজঙ্গলে ভাল্লুকের উপদ্রব আছে। সেদিন শুনলাম একজন বেড়াতে যাচ্ছিল, বন থেকে একটা ভাল্লুক বেরিয়ে এসে তার হাতখানা কেটে নিয়ে গেল। মাঝে মাঝে নেকড়ে বাঘেরাও উৎপাত করে শুনতে পাই। তোমরা এক কাজ করো না কেন, মংরুকে তোমাদের সঙ্গে নিলেই তো হয়। বন্দুকটা নিয়ে সে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারে।

একদিন কথায় কথায় আমি বললাম মীরাকে,—এটা যেন আমাদের প্রতারণার মতো কাজ হচ্ছে না কি ?

সে বললে,—ও কথা যদি আপনার মনে হয় তাহ'লে কিছুই লুকিয়ে রেখে আর দরকার নেই। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহ'লে সব কথাই আমি ওঁর কাছে খুলে বলতে পারি।

—না না, এখন থাক। আগে আমি যুদ্ধের চাকরিটা খতম ক'রে দিয়ে ফিরে আসি, তার পরে তুমি যেমন বলবে তাই করবো। একটা কিছু ব্যবস্থা তখন করা যাবে।

—তবে এখন ও কথায় আর কাজ নেই। আমার তো মনে হয় উপস্থিত যতটুকু পেয়েছি এই আমার যথেষ্ট, এর চেযে বেশি আর কিছু চাইনা। আর প্রতারণার কথা বলচেন ? আমার স্বামীকে আপনি চেনেন না তাই ও কথা আপনার মনে হচ্ছে। তাঁর বিষয়ে কোনো কথা আপনাকে বলতে চাইনা। কেবল এইটুকু জেনে রাখুন যে আমাদের ভেতরকার খবরটা ওঁকে না জানতে দিয়ে যেটুকু প্রতারণা করা হচ্ছে তাতে কোনো দোষ নেই। জানতে দিলেই বরং আরো অন্যায় হবে। একে তো উনি অসুস্থ, তাতে বরাবরই আমাকে অবিশ্বাস করতেন, কোনোরকমে বিশ্বাসটিকে দাঁড় করিয়ে মনে মনে একটু সুস্থ আছেন। সেটুকু ভেঙে দিলে উনি সহ্য করতে পারবেন না। অসুস্থ অবস্থায় ওঁর মনে এতখানি আঘাত দেওয়া, সেইটেই আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে।

—কিন্তু এ কথা কতদিন চাপা থাকবে, একদিন হয়তো জানাজানি হ'য়ে যাবে। তখন কি হবে ?

—তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে, এখন থেকে সে কথা ভেবে আমাদের আনন্দটুকু নষ্ট করি কেন ? যখন একবার জেনে গেছি যে আমাদের দুজনের মধ্যে কারো কাছেই কিছু অদেয় নেই তখন উপস্থিত কোনো বাধা এলেই বা ক্ষতি কি ? আমরা তো জানি যে মৃত্যু ছাড়া আর কেউ আমাদের পৃথক করতে পারবে না। যে যতই বাধা দিক, মুখের কথা বন্ধ ক'রে দিলেও চোখের

কথা কেউ বন্ধ করতে পারে না। আপনি আমায় তখন শুধু চোখের কথাই বলবেন, আপনার চোখের দিকে চাইলেই আমি খুশি হ'য়ে উঠবো। এটুকু আনন্দ আমাদের কে ঘোচাতে পারবে?

—চোখের কথা বলতে তুমি হয়তো জানো, কিন্তু আমি তো জানি না।

—বিলক্ষণ জানেন। আগে হয়তো জানতেন না, কিন্তু এখন বেশ জানেন। যেদিন থেকে আপনার চোখ আমার দিকে চেয়ে কথা বলতে শুরু করেছে তার তারিখটা পর্যন্ত আমি বলে দিতে পারি। কবে বলবো? সেই যেদিন ঠাকুরপো আমার সঙ্গে একটা কি কথা নিয়ে তর্ক করছিল, আপনি হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, আমি তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দেবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলাম, তখনই প্রথম দেখলাম আপনার চোখে এই নতুন ধরণের দৃষ্টি,—বুঝতে পারলাম আপনি কোন কথা বলতে চাইছেন।

—তখন কিন্তু আমি কোনো কথাই বলতে চাইনি।

—আপনি নাই বা চাইলেন. আপনার মন যে চেয়েছিল। আপনার মন যে কথাটি মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারতো না, চোখ সেই কথা ব'লে ফেললে। চোখের ভাষার এইটুকুই স্নবিধে, মুখের ভাষার চেয়ে আরো অনেক স্পষ্ট ক'রে সে নিজের কথা বলতে পারে। সেইজন্যেই তো আমি কেবল মুখের কথায় ভুলি না, চোখের দিকে চেয়ে দেখি। আপনার চোখ দেখলেই বলতে পারি কখন খুশি, কখন রেগেছেন, কখন বিরক্ত হচ্ছেন।

—আচ্ছা আমার চোখের দিকে চেয়ে এখন বলো দেখি, কোন কথা সে বলছে? রাগের কথা না অনুরাগের?

—যান, আমি বলতে পারবো না।

মীরাকে পেয়েও আমার মনের মধ্যে একটা সমস্যা জটিল হ'য়ে উঠছিল, তারও অতি সহজ মীমাংসা হ'য়ে গেল। ইচ্ছে করলে মীরা একে আরও ঘোরালো ক'রে তুলতে পারতো, কিন্তু মীরার সে ইচ্ছে নেই, ওর ইচ্ছে সহজ হ'বার এবং সহজ ক'রে দেবার।

এর পর থেকে মীরার প্রতি যোগেনের মনোভাবটা কেমন তাই আমি কেবল বোঝবার চেষ্টা করতাম। দেখতাম ওদের মধ্যে যে গ্রন্থিটুকু আছে তাতে শুধুই একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যোগেনের মনটা বিকৃত, পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসকে সে বাঁকা চোখে দেখে। মীরাকে সে কিছুই, বোঝে না, সর্বদাই শাসনে শাসনে রাখে, আর মনে করে যে ওর শাসনের গুণেই সে অমন নিপুনহস্তা সেবাপরায়ণা হয়েছে, শাসনে ঢিল দিলেই বিগ্‌ড়ে যাবে। শুধু তাই নয়, সকল বিষয়েই ওর সন্দেহ। মীরার বিচার-বিবেচনার ওপরে ওর কিছুমাত্র আস্থা নেই, নিজের বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুর বিচার ক'রে দেখতে চায়। ওষুধ খেতে দেবার সময় ওকে বলতে হবে, ও নিজেই বুঝে দেখবে কোন সময় কোনটা খাওয়া উচিত। পথ্য সম্বন্ধেও তাই, পঞ্চাশবার তার শুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবে, ফিরিয়ে দিয়ে আবার নতুন ক'রে তৈরী করাবে, তবে খাবে। সকল বিষয়েই ওর এমনি সন্দেহ, সকল কথাতেই মহা চিন্তা। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেই ওর ভাবনার আর অন্ত থাকে না।

এই নিয়ে ওর সঙ্গে একদিন খুব তর্ক করলাম। বললাম,—মীরাকে তুমি এমন সন্দেহের চোখে দেখ কেন? ওর সবই কি তোমার কাছে খারাপ, কিছুই কি ভালো নেই? একবার বিশ্বাস ক'রে দেখ না কেন তাতে তোমার ক্ষতি হয় না লাভ হয়?

—মীরাকে আমি সন্দেহ করি না, কিন্তু ওর কাজকে বিশ্বাস করতে পারি না। নিজের স্বার্থটা নিজেই দেখতে হয়, সবই পরের ওপরে নির্ভর করা চলে না। সংসার তো আর করো না ভাই, বাইরে বাইরেই কাটাও। সব দিক সামলে রেখে চলা যে কত মুশকিল তা কেমন ক'রে জানবে বলো। মনে করো সবই সোজা, কিন্তু মোটেই তা নয়, তুনিয়াটা ভারী মারাত্মক জায়গা।

—ও তোমার বাঁকা চোখ দিয়ে দেখছো তাই মনে হচ্ছে। আমার মতো সহজ চোখ দিয়ে যদি দেখ তো দেখবে সবই সোজা।

—আর আমার মতো কঠিন রোগে যদি তুমি কখনো ভোগো তাহ'লে

তুমিও দেখবে যে সবই কঠিন। এমন একটা রোগ ধরেছে যাতে সারাক্ষণই শুয়ে থাকতে হচ্ছে। আরো কতদিন এমনি ভাবে শুয়ে থাকতে হবে তাও জানি না, কবে যে সেরে উঠবো তাও জানি না। এতদিনে একটা কিছু বিহিত করতেও পারলে না, রোগের নামটা কি তাও পর্যন্ত আমাকে বললে না। আসল কথাটা আমার কাছে লুকিয়ে রাখছো আর কেবল ফাঁকি দিয়ে চালাচ্ছো। অথচ তোমরা নাকি বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক হ'য়েও যদি তোমাদের এই ব্যবহার তাহ'লে সাধারণ একটা মেয়ের কাছে কতখানি প্রত্যাশা করা যায়? সবাই এমনি ভাবে ফাঁকি দিয়েই চালাচ্ছে। খাঁটি কথাটা কেউ বলে না, খাঁটি জিনিস কারো কাছেই মেলেনা, অথচ তুমি বলো সকলকে বিশ্বাস করতে? বিশ্বাস করলে যদি চলতো তাহ'লে আজ পৃথিবীতে এমন মহাযুদ্ধ বেধে উঠতো না।

—তুমি বেজায় ভুল বুঝতে শুরু করেছো, ওগুলো তোমার বিকৃত বুদ্ধির একচোখো যুক্তি। নিজের রোগের কথা ভেবে ভেবে ঐ সব যুক্তি তোমার মাথায় ঢুকেছে। বড়ো উদাহরণের কথা দিয়ে তুমি তোমার ছোটো অবিশ্বাস-গুলোকে সমর্থন করছো। মনে মনে ভেবে নিয়েছো যে তোমার থাইসিস হয়েছে, আমরা তোমাকে মিথ্যে স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়ে রাখছি। আচ্ছা ধরো তাই যদি হ'য়ে থাকে, তাতেই কি তোমার আর কিছু রইল না, দিনরাত কেবল ঐ কথাই ভাবতে থাকবে আর নিজের মনকে তিক্ত ক'রে তুলবে? তুমি তো নিজেই গিয়ে দেখে এসেছো, ইউরোপের লোকেরা থাইসিস হ'লেও কোনো ভয় পায়না, তারা সোজাসুজি স্যানাটোরিয়মে চলে যায়, আবার সেরে উঠলে বাড়ি ফিরে যায়। এ দেশেও ভালো স্যানাটোরিয়ম আছে, তেমন হ'লে না হয় সেখানেই তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, কিংবা যুদ্ধ থেমে গেলে ইউরোপেও চলে যেতে পারো। রোগ জিনিসটাকে এত বিভীষিকার মতো ভাবছো কেন? হাসপাতালে গিয়ে অনেকবার তো দেখেছো, সেখানকার লোকেরা রোগকে কত সহজ চোখে দেখে, থাইসিস কিংবা ম্যালেরিয়া তাদের চোখে সবই সমান, যেটাতে যা বিহিত করবার তাই নির্বিকারে ক'রে যায়। কেবল রোগের কথা

কেন, যেখানে কোনো বিহিত করবার আছে সেখানে সবই সহজ। আগে আমি ভাবতাম, যুদ্ধ জিনিসটা নাজানি কত কঠিন। ভিতরে ঢুকে দেখলাম কিছুই নয়, কেবল অভ্যাসের ব্যাপার। যাদের অভ্যাস হ'য়ে গেছে তারা ওরই মধ্যে হাসছে, গল্প করছে, আড্ডা দিচ্ছে, হারলে কিংবা জিতলে যখনকার যা কর্তব্য তাই করছে, দিনরাতগুলো তাদের আমাদের মতোই কেটে যাচ্ছে। অথচ ভেবে দেখ, তাদের মৃত্যু সম্ভাবনা তোমার চেয়ে সর্বদাই অনেক বেশি। মনে করো তোমার থাইসিসও যদি হ'য়ে থাকে, তাতেই বা তোমার স্বভাব বদলাবে কেন, নিজের অমন সুস্বাদ জীবনটাকে একদম বিস্বাদ ক'রে তুলবে কেন?

—চমৎকার কথাগুলো বলতে শিখেছো ভাই। আমি শুনে আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি। এমন কথা কিন্তু তুমি আগে বলতে পারতে না, আজকাল বলছো। যুদ্ধে গিয়ে তোমার অনেক উন্নতি হয়েছে দেখছি। মনটা যখন এতখানি উদার হয়েছে তখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, সত্যি জবাবটা খোলসা ক'রে বলবে কি?

—নিশ্চয় বলবো, যদি আমার সে কথা জানা থাকে।

—আমার রোগটা সত্যি সত্যি সারবে কিনা বলো দেখি?

—আমার তো মনে হয় সারবে।

—ঐ দেখ, ঠিক ডাক্তারের মতো কথাটি বললে। যা জানো তার ঠিক উল্টো কথাটি বলো। এই জন্যেই তোমাদের কথায় আমার মোটে বিশ্বাস হয় না।

—তা বিলক্ষণ জানি। এর মধ্যে তোমার একটা কম্প্লেক্স্ রয়েছে। বিশ্বাস ক'রে কখনো সুখ পাও না, অবিশ্বাস ক'রেই তুমি সুখ পাও। সেই জন্যে তোমায় বাধ্য হ'য়েই তাই করতে হয়, ও ছাড়া তোমার অন্য কোনো পন্থা নেই। সংসারে দু'রকমের মনওয়ালা মানুষ আছে। যারা বিশ্বাসী তারা অনবরতই শুধু বিশ্বাস করে, এক জায়গায় ঠকলে তবুও অন্য জায়গায় বিশ্বাস ক'রে সুখ পায়, হাজার বার ঠকলেও তারা অবিশ্বাস ক'রে মোটে তিষ্ঠোতে পারে না। আর যারা অবিশ্বাসী তাদের কেউ না ঠকালেও একটা ছুতো খুঁজে নিয়ে তারা অবিশ্বাস করে; আর

ঠকালে তো তাদের ভালোই হয়, অবিশ্বাসের একটা জোরালো কারণ পেয়ে তাদের মনে মহা আনন্দ হয়, লোকের কাছে তখন জোর গলায় বলতে পারে যে বিশ্বাস করাটাই বোকামি। এদের সেই আনন্দটুকু দেবার জন্যে ঠকানোই হচ্ছে উচিত কাজ।

—সে যাই বলো, তোমার মতের সঙ্গে আমার মতের কখনই মিল হবে না। দেখতে পাচ্ছি, আমাদের যার যেমন পেশা সেই অনুসারেই আমাদের মন তৈরী হয়েছে। তোমাদের ডাক্তারি পেশায় হয়তো বলে, মানুষকে আগে বিশ্বাস করো, নইলে তোমার উন্নতি হবে না। আমাদের আইনের পেশায় কিন্তু বলে, মানুষকে আগে অবিশ্বাস করো, নইলে তোমার উন্নতি হবে না। সুতরাং তুমি হাজার তর্ক করলেও আমি কেমন ক'রে বিশ্বাস করি বলো।

দেখলাম এখানে তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই। বিশ্বাস আর প্রেম প্রায় একই রকমে জন্মায়। সহস্র চেষ্টা দিয়ে কিংবা যুক্তি দিয়ে ও দুটিকে কোনোমতে ধরে আনা যায় না, কিন্তু যখন আসে তখন আপনা থেকেই আসে, চেষ্টা করলেও তাকে দূর করা যায় না।

মীরার কথা

দেবলোক থেকে আমার দেবতা নরলোকে নেমে এলেন। রক্তমাংসের মানুষের মতোই তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন, আমাকে ডাক দিয়ে বললেন—কোনো ভয় নেই মীরা, তুমি আমার কাছে এসো। যা ছিল কল্পনাতীত তাও সম্ভব হলো। মনে মনে যখন ভাবতুম অত উঁচু থেকে উনি কেমন ক'রে হাত বাড়াবেন, তখন ভেবে কিছুই কিনারা করতে পারতুম না। কিন্তু আমার সমস্ত ভয়-ভাবনা দ্বিধা-লজ্জা ঘুচিয়ে দিয়ে নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতো হ'য়ে নিতান্ত সহজভাবে উনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। এ যে আমার কতখানি জিত তাই নাকি আবার বুঝিয়ে বলতে হয়? অথচ যদি বলি যে আমি জিতে গেছি, তা কিন্তু উনি মানবেন না, জোর ক'রে বলবেন যে আমার চেয়ে উনিই বেশি জিতেছেন।

ওঁর বয়স হ'লে কী হয়, এখনও যেন ছেলেমানুষের মতো। এমন এমন সব প্রশ্ন করেন যার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। থেকে থেকে এমন সব কথা বলেন যার কোনো অর্থই খুঁজে পাই না। এমন এক একটা অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসেন যাতে হাসতে হাসতে আমার পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু প্রকাশ্যে হেসে ওঠাও চলে না, সেই জন্যে ঐ দুর্ঘটনাটি ঘটতে পারে না।

আগে আগে গালুডিতে বেশ সস্তায় মাছমাংস পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুকাল হলো ওখান থেকে খানিকটা দূরে সুবর্ণরেখার ওপারে রাখা-মাইন্‌স্‌এর কাছে মিলিটারিদের এক বিরাট আড্ডা বসেছে, ভালো ভালো খাবার জিনিস সেখানেই সব চলে যায়, বেশি দাম দিলেও মাছমাংস আর মোটে পাওয়া যায় না। আমরা যখন এই নিয়ে জল্পনাকল্পনা করচি, তখন মংরু একদিন বললে—মাজী, খরগোস মেরে আনলে তোমরা খাবে? আমি বললাম—নিশ্চয়, খরগোসের মাংস খুব ভালো, কিন্তু কোথায় তুই পাবি? সে বললে—আমাদের এই বাড়ির

কাছে নেকড়ে ডুংরিতে অনেক খরগোস আছে, খুব ভোরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। কালই গুল্‌তি দিয়ে মেরে আনবো।

সারাদিন ধরে বাখারি চেঁচে সে এক গুল্‌তি ছোড়বার ধনুক তৈরী করলে, পাথরের টুকরো ঘষে ঘষে গুল্‌তি বানালে। পরের দিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, মংরু ততক্ষণের মধ্যেই এক খরগোস এনে হাজির করেছে। খরগোসটা মরে নি, পায়ে গুল্‌তির আঘাত লেগে পড়ে গিয়েছিল, মংরু ধরে এনেছে। ওর দুটো পায়ে আঘাত লেগেছে তাই ছেড়ে দিলেও চলতে পারে না, কিন্তু বেশ বেঁচে আছে, ভীত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইছে। মংরু ওটাকে কেটে মাংস বানাবার জন্যে ছুরি নিয়ে এলো। অমর বাবু তাই দেখে তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিলেন। বললেন,—না না ওকে মারিস নে, ধরা পড়া মানুষকে কখনো মারতে নেই। জাপানীরা এ কথা মানে না বটে, কিন্তু আমরা মানি। ওর পায়ে ফ্র্যাক্‌চার হয়েছে, আমি ওকে সারিয়ে তুলবো।

তখন থেকে চলতে লাগলো খরগোসের পায়ে প্রলেপ লাগানো আর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তাকে পরিপূর্ণ বিশ্রামে রাখবার জন্যে একটা প্যাকিং বাক্সের মধ্যে খড়ের বিছানা ক'রে জানলার ধারে সর্বক্ষণ শুইয়ে রাখা হয়, প্রাণপণ শক্তিতে চামচের দ্বারা তাকে দুধ খাওয়ানো হয়, ভেন্টিলেশনের জন্যে বাক্সের ডালাটা অর্ধেক ঢাকা দিয়ে অর্ধেক খুলে রাখা হয়। মংরু জিজ্ঞাসা করে,—সেরে গেলে বুঝি তখন ওকে কাটা হবে বাবু? উনি বলেন—না, সেরে গেলে ওকে ছেড়ে দেবো। তারপরে আবার যদি ওকে গুল্‌তি দিয়ে মারতে পারিস, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

কিছুদিন পরে একদিন সকালে উঠে দেখা গেল, বাক্সের মধ্যে খরগোসটা নেই। সবাই বললে,—পায়ে যেমনি একটু জোর পেয়েছে তেমনি ও পালিয়েছে। উনি বললেন,—তা কখনো হ'তে পারে না, ফ্র্যাক্‌চারের হাড়ে এত শিগ্‌গির জোড়া লাগতেই পারে না। কুকুর কিংবা শেয়ালে নিশ্চয় ওকে টেনে নিয়ে গেছে। অনর্থক একটা জীবহত্যা হলো, তার চেয়ে কেটে খেয়ে ফেললেই ভালো হতো।

মংরু বললে,—আর একটা খরগোস মেরে আনবো বাবু? মাছও মিলছে না মাংসও মিলছে না, আপনারা কী খাবেন?

উনি বললেন,—না না তোকে আর খরগোস মারতে হবে না, আজ আমি নিজে মৌভাণ্ডার থেকে মাংস কিনে আনছি।

মৌভাণ্ডার জায়গাটা গালুডি থেকে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল দূরে। সেখানে তামার খনির মস্ত কারখানা, প্রত্যহ বাজার বসে, অনেক জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। উনি সকালে চা খেয়ে বেরিয়ে গেলেন, মুখ শুকিয়ে ফিরে এলেন বেলা তিনটেয়, হাতে মাংসের এক মস্ত পুঁটলি। ভালো মাংস কাটা হ'লে তবে মিলবে, এইজন্যে ওঁকে অনেকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু খাবার সময় দেখা গেল মাংসটা মোটেই ভালো নয়, বিশেষত রোগীর পক্ষে অতি কুখাদ্য।

উনি তখন বললেন,—মৌভাণ্ডারে যত কুলিমজুরের দল থাকে, ওখানে ভালো মাংস মিলতেই পারে না। আমি টাটানগর থেকে মাংস আনছি।

টাটানগরে ট্রেণে যাওয়া যায়। রেলপথে গালুডি থেকে টাটানগর খুব কাছে, মাঝে মাত্র দুটি স্টেশন। সকালে খাওয়াদাওয়া সেরে উনি বারোটার ট্রেণে গেলেন, ফিরে এলেন রাত্রি আটটার ট্রেণে। এবারে মাংস আনলেন ভালোই, কিন্তু ওর সঙ্গে আরো যা যা আনতে বলেছিলুম সেগুলো ভুলে গিয়ে এমন কতকগুলো জিনিস এনে হাজির করলেন, যা আমাদের গৃহস্থালীতে উপস্থিত কোনোই কাজে লাগবে না।

আমার শ্বশুর বললেন,—মিছিমিছি কতকগুলো টাকার অপব্যয় হলো, অথচ আমাদের নানা জিনিসের অভাব রয়ে গেল। সেগুলো না হ'লে আমাদের চলবে না, অথচ এখানে ওসব জিনিস মিলবেও না। কলকাতায় হ'লে বরং আমিই গিয়ে কিনে আনতুম, কিন্তু এখানে ট্রেণে উঠে যাওয়া আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বৌমা তুমি বরং এক কাজ করো না, খেয়ে দেয়ে বারোটার ট্রেণে তুমি আর মংরু অমরনাথের সঙ্গেই বরং যাও না, যা দরকার তা নিজে দেখেশুনে

কিনে আনতে পারবে, আর তাতে বরং তোমাদের একদিন নতুন জায়গায় বেড়ানোও হ'য়ে যাবে।

এতে আমাদের ভালোই হলো। পরের দিনেই বারোটার ট্রেণে আমরা টাটানগরে গেলুম। আমাদের সঙ্গে উঠলো গালুডির স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী আর তার এক ভাই, তারাও যাচ্ছে টাটানগরে কি কি জিনিস কিনতে। প্রতিবেশী হিসেবে ওদেব সঙ্গে আমাদের আগেব থেকেই ভাবসাব হ'য়ে গেছে। ওবা বললে প্রায়ই ওরা এমনি বাজার করতে যায়, টাটানগর থেকে বেলা চাবটেব কাছাকাছি একটা মালগাড়ি ছাড়ে, তারই গার্ডের কেবিনে উঠে ওরা ফিরে আসবে, রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। আমরা যদি ইচ্ছে করি তো ওদের সঙ্গে ফিরে আসতে পারি।

রাখা-মাইন্স্ স্টেশনে গাড়ি থামতেই ওবা বললে,—এখানে আপনারা বেড়াতে এসেছিলেন কোনোদিন? ও মা, সে কী কথা, এতদিন গালুডিতে বয়েছেন, অথচ আজ পর্যন্ত রাখা-মাইন্স্ দেখেন নি, তবে আর এখানকার কী দেখলেন? এর চেয়ে সুন্দর দেখবার জায়গা এ অঞ্চলের মধ্যে কোথাও নেই, অথচ এইটেই আপনারা বাদ দিয়েছেন? অনেকে বলে এখানকার দৃশ্য নাকি দার্জিলিংএর চেয়েও সুন্দর।

তখনই স্থির ক'বে ফেললুম যে বিকেলে মালগাড়িতে ওদের সঙ্গে ফিরে এসে আমরা আগে এখানে নামবো, মংকুকে টাটানগরে বেখে আসবো বাজারেব জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে আনবার জন্যে। রাত্রি আটটার ট্রেণে যখন সে ফিববে তখন রাখা-মাইন্স্ থেকে সেই ট্রেণ ধরে তাকে নিয়ে একসঙ্গে বাড়ি ফিরবো।

মাল গাড়ির গার্ড বাবুটির সঙ্গে ভাব ক'রে আমরা তার কামরায় চড়ে রাখা-মাইন্স্ পর্যন্ত এলুম। অমর বাবুর গায়ে মিলিটারি পোষাক ছিল, তাই দেখে সে বেচারা প্রথমে খুব ভয় পেযে গিয়েছিল। তারপরে যখন দেখলে বাঙালী তখন খুব আপ্যায়িত করলে। রাখা-মাইন্সে মালগাড়ি থামাবার কথা নয়, কিন্তু আমাদের নামবার জন্যে গাড়িখানা একবার থামিয়ে দিলে।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত আমরা চলে গেলুম। জায়গাটা সত্যিই খুব চমৎকার। অমর বাবুর সঙ্গে ওখানকার নির্জন বনে আর দুর্গম পাহাড়ে হাঁটতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি, মনে হয় ওঁর হাত ধরে আমি আরো চলি, আরো চলি,—যতই দুর্গমে যাওয়া যায় ততই মন যেন আরো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। স্টেশনের কাছাকাছি অনেক মিলিটারি ক্যাম্প পড়েছে, কিন্তু একটু দূরে গেলেই আর জনপ্রাণী নেই। সেখানে কেবল পাহাড় আর বন, ঝর্ণার জল আর পাথরের নুড়ি। পাহাড়ের পরে কেবল পাহাড়ই দেখা যায়, এক পাহাড়ে দাঁড়িয়ে কথা বললে অন্য পাহাড় থেকে তার এমন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি হয়,—কেউ যেন স্পষ্ট ভেংচি কাটছে। ঝর্ণাগুলো বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে নেমে আসতে আসতে পাথরেব গায়ে যেন জড়িয়ে যায়, তখন তারা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে ওঠে, তারপরে আঁকাবাঁকা খালের ভেতর দিয়ে আপন আনন্দে হাসতে হাসতে চলে যায় নদীর অভিমুখে। খালের ধারে ভিজে বালির ওপরে চলতে চলতে চোখে পড়ে বাঘের পায়ের দাগ। পাহাড়ের গায়ে দেখা যায় গভীর এক একটা গহ্বর, দেখলেই মনে হয় যেন বাঘের গুহা। তখন একটু ভয় করে, আমি অমর বাবুর কাছে আরো ঘেঁষে চলতে শুরু করি। হঠাৎ ভয় পাইয়ে দেবার মতো আর অবাক ক'রে দেবার মতো অদ্ভুত সৌন্দর্যের এখানে ছড়াছড়ি। এক বিস্ময় কাটতে না কাটতে আবার নতুন একটা বিস্ময়, দেখতে দেখতে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। মনে মনে ভাবি, এমন একটা অখ্যাত অজ্ঞাত স্থানে প্রকৃতি কেন মিছামিছি এমন সব সৌন্দর্য ছড়িয়ে রাখলে, যেখানে এব একজনও নেই সমজদার? এ যেন দারুণ প্রতিভাশালী এক বোহিমিয়ান ধরণের খাম-খেয়ালি শিল্পীর রচনা। নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে তার কোনো খেয়ালই নেই, কী যে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করলে সে বিষয়ে কোনো চৈতন্যই নেই, অস্থানে বসেই ইচ্ছামতো যাহোক সৃষ্টি ক'রে ইচ্ছামতো ফেলে ছড়িয়ে চলে গেল,—ফিরে আর তাকিয়েও দেখলে না। শিল্পী কবে চলে গেছে, তার রচনা সেখানেই আজও অবহেলায় পড়ে আছে।

নির্জন এক বনের কোলে নিরালা একটি ঝর্ণার ধারে গিয়ে আমরা দুজনে এক শিলাখণ্ডের ওপর বসলুম। একটা শিমূল গাছের ডাল সেখানটায় নুয়ে পড়ে তার ওপর চমৎকার ছায়া বিছিয়ে রেখেছে। শ্যাওলায় শ্যাওলায় ঝর্ণার তলদেশটা সমস্তই সবুজ হ'য়ে আছে, তারই প্রতিচ্ছায়াতে জলটা পর্যন্ত দেখাচ্ছে যেন সবুজ। আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—এই ঝর্ণাটার নাম কী দেওয়া যেতে পারে বলুন তো? উনি বললেন—শ্যাওলা ঝর্ণা। আমি বললুম—না না, তার চেয়ে বলুন শ্যামল ঝর্ণা। উনি বললেন,—এ দেশের লোকেরা অত কাব্য বোঝেনা। তুমি বরং একটু কাব্য করো, এখানে বসে বসে আমাকে একটা গান শুনিয়ে দাও, রবীন্দ্র-নাথের একটা বেশ ভালো গান। আমি গাইলুম,—'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'। সবটাই যেন কাব্য,—কলকাতা শহরের মেয়ে এসে পড়েছি পার্বত্য ঝর্ণার ধারে, পাশে বসে আছে আমার বহুবাঞ্ছিত প্রিয় মানুষটি। এখানে কেবল এই আমরাই দুজন। ঝর্ণার স্রোতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমি তন্ময় হয়ে গাইছি, আর আমার প্রিয় স্তব্ধ হয়ে শুনছে,—বাস্তব ব'লে বিশ্বাসই হয় না। বারে বারে ওঁর গায়ে হাত ছুঁইয়ে তাই দেখি, মনে মনে ভাবি—এও কী সত্যি?

বেলা পড়ে আসছে দেখে আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। কিন্তু তখনও ট্রেণের অনেক দেরী, স্টেশনে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে। স্টেশনের দিকে যেতে পথের মাঝে দেখা গেল এক ক্যান্টিন। মিলিটারি লোকদের জন্যে সেখানে চা বিস্কুট কেক প্রভৃতি নানারূপ জলযোগের ব্যবস্থা আছে, দেশীয় সৈনিকরা সেখানে দলে দলে যাচ্ছে। অমর বাবু বললেন—এখানে বসে একটু চা খাওয়া যাক। আমরা দুজনে সেখানে গিয়ে উঠলুম।

অনেক লোকের ভিড় হয়েছে, আমরা একপাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে গেছি। একজন মুসলমান বয় এটা লক্ষ্য ক'রে হাতের কাজ ফেলে দিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এলো। অমর বাবুর সম্ভ্রান্ত চেহারা আর মিলিটারি পোষাক দেখেই হোক, কিংবা সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছে দেখেই হোক, সে বললে,—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বসবার জায়গা পাচ্ছেন না? চলুন, এখানে আপনাদের দাঁড়িয়ে

থাকতে হবে না। আমাদের ক্যান্টিনের পিছন দিকে একটা নিরিবিলি জায়গা আছে, সেখানেই বসবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।

যেখানে আমাদের নিয়ে গেল সেখানে চারিদিকে টিন দিয়ে ঘেরা প্রকৃতই এক নিভৃত স্থান। বাইরের দিকে এক মস্ত চওড়া টিনের দরজা, সেটি বন্ধ ক'রে দিলেই জায়গাটা হ'য়ে যায় ঘরের মতো, খুলে দিলে দেখায় বারান্দার মতো। সেখানে ছুটি ক্যাম্প-চেয়ার পেতে আমাদের বসিয়ে সেই মুসলমান বয়টি জিজ্ঞাসা করলে,—আপনারা এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, সন্ধ্যার গাড়িতে ফিরবেন বুঝি? চা-টা খেয়ে ট্রেণের সময় পর্যন্ত এখানেই আপনারা বিশ্রাম করুন, কেউ আপনাদের বিরক্ত করবে না।

বয়টির কথাবার্তা অতি ভদ্র। ও রকম জায়গায় এমনটি আশা করা যায় না। চা খেতে খেতে আমরা তার সঙ্গে অনেক আলাপ করলুম, তার পরিচয় জানলুম। সে ঐ ক্যান্টিনের বয়দের সর্দার, নাম আবছুল। বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়। আসলে সে বাঙালী, কিন্তু কাজের গতিকে তাকে হিন্দি কথা বলতে হয়, ইংরেজী কথাও বলতে হয়। খুব ছেলেবেলা থেকেই সে বয়ের কাজ করছে, অনেকদিন জাহাজেও কাজ করেছে, কয়েকবার নাকি বিলেতেও ঘুরে এসেছে। এখন বেশি মাইনে পাবে বলে সে এখানকার চাকরি নিয়েছে, নইলে সংসার চলে না। সংসারে তার আছে এক রুগ্না স্ত্রী আর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে মাসে মাসে তাকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়, তবুও ওর স্ত্রী কিছুতেই সেরে উঠছে না।

কী জন্যে জানি না, আবছুল গোড়া থেকেই আমাদের প্রতি কেমন আকৃষ্ট হয়েছিল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই সে অকপটে তার ঘরের সমস্ত কথাগুলি আমাদের কাছে বললে। অমর বাবুর সঙ্গে ওর কথাবার্তা শুনতে শুনতেই আমি বুঝতে পারলুম কেন ও এত কথা তাঁর কাছে বলছে। অমর বাবু ওর সঙ্গে হীনজাতীয় লোকের মতো ব্যবহার করছেন না, আমাদের সঙ্গে যেমন অন্তরঙ্গ ভাবে কথা বলেন ওর সঙ্গেও তেমনি ভাবেই বলছেন।

আবদুল আমাদের বসিয়ে রেখে চলে গেল। বললে—আপনারা নিশ্চিন্তে এখানে বিশ্রাম করুন। ট্রেণের সময় হ'লেই আমি খবর দেবো।

এমনি একটি নিরিবিলি জায়গা আমরা দুজনেই চাইছিলুম, যেখানে নিশ্চিন্তে বসে দুটো মনের কথা বলতে পারি, নিঃসঙ্কোচে অন্তরের স্নেহকে প্রকাশ করতে পারি। যেন নিতান্ত দৈব অনুগ্রহে ঠিক তেমনি একটি জায়গাই আমরা পেয়ে গেলুম।

আমরা যেখানে বসে আছি তার পিছনে চাইলে দেখা যায় খানিকটা বন্ধুর ভূমি আর ঘন গাছের সারি। দূরে দেখা যায় স্টেশনের আলো। রেল লাইনগুলো মাঝে মাঝে চক্‌চক্ করছে। সন্ধ্যা পার হ'য়ে গেছে, অন্ধকারেই আমরা বসে আছি। আলোর কোনো প্রয়োজন নেই। আকাশের নক্ষত্র থেকে যতটুকু আলো আসছে তাতেই দেখা যাচ্ছে ওঁর মুখখানি, সিগারেট টানবার সময় তার আগুনের দীপ্তিতে সেই মুখ মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে। গাছের পাতাগুলো মাঝে মাঝে উত্তেজিত হ'য়ে প্রচুর মর্মরধ্বনি করছে, আবার অসাড়ের মতো নিস্তব্ধ হ'যে যাচ্ছে। বাইরে ক্যান্টিনের গুঞ্জনধ্বনি থেকে থেকে মুখর হ'য়ে উঠছে। সময়টা যে কোনখান দিয়ে পার হ'য়ে যাচ্ছে আমরা কিছুই অনুভব করতে পারছি না। ওঁর হাতে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছি, তখন আর কোনো কথা বলবার ইচ্ছে নেই। একটু নড়ে বসতেও সাহস হয় না, পাছে একটুতেই সেই গভীর তন্ময়তাটুকু ভেঙে যায়।

ট্রেণের সময় হ'তেই আবদুল আমাদের সচেতন ক'রে দিলে। আসবার সময় অমর বাবু তাকে এক টাকা বকশিশ দিলেন, সে তাতেই মহা সন্তুষ্ট। আমাদের বললে,—যখনই এদিকে বেড়াতে আসবেন তখনই এখানে এসে চা খেয়ে বিশ্রাম ক'রে যাবেন। নিজের পরিচয় সে সমস্তই বলেছে, কিন্তু আমাদের পরিচয় একবারও জানতে চাইলে না।

ট্রেণে উঠে মংরুর কাছে বাজারের হিসেব নিলুম। আমরা যা কিনতে পারিনি সমস্তই সে গুছিয়ে কিনে এনেছে, কতকগুলো জিনিস আমাদের চেয়েও

সস্তায় কিনেছে। বোঝা গেল আমাদের চেয়েও সে ভালো বাজার করতে পারবে।

এর পর থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন ক'রে আমরা বাজার ক'রে আনবার জন্যে ট্রেণে চড়ে রওনা হতুম টাটানগরের দিকে। কিন্তু টাটানগর পর্যন্ত আর না গিয়ে রাখা-মাইন্‌সেই আমরা নেমে পড়তুম, মংরুকে পাঠিয়ে দিতুম জিনিসপত্র কিনতে। রাত্রি আটটার ট্রেণে উঠে আমরা ওর সঙ্গে ফিরতুম।

রাখা-মাইন্‌সে নেমে সারাদিনটাই আমরা যথেচ্ছা বেড়িয়ে বেড়াতুম। কখনো চলে যেতুম পূবে মৌভাণ্ডারের দিকে, কখনো পশ্চিমে আসানবনির দিকে, কখনো চলে যেতুম ওখানকার পুরোনো তামার খনিগুলি দেখতে। শুনেছি কোনো এক সাহেব কোম্পানি এখানকার পাথরের মধ্যে তাম্রধাতুর সন্ধান পেয়ে এখানে বিরাট তামা প্রস্ততেব কারখানা খুলেছিল। তখন থেকেই এ জায়গাটার নাম রাখা-মাইন্‌স্। কালক্রমে কারখানাটা এখান থেকে উঠিয়ে মৌভাণ্ডারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এখানকার কারখানার ভগ্নাবশেষগুলো এখনও তেমনি অবস্থাতেই পড়ে আছে। দুটি পাহাড়ের মাঝে বাঁধ বেঁধে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় তৈরী করা হয়েছিল, সেখানে এখন আর জল নেই। কারখানা উঠে যাবার পরে একজন সাহেব কাজে অবসর নিয়ে এখানেই বসবাস করতে লাগলেন, এখানকার সৌন্দর্যের মায়া কাটিয়ে তিনি নিজের দেশেও ফিরে যেতে পারলেন না। এখানেই তিনি একা একা থাকেন, চাষবাস করেন, গরু পোষেন, পোল্‌ট্রি তৈরী করেন। আগেকার দরুণ কয়েকখানা বাংলো বাড়ি কিনে রেখেছেন, কেউ এসে বাস করতে চাইলে ভাড়াও দেন।

বুনোদের মতো সারাদিন বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়ে বিকেলে খুব ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হ'য়ে আমরা ক্যান্‌টিনে গিয়ে উপস্থিত হই। আবদুল আমাদের হাসি-মুখে অভ্যর্থনা ক'রে সেই নিরালা জায়গাটিতে বসিয়ে খুব পেট ভরে' খেতে দেয়। সে আমাদের জন্যে আগের থেকেই প্রস্তুত থাকে, কারণ সে জানে সপ্তাহের মধ্যে কোন দিনটিতে আমরা যাবো। খেয়ে নিয়ে সেখানেই আমরা বিশ্রাম করতে

থাকি, ট্রেণের সময়ের কথা বারেবারেই ভুলে যাই, আবদুল এসে যখন স্মরণ করিয়ে দেয় তখন অমর বাবু তাড়াতাড়ি উঠে ক্যান্টিনের বিল মিটিয়ে আবদুলকে একটি টাকা বকশিশ করেন।

আমি বলি,—এক টাকায় ওর কী লাভ হবে? আরো কিছু দেওয়া উচিত।

উনি বলেন,—এক টাকাতেই যখন খুশি হয়, তখন আর বেশি দেবার কী দরকার?

—আপনি তো ভারী কৃপণ দেখচি। এমনি ক'রে অনেক টাকা জমিয়েছেন নাকি?

—কিছুই না।

—কেন? এত যে মাইনে পান, সব টাকাই কী খরচ ক'রে ফেলেন?

—সবই দেশে পাঠিয়ে দিই, সামান্যই রাখি নিজের হাত খরচের জন্যে, সেই জন্যেই তো আমাকে অনেক হিসেব ক'রে চলতে হয়।

—টাকাগুলো কার কাছে পাঠান?

—কেন, আমার স্ত্রীর কাছে।

—তাঁর কাছে এ পর্যন্ত কত টাকা জমেছে?

—কেমন ক'রে জানবো? সংসারে যা দরকার হয় তিনি খরচ করেন, বাকি হয়তো তুলে রাখেন।

—ও মা, মোটা মোটা টাকা কোথায় চলে যাচ্ছে তার কোনো হিসেবই রাখেন না, অথচ আবদুলকে একটার বেশি দুটো টাকা দিতে আপনার কষ্ট হয়! চাকরি ছেড়ে এসে যখন বসবেন তখন কেমন ক'রে আপনি চালাবেন শুনি?

—কলকাতায় তখন একটা চেম্বার খুলবো, তার সঙ্গে একটা নার্সিং হোম থাকবে, এই আমার ইচ্ছে আছে। ওতেই বেশ চলে যাবে।

—কিন্তু ও-সব করতে গেলে আগে অনেক মূলধন চাই, সে টাকা কোথায় পাবেন?

—সে তখন চেষ্টা ক'রে জোগাড় করা যাবে।

—সে কী, নিজের উপায় থাকতে ধার করবেন কেন? এখন থেকে তার জন্যে সঞ্চয় করুন। আপনার দেশে সংসার খরচের জন্যে যা লাগে আর নিজের হাত খরচের জন্যে যা লাগে তাই কেটে নিয়ে মাইনের বাকি টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা ক'রে রাখুন।

—তাই তুমি করতে বলছো? এ কথাটা এতদিন ভেবে দেখিনি, তাহ'লে এতদিনে হয়তো অনেক টাকা জমে যেতো। আচ্ছা, এবার থেকে তাই করবো।

—হাঁ, নিশ্চয় করবেন, এই মাস থেকেই শুরু করুন।

ছট্টুর কথা আমার বারে বারেই মনে পড়ে। অমর বাবু অমন একজন কৃতী পুরুষ হ'লেও ভেতরে ভেতরে যে কতখানি অসহায়, সাংসারিক বিষয়ে যে কতখানি কাঁচা, যতই ওঁর সঙ্গে মিশে দেখি ততই আমি বুঝতে পারি। শুধু তাই নয়, সময় সময় এমন বেসামাল হ'য়ে ওঠেন যে নিতান্তই মায়ের মতো ক'রে ওঁকে ভুলিয়ে দেবার দরকার হয়, নইলে গোলমাল বেধে যায়। শরীর নিয়ে খুঁৎখুঁৎ করা ওঁর একটা রোগ হয়েছে, বোধ হয় যুদ্ধের সময়কার সেই অসুখটার পর থেকেই। থেকে থেকে মনে করেন শরীর অত্যন্ত খারাপ হচ্ছে,—তখন বারে বারে সে কথা ব'লে যেন কার কাছে তার প্রতিকার চান। আমি তাই শুনে যেমনি একটা কোনো মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করি, তাতেই ভালো হ'য়ে যায়।

ঠাট্টা ক'রে আমি ওঁকে বলতুম,—এই বয়সেই আপনি এমন অসহায়, যখন বুড়ো হবেন তখন কী করবেন?

উনি বলতেন,—তখন আমি আবার একটা বিয়ে করবো।

ভারী হাসি পেতো ওঁর কথাগুলো শুনে, খিল্‌খিল্ ক'রে আমি হেসে উঠতুম। তৎক্ষণাৎ কল্পনার ক্ষিপ্রগতিতে আমার চোখের সুমুখে ভেসে উঠতো,—অমর বাবুর মাথার চুলগুলো যেন পেকে শোনের নুড়ি হ'য়ে গেছে, মুখে একটাও দাঁত নেই, কপালে কনেচন্দনের টিপ প'রে গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে মাথায় টোপর

দিয়ে উনি সেই বয়সে বিয়ে করতে গেছেন একটি পনেরো বছরের লজ্জাবতী মেয়েকে, সাত পাক ঘুরিয়ে ঘোমটা খুলে বাড়ির লোকেরা দুজনকে শুভদৃষ্টি করাচ্ছে। এই দৃশ্যটা মনে করলে কার না হাসি পায়?

হাসতে হাসতে আমি জিজ্ঞাসা করতুম,—ফুলশয্যার রাত্রে নতুন বৌএর সঙ্গে আপনি কী ব'লে ভাব করবেন?

—বলবো যে, আজ থেকে আমি তোমার কে হলুম তা জানো তো?

আরো জোরে হেসে উঠে আমি বলতুম,—খালি ঐটুকু? আরো কী কী তাকে বলবেন সব বলুন না? মনে করুন আমিই সেই নতুন বৌ, আমাকেই আপনি বলছেন।

—তা কী হয়? এ সব গোপন কথা তাকেই শুধু বলবো, আগের থেকে সে কথা তোমায় জানাবো কেন?

কপট কোপের অভিনয় ক'রে আমি বলতুম—না বলেন নাই বললেন, আমি শুনতে চাই না।

অমর বাবুর মনটি এমন সরল, ঠাট্টা করলে মোটে বুঝতে পারেন না। মাঝে মাঝে বিষম রেগে ওঠেন। স্বর্ণরেখার ওপারে পারঘাটার কাছে একটা গাছতলায় আমরা একদিন বসে আছি, এমন সময় কতকগুলি সাঁওতালি মেয়ে নদী পার হ'য়ে আমাদের কাছাকাছি এসে এক জায়গায় হঠাৎ বসে পড়লো, —নিজেদের মধ্যে কী যেন পরামর্শ করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে ওদের দলের ভেতর থেকে একটি মেয়ে যেন প্রতিনিধি স্বরূপ হ'য়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো। চমৎকার তার স্বাস্থ্য, সমুন্নত স্তন দুটিকে ঢেকে বুকের কাপড়টা সজোরে কোমরে এঁটে বেঁধে এসেছে। ভাঙা ভাঙা বাংলায় খুব ভয়ে ভয়ে সে অমর বাবুকে বললে,—বাবু, তুই কি আমাদের কাঠ নিতে দিবি নাই? এত দূর এসে আমরা ফিরে যাবো?

অমর বাবু বললেন,—কেন ফিরে যাবে? আমি এখানকার কেউ নই। যত ইচ্ছে কাঠ তোমরা নিয়ে যাও।

সে বিশ্বাসই করলে না ওঁর কথা। বললে,—অমন পোষাক পরেছিস, তুই তো জঙ্গলের হাকিম বটিস, কাঠ নিলেই তুই আমাদের চালান দিবি। আমরা কিন্তু কোনোদিন গাছ কাটি না, শুধু শুক্‌না ডালগুলো ভাঙি। আজ আমরা এমনি চলে যাচ্ছি, কাঠ নেওয়া হবে নাই।

ওরা সত্য সত্যই চলে যায় দেখে অমর বাবু বললেন,—আমার সঙ্গে এসো, আমিই কাঠ ভেঙে দিচ্ছি, তোমাদের কোনো ভয় নেই। নিজে গিয়ে গাছ থেকে অনেক শুক্‌নো ডাল ভেঙে ভেঙে ওদের দিলেন।

ফিরে এসে যখন আমার কাছে বসলেন তখন আমি ঠাট্টা ক'রে বললুম,—পাড়াগাঁয়ে থেকে ছেলেবেলায় এই কাজ করাই বুঝি আপনার অভ্যাস ছিল? ভালো চেহারা দেখলেই বুঝি অমনি মেয়েদের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে এমনি ক'রে কাঠ ভাঙতেন?

এই কথা বলাতেই ওঁর মুখখানা বেজায় গম্ভীর হ'য়ে গেল। রাগের চোটে মুখ দিয়ে কথাই বেরোয় না। অনেক কষ্টে বললেন,—আমাকে তুমি এতটাই হীন মনে করো? তাহ'লে তুমি আমাকে কিছুই চিনতে পারো নি, জীবনে আমি কখনো কোনো মেয়েদের দিকে—সে কথা তো—

ওঁর রাগ দেখতে আমার খুব মজা লাগে। ইচ্ছে হচ্ছিল আরো একটু রাগিয়ে দিই, কিন্তু ওঁর মুখ দেখে আর আমার সাহস হলো না। ঠাট্টা করেছি বুঝিয়ে দেওয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলেন।

একদিন আমরা রাখা-মাইন্‌স্‌ থেকে বেড়াতে বেড়াতে চলে গেছি অনেক দূরে। একটা জঙ্গলের বাঁক পার হ'য়ে যেতে সুমুখেই দেখতে পেলুম মস্ত উঁচু সিদ্ধেশ্বর পাহাড়। আগেই শুনেছিলুম যে এখানকার পাহাড়গুলোর মধ্যে এরই উচ্চতা সব চেয়ে বেশি। আমি বললুম,—চলুন এই পাহাড়ের ওপরে উঠতে হবে, এর ওপারে কোথায় রানী-ঝর্ণা আছে, সেটা একবার দেখতে হবে। উনি অনেক বারণ করলেন,—এতটা ওপরে উঠতে আমার কষ্ট হবে, জঙ্গলের মধ্যে বাঘ ভাল্লুকও থাকতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু কিছুতেই আমি নিষেধ মানছি না

দেখে অগত্যা উনি রাজি হলেন। একে তো সেই দারুণ খাড়াই পাহাড়, তাতে আবার কোনো পথ নেই, পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চলতে সত্যিই আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। উনি তা বুঝতে পেরে অনেকবার বললেন,—ফিরে চলো মীরা, আর ঝর্ণা দেখে কাজ নেই। কিন্তু তখন ফিরলে যে আমার দুর্বলতা প্রমাণ হ'য়ে যায়। আমি বললুম,—আমার তো কোনো কষ্ট হচ্ছে না, দেখুন না, কত তাড়াতাড়ি উঠছি। প্রাণপণ শক্তিতে আমি পাহাড়ে উঠতে লাগলুম, শীতের দিনেও আমার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল, কিন্তু সে কথা ওঁকে জানতে দিলুম না। কোনোমতে পাহাড়ের ওপরে উঠে তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম, তার পরে খুঁজে খুঁজে রানী-ঝর্ণাও বের করলুম। কেন যে এই ঝর্ণার এত নামডাক তা জানি না, জল খুবই কম, কুল্‌কুল্‌ শব্দে কোনো গতিকে বেয়ে চলেছে। সেই ঝর্ণার পাশে গিয়ে আমরা বসলুম।

উনি বললেন,—এই ঝর্ণাটার নাম রানী-ঝর্ণা কেন হলো বলো দেখি?

—তা তো জানি না, এখানকার লোকেরা ঐ নাম রেখেছে।

—কিন্তু বেছে বেছে ঐ নামটাই বা কেন রাখলে? ওরা নিশ্চয় জানতো যে এই দুর্গম পাহাড়ে এই ঝর্ণাটি দেখতে একদিন নিশ্চয় কোনো রানী আসবে, তাই ওরা আগের থেকেই ঐ নামটা দিয়ে রেখেছে।

—তা হবে, সেইজন্যে হয়তো ওরা এই পাহাড়টারও নাম দিয়েছে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়। ওরা জানতো যে সিদ্ধেশ্বর বাবুও নিশ্চয় একদিন আসবেন।

—সিদ্ধেশ্বর বাবু আবার কে হলো?

—রানীব মনোবাসনা যিনি ঈশ্বরের মতো অনায়াসে সিদ্ধ করতে পারেন তিনিই সিদ্ধেশ্বর।

ঝর্ণার ধারে ধারে চমৎকার একরকম খড়ের মতো লম্বা লম্বা ঘাসের বন, তাতে ছোটো ছোটো বেগুনি ফুল ফুটেচে। উনি বললেন,—এই ঘাসগুলো খুব দীর্ঘজীবি, এগুলোকে গোছা বেঁধে তোড়ার মতো ক'রে আলমারিতে সাজিয়ে রাখলে চিরকাল থাকে, কখনো ঝরে না কিংবা নষ্ট হয় না। আমি

বললুম—ঐ ঘাস আমরা বাড়ি নিয়ে যাবো। দুজনে মিলে বেছে বেছে তুলতে লাগলুম।

ঘাস তুলতে তুলতে আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—কতকাল পর্যন্ত এগুলো থাকতে পারে? যদি যত্ন ক'রে রাখা যায় তাহ'লে আমি মরে যাবার পরেও এমনি থাকবে তো?

উনি বললেন,—তা বলা যায় না, সেটা নির্ভর করে কতদিন তুমি বাঁচবে সেই হিসেবটার ওপরে। মনে করো তুমি যদি আরো একশো বছর বাঁচো, তখনো কি আর এগুলো থাকবে? কিন্তু ধরো তুমি যদি একমাস কিংবা এক বছর পরে মরে যাও, ততদিন নিশ্চয়ই থাকবে।

আমি বললুম,—তবে তো খুব ভালো কথা। আমি মরে গেলে এগুলো আপনি নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রাখবেন, এই হবে আমার স্মৃতিচিহ্ন।

অনেকগুলো ঘাস সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আমি সবেমাত্র উঠে দাঁড়িয়েছি, হঠাৎ চেয়ে দেখি খানিকটা দূরে বনের মধ্যে একটা মস্ত কালো জানোয়ার। পাতার অন্তরাল থেকে তার খানিকটা দেহের অংশ দেখা যাচ্ছে, একটু একটু যেন নড়ছেও। আমি তৎক্ষণাৎ অমর বাবুর হাত চেপে ধরলুম, ইসারায় কোনো শব্দ করতে নিষেধ ক'রে আঙুল দিয়ে ঐ জানোয়ারটার দিকে দেখালুম। উনি তবুও কিছু বুঝতে পারেন না, সে দিকে মোটে লক্ষ্য না ক'রে কেবল আমারই মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকেন। অগত্যা আমি তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললুম,—ঐ ভাল্লুক, পালিয়ে চলুন।

উনিও ঠিক তেমনি ভাবে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন,—হ'লেই বা ভাল্লুক, কোনো ভয় নেই, আমার কাছে রিভলভার আছে। এই ব'লে তিনি প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করলেন। সেটা ওঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো।

—(খুব চুপিচুপি) না না, অমন গোঁয়ারতমি ক'রে কাজ নেই, দৈবাৎ গুলি যদি ফস্কে যায় তাহ'লে এখনই ওটা আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

—(তেমনি চুপিচুপি) কোনো ভয় নেই, তুমি একটু সরে দাঁড়াও, আমি এখনই ওটাকে সাবাড় করছি। আমার লক্ষ্য একেবারে অব্যর্থ।

ভয়ে ভয়ে অগত্যা আমি একটু সরে দাঁড়ালুম, উনি উপর্যুপরি দুবার গুলি ছুড়লেন। পাতাগুলোর মধ্যে খস্‌খস্‌ শব্দ ক'রে উঠলো, তারপরে জানোয়ারটাকে আর দেখা গেল না।

—কৈ আর দেখা যাচ্ছে না তো? মরে গেল না পালিয়ে গেল?

—নাঃ, মারতে আর পারলুম কৈ? তাহ'লে তো ঐখানেই পড়ে থাকতো, অন্ততপক্ষে গোঁ গোঁ শব্দটাও করতো। গুলি খেয়েছে নিশ্চয়, বোধ হয় মরবার মতো তেমন লাগে নি, তাই পালিয়ে গেল।

—তবে আমরাও পালাই চলুন, এখানে আর একটুও থেকে কাজ নেই।

—তাই চলো।

পাহাড় থেকে তাড়াতাড়ি নেমে আমরা রাস্তায় পড়লুম। নির্ভয়ে যখন চলতে শুরু করেছি তখন উনি হাসতে হাসতে বললেন,—তুমি যে এত বোকা তা আমি জানতুম না। মনে করতুম খুব চালাক, দেখছি তা মোটেই নয়। তোমাকে ঠকানো খুবই সোজা।

—কেন, আমি বোকা হলুম কিসে?

—ওটা ভাল্লুক নাকি? ও একটা কালো ছাগল চরছিল, অনেক আগেই আমি দেখেছি। ভাল্লুক হ'লে কী মানুষ দেখে ঐখানেই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো? ভাল্লুক হ'লে কী আমিই তাকে সামান্য একটা রিভলভার নিয়ে গুলি করতে সাহস করতুম, আর গুলি খেয়ে সেও অমনি চুপচাপ সরে পড়তো? ছাগলটাকে না মেরে তার কাছাকাছি দুটো গুলি ছুড়লুম, শব্দ শুনেই সে পালিয়ে গেল। কিন্তু তুমি এমনি বোকা, মোটেই বুঝতে পারলে না যে আমি ঠকাচ্ছি।

—বা রে, সেটাও বুঝি আমার বোকামি হলো? শুধু শুধু আপনাকে সন্দেহ করবো নাকি? আপনার কথাতেই আমার যে বিশ্বাস হয়, সেটা কী একটা দোষের কথা নাকি?

—তাই ব'লে যা বলবো সবই কী বেদবাক্যের মতো চোখ বুজে বিশ্বাস ক'রে নেবে, চোখ চেয়ে একবারও দেখবে না, সত্যি বলছি না মিথ্যে? দেখতে পাচ্ছি তুমি নিতান্তই নিরীহ, তোমাকে ঠকানোও যেমন সহজ, আর রাগানোও তেমনি সহজ।

—আমাকে ঠকানো কেবল আপনার পক্ষেই সহজ হ'তে পারে, কিন্তু তাই বলে রাগানো সহজ নয়। আপনার মতো অমন সামান্য একটা কথাতেই আমি রাগি না।

—তোমাদের রাগ তো আমাদের মতো নয়, তোমাদের রাগ হয় শুধু মনে মনে, সেটা প্রকাশ করতে পারো না।

—আমি অন্য মেয়েদের মতো মোটেই নই, রাগ হ'লে তা আমি খুবই প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু আপনি যতই যাই বলুন, আপনার কোনো কথা শুনে যে আমার রাগ হবে কিংবা দুঃখ হবে, এটা কখনো হ'তেই পারেনা।

—কিন্তু এমন কথা আমি জানি যা বললে এখনই তোমার মুখের হাসি মিলিয়ে যাবে।

—আমি বুঝেছি আপনি কী বলতে চান। স্ত্রী আর পুরুষের মধ্যে ঐ খানেই তফাৎ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনাদের কাছে ধরা না দিয়েছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাই আপনাদের অনেক রকম দুঃখ দিতে পারি, সবই আপনাদের সহ্য ক'রে যেতে হয়। কিন্তু ধরা দেবার পরে আসে আপনাদের পালা,—তখন অনেক রকম ভাবেই আপনারা আমাদের দুঃখ দিতে পারেন। কিন্তু সে হ'তে পারে অন্যের পক্ষে। আপনার পক্ষেও যে তা সম্ভব এ আমি বিশ্বাস করি না।

—না না, তাই কী কখনো সম্ভব? জলে ভাসতে ভাসতে এতদিনে একটা পা দিয়ে দাঁড়াবার মতো জায়গা পেয়েছি, সে কথা দুদিনেই ভুলে যাবো? কিন্তু ঐ দেখ, এখনই তুমি বলছিলে যে আমার কোনো কথাতেই তুমি দুঃখ

পাবে না, অথচ কথা বলতে না বলতেই দুঃখ পেয়ে গেলে। দেখছো তো, আঘাত যখন লাগে তখন কেউই ঠাট্টা বুঝতে পারে না। তা নয়, আমি ঠাট্টা ক'রে অন্য বিষয়ের একটা কথা বলতে যাচ্ছিলুম। তুমি ধরতে পারলে না। আচ্ছা বলতো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কিছুই আর তুমি বলো না কেন? আমি নিজে এড়িয়ে যাই তার হয় তো একটা কারণ আছে, কিন্তু তুমি এড়িয়ে যাও কেন? অনেকদিন থেকে ঐ কথাটাই জানবার ইচ্ছে ছিল।

—ওর সম্বন্ধে আমার বলবারও কিছু নেই, জানবারও আর কিছু নেই, তাই। যেখানে ওর আগের থেকেই রয়েছে অধিকার সেখানে আমার কোনো দাবী নেই। কিন্তু ওর ঐ বন্ধনের অতীত যে মানুষটি, তার ওপরে কেবল আমার অধিকার, সেখানে ওর কোনো দাবী নেই। সেই মানুষটিকে ও কখনো চেনেনি, তাকে চায়ও নি এবং পায়ও নি। ইতিহাস ওর অধিকারের কথা বংশ পরম্পরায় স্বীকার ক'রে যাবে, কিন্তু আমার অধিকারের কথা স্বীকার করবেন শুধু অন্তর্যামী। আমি তাই বলতে চাই, ওর প্রাপ্যটা ওকে যেমন ইচ্ছে দিয়ে যেতে থাকুন, আমার তাতে কোনোই আপত্তি নেই। কিন্তু তবুও কী হয় জানেন, স্ত্রীলোকের মন বৈ তো নয়,—যখনই ওর সম্বন্ধে কোনো কথা আপনি বলেন তখনই খচ্ ক'রে কী যেন আমার গলায় কাঁটার মতো বিঁধে যায়, আমি যেন ঢোক গিলতে পারি না। সেই জন্যেই আর ওর সম্বন্ধে কোনো কথা শুনতে কিংবা বলতে ইচ্ছে হয় না। জানি যে ও আপনার প্রথম জীবনের সঙ্গিনী, ওকে এক সময় আপনি ভালোবাসতেন, এখনও হয়তো ওর প্রতি আপনার অনেক মায়া-মমতা আছে, কিন্তু সে থাক, সে আমি কিছু শুনতে চাই না। এ সব কথা নিয়ে আপনি আমাকে ঠাট্টাও কখনো করবেন না। আমার মনের মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে ঠাট্টাও সহ্য হয় না।

—তোমাকে মাঝে মাঝে একটু আঘাত দিয়ে দেখতে আমার ভালো লাগে, তাই ওর কথা বলি। নইলে তুমি যা মনে করো তার কিছুই সত্যি নয়।

তুমি তো জানো, ওর ভিতরের কবাট আমার দিকে কখনই খোলে নি। আমার সঙ্গে মাত্র বাইরের সম্পর্ক। ঐ বাইরের সম্পর্কটুকু আমি এখনই ত্যাগ করতে পারি। মিথ্যা জিনিসটাকে কেবল লোক দেখাবার জন্যে রেখেই বা লাভ কী ?

—ঐ মিথ্যা জিনিসটা নিয়েই তো এতকাল কাটিয়ে এলেন। কিন্তু আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি অনেকবার বলেছি যে কারো অধিকার কেড়ে নিয়ে কিংবা কারো মনে কষ্ট দিয়ে আমি কখনো খুশি হ'তে পারবো না। যার যা প্রাপ্য তাকে সেটুকু দিয়ে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের চলতে হবে।

—তবে চিরকালই কী এমনি ভাবেই চলবে ?

—তাতেই বা দোষ কী ? কতই আনন্দে রয়েছি, তাই কী যথেষ্ট নয় ?

কথা বলতে বলতে আমরা যখন ক্যান্‌টিনে এসে পৌছলুম তখন অনেকটা রাত হ'য়ে গেছে, ট্রেণের সময় হ'য়ে এসেছে। আবদুল আমাদের তাড়াতাড়ি চা খাইয়ে ট্রেণ ধরিয়ে দিলে।

ওঁর তিন মাসের ছুটি ফুরিয়ে যাবার যখন সময় হ'য়ে এলো তখন উনি কলকাতায় চলে গেলেন, অসুস্থতার ওজর দেখিয়ে ছুটিটা আরো তিন মাসের জন্যে বাড়িয়ে আনতে। আমার স্বামীর শরীরের উন্নতি প্রথমটায় যেমন দেখা গিয়েছিল আর তেমন উন্নতি হলো না বটে, কিন্তু খারাপও কিছু হয়নি। তিনি আরো কিছুদিন গালুডিতে থাকতে চাইলেন, সুতরাং অমর বাবুও থাকবেন। যাবার সময় ওঁকে বলে দিলুম, ছুটির ব্যবস্থা ক'রে ফিরবার আগে একবার ওঁদের দেশে গিয়ে ছেলেপুলেদের যেন দেখে আসেন।

সাত আট দিন বাদে যখন উনি ফিরলেন তখন ওঁর সঙ্গে এলো দাদা আর ঠাকুরপো। দাদারা বনগাঁ থেকে ম্যালেরিয়া নিয়ে ফিরে এসেছে, মেসের রান্না খেয়ে খেয়ে ঠাকুরপোর শরীরটাও খারাপ হয়েছে, উনি তাই ওদের দুজনকে জোর ক'রে ধরে এনেছেন।

ওরা আসাতে দিন কতকের জন্তে আমাদের খুব হৈ চৈ বেধে গেল। অমর বাবুকে নিয়ে ওরা রাখা-মাইন্‌স্, রক্কিনী পাহাড়, মৌভাণ্ডার প্রভৃতি অনেক জায়গায় বেড়িয়ে এলো। তারপরে একদিন খেয়াল হলো যে সকলে মিলে সাত গুড়ুম্ দেখতে যেতে হবে, সেখানে গিয়ে পিক্‌নিক্ করতে হবে।

সাত গুড়ুম্ ওখান থেকে প্রায় বারো চৌদ্দ মাইল দূরে। একটা পার্বত্য নদী সেখানে পাহাড় আর বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঘুরে ফিরে সাতবার পাক খেয়ে গেছে, ঐ পথে যেতে হ'লে সাতবার নাকি সেই নদীটাকে অতিক্রম করতে হয়, সেইজন্তেই তার নাম হয়েছে সাত গুড়ুম্। একদিন খুব ভোরে উঠে আমরা একটা গরুর গাড়ি ভাড়া ক'রে জিনিসপত্র নিয়ে চললুম। পুরুষরা চলল পায়ে হেঁটে।

ওরা মনে করেছিল যে নদীটাকে সাত বারই অনায়াসে পার হ'য়ে যাওয়া যাবে, কিন্তু সেখানে গিযে দেখা গেল অতটা সহজ নয়। একবার পার হ'য়েই সকলে বসে পড়লো। যেমন দুর্গম পাহাড় তেমনি গভীর অরণ্য, পথ নেই বললেই চলে। আমাদের গাড়ির গাড়োয়ান আর বেশি অগ্রসর হ'তে নিষেধ করলে, বললে যে ওখানে মাঝে মাঝে বুনো হাতীর দল বেরোয়, মানুষ দেখতে পেলে তারা আমাদের কারো চিহ্নটিও রাখবে না। এই শুনে দাদা তো ভয়েই অস্থির, বললে এখানে পিক্‌নিক্ ক'রে কাজ নেই, এখনই ফিরে চল। অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নদীর ধারে গাছতলায় খিচুড়ি রান্না ক'রে খেয়ে তারপরে বাড়ি ফিরলুম।

এই সব সমবেত অভিযানে আমাকে বরাবর খুব সাবধান থাকতে হয়েছিল। যিনি আমার সর্বাপেক্ষা নিকটতম তাঁর থেকে থাকতে হচ্ছিল সকলের চেয়ে দূরে। এতে আমারও খুব কষ্ট হচ্ছিল এবং জানতে পারছিলুম যে ওঁরও খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই, অভিনয়টা করতেই হবে, কারণ সর্বদা একটা শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে আমাদের সঙ্গে রয়েছে ঠাকুরপো। কাজেকাজেই তার সঙ্গে কিংবা দাদার

সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি চলি, অমর বাবুর কাছেও মোটে ঘেঁষি না। ওঁকেই আমার সব চেয়ে বেশি ভয়, কাছে গেলে ওঁর কোনো হুঁশ থাকে না, সকলের সুমুখে হয়তো অসাবধানে আমার হাতটাই ধরে ফেলবেন কিংবা ঝোঁকের মাথায় এমন একটা কিছু ক'রে বসবেন যার কোনো অর্থই থাকবে না। সেইজন্যেও আমি ওঁর কাছ থেকে সরে সরে থাকি। কিন্তু তবুও নিষ্কৃতি নেই, উনি মাঝে মাঝে অধৈর্য হ'য়ে আমাকে ডাকেন,—মীরা একটা কথা শুনে যাও। কাছে গেলে বলেন,—ওদের পেয়ে আমার কথা বুঝি আর মনেই পড়ছে না? তখন ওঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়।

পিক্‌নিক হ'যে যাবার ছুদিন পরে বিকেল বেলায় আমার কাজের অবসরে রান্নাঘরের পাশের আতা গাছটার তলায় খাটিয়া পেতে বসে রোদে চুল শুকোচ্ছি, আর অমর বাবুর জন্যে একটা মাফ্‌লার বুনছি। অনেক রকমের বিশ্রী আব-হাওয়ার মধ্যে ওঁকে যেতে হয়, তাই কথা দেওয়া ছিল যে চাকরিতে ফিরে যাবার আগে ওঁকে একটা মাফ্‌লার বুনে দেবো। অন্যমনস্ক হ'য়ে তাই বুনছি, হঠাৎ দেখি ঠাকুরপো কোথা থেকে এসে খাটিয়াটার ওপরে আমার গা ঘেঁষে বসলো। আমি কোনো কথা না ব'লে বুনেই যেতে লাগলুম। ও তখন বললে—

—কার জন্যে এত কষ্ট ক'রে বোনা হচ্ছে? শীত ফুরিয়ে গেল, এখন আবার ও জিনিসে কার দরকার?

—এটা করছি অমর বাবুর জন্যে। যুদ্ধের কাজে ওঁকে এমন জায়গায় যেতে হয় যেখানে গরমের সময়েও খুব ঠাণ্ডা, তাই আমি কথা দিয়েছিলুম যে ওঁর যাবার আগে একটা মাফ্‌লার বুনে দেবো। যদিও এখনো যাবার দেরি আছে, কিন্তু কখন সময় পাবো তার ঠিক নেই, তাই আগের থেকেই যতটা পারি বুনে রাখি।

—বাবা, এর জন্যে এত কৈফিয়ৎ? এটা আবার শিখলে কবে? আগে তো নিজের কাজের এত কৈফিয়ৎ দিতে না, জোর ক'রে বলতে—আমার খুশি। এখন দেখছি আমার কাছেও লুকোবার দরকার হচ্ছে, কৈফিয়ৎ দিয়ে ভুলিয়ে দেবার দরকার হচ্ছে, এ তো ভালো কথা নয়।

—আহা, কী আবার লুকোলুম তোমার কাছে? তোমাকে ভয় করি নাকি?

—এখানে এসে তাই তো দেখছি। যার জন্যে এত কাণ্ড করতে, এত ঝগড়া করতে, যে ছাড়া জগতে নাকি তোমার দ্বিতীয় আর কেউ নেই বলেছিলে, তার সঙ্গে এমন ছাড়া-ছাড়া ভাবের ব্যবহার করছো, নিতান্ত দরকার ছাড়া একটি কথাও বলছো না, সর্বদা যেন দূরে দূরে থাকো, এ যে বড়ো আশ্চর্যের কথা। আসল ব্যাপারটা কী বলতো?

—ব্যাপার আবার কী? তিন চার মাস একসঙ্গে বাস করতে করতে এখন অনেকটা পুরোনো হ'য়ে গেছে। দিন রাত আর কত কথাই বা বলবো, ওঁর সঙ্গে বলবার কথা এখন ফুরিয়ে গেছে।

—এরই মধ্যে সব ফুরিয়ে গেল, বঁড়শি-টঁড়শি গুটিয়ে নিয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত? তাহ'লে হয় তুমি মাছটা গেঁথে ফেলেছো, আর না হয় মাছটা নিতান্তই পালিয়েছে। সেই কথাই তো জানতে চাইছি, এর মধ্যে কোনটা সত্যি?

—আমি তোমার হেঁয়ালি বুঝতে পারি না বাপু, সোজা কথায় বলো কী বলছো।

—যারা মাছ ধরতে যায় তারা অনেক চার-টার ফেলে ছিপ নিয়ে সেখানে বসেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত মাছ না ওঠে। মাছ গেঁথে তুলতে পারলে তখন তারা ছিপ তুলে নেয়। আবার তা না হ'য়ে যদি দেখে যে কিছুতেই মাছ চারে আসছে না, কতক্ষণ আর আশা ক'রে বসে থাকবে, হতাশ হ'য়ে তখন অগত্যাও তারা ছিপটা গুটিয়ে নেয়। অতএব দুটোর মধ্যে একটা যাহোক হয়েছে। আমার কাছে বলতে কোনো দোষ নেই, বলো না মাছটা গেঁথেছ না হতাশ হ'য়ে ছেড়ে দিয়েছ?

—আমি অতশত জানি না, তোমার যা খুশি তাই মনে করতে পারো।

—বেশ বেশ, তাহ'লে গেঁথেছো বলো? কেমন লাগলো খেতে, নরম না ছিবড়ে?

—দেখ ঠাকুরপো, তুমি ভারী অসভ্য। একটু ভদ্র ভাষায় কথা বলতেও জানো না?

—পেট ভরলে সবাই ভদ্র হ'তে পারে, পেট না ভরলে একটু অভদ্র হ'তে হয় বৈকি। কিন্তু আমি খারাপ তো কিছু বলছি না, রীতিমত উপমা দিয়ে বলছি। ছোটো মাছ ধরলে খেয়ে সুখ নেই, তাতে অনেক কাঁটা থাকে। বড়ো মাছে কাঁটা নেই, খেতে খুব আরাম। কেমন, ঠিক কথা বলছি তো?

—যদি তাই মনে করো তবে তাই, আমি তোমার কোনো কথার জবাব দিতে চাই না।

—এই দেখ, তোমাকে অনেক রাগাবার চেষ্টা করলুম তবুও তুমি রাগলে না। এতেই যে আরো প্রমাণ হ'য়ে যাচ্ছে। ডেঁয়ে পিঁপ্‌ড়েগুলো কত জোরে কামড়ায় দেখেছ তো, গায়ে একেবারে জ্বালা ধরিয়ে দেয়? কিন্তু সেই পিঁপ্‌ড়ে যখন মিষ্টি খায় তখন আর মোটে কামড়াতেই পারে না। দেখ, আমি আজ-কালকার ছেলে, মিষ্টি খাওয়া যে দোষের এ কথা আমি কখনই বলবো না। জিব রয়েছে, দাঁত রয়েছে, ভালো মিষ্টি খাবার সুযোগ পেলে চুরি ক'রে অবশ্যই খাবে, সেটা সকলে না জানতে পারলেই হলো। কেবল আমি এইটুকু জানতে চাই যে ঐ দু-তিন ছেলের বাপের কাছে এমন কী অপূর্ব মৌভাণ্ডারের সন্ধান তুমি এখানে এসে পেলে যাতে পেট ভরিয়ে ঢেকুর তুলে এমন ভালোমানুষটি হ'য়ে বসলে? এইটুকু যদি তুমি বুঝিয়ে দিতে পারো তাহ'লে আমি তোমাকে কন্‌গ্রাচুলেট করতে রাজি আছি।

—মিথ্যে তুমি আমাকে রাগাবার চেষ্টা করছো, কিছুতেই আমি রাগবো না। তবে তোমার কথাটার জবাব আমি দিয়ে দিচ্ছি। সত্যি কথা শুনে যেন আবার দুঃখ পেও না। তুমিও যেমন অনেক উপমা দিয়ে বললে, আমিও তেমনি একটা উপমা দিয়ে বলি। হীরে আর কাচের মধ্যে দেখতে বিশেষ কিছু তফাৎ আছে কী? আজকাল আংটিতে পরবার জন্যে হীরের মতো নকল ক'রে এমন সব অদ্ভুত কাচের সৃষ্টি হচ্ছে, প্রথমে দেখলেই মনে হয় ঠিক যেন আসল হীরে।

কিন্তু তার পরে একটু ব্যবহার ক'রে দেখলেই বোঝা যায় দুইএর মধ্যে কত তফাৎ,—কেবল দামে তফাৎ নয়, জৌলুষেও কতখানি তফাৎ। চিনতে আর তখন ভুল হয় না। আমার হাতে দুটো জিনিস এসে পড়েছিল,— আর একটা হীরে। অনেক দেখেশুনে কাচটা ফেলে হীরেটাই নিলুম, আমি আংটি গড়াবো। নকল জিনিসের মতো তেমন বাইরের বাহার না থাকলেও খাঁটি জিনিসগুলোই আমি বেশি পছন্দ করি। তুমি হয়তো খুঁৎ বের ক'রে বলবে, ওটা দাগী হীরে। আমি বলবো তা হোক, ওটা [illegible] নয়,—ওটা হীরে, ওটা হীরে।

—কাকে তুমি হীরে বলো?

—যে নিজের সম্বন্ধে কখনো সচেতন হয় না, অথচ অন্ধকারে ফেলে রাখলেও আপনা থেকেই ঝক্‌ঝক্ করে, তাকেই বলি হীরে।

—তুমি তো বৌদি পাকা জহুরী নও, চিনতে তোমার ভুল হ'যে থাকতে পারে। একদিন হয়তো বুঝতে পারবে যে হীরেকেই তুমি কাচ বলেছ।

বুঝতে তখনই পারলুম যে কথাটা বড়ো রূঢ় হ'য়ে গেছে, ঠাকুরপো মনে ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু আমাকে অমন ক'রে রাগিয়ে দিলে আমি আর কী করতে পারি? সে কিছুক্ষণ সেই খাটিয়ার ওপরে চুপ ক'রে বসে রইল, তারপর আস্তে আস্তে উঠে গেল।

ইতিমধ্যে আগের থেকেই আমি লক্ষ্য করছিলুম যে ওপরকার বসত বাড়িটার সাম্‌নের দিকের বারান্দায় অমর বাবু অনবরত পায়চারি করছেন। তাঁর নিজের শোবার ঘরটার দরজা জানলা সমস্ত খোলা, সেই ফাঁক দিয়ে আতা-গাছতলা পর্যন্ত বেশ দেখা যায়। আমি দেখতে পাচ্ছিলুম উনি বারান্দার এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত কেবল যাচ্ছেন আর আসছেন। ঐ ফাঁক দিয়ে উনিও যে আমাদের লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

আর থাকতে পারলুম না, একটু পরেই বোনা ফেলে রেখে উঠে গেলুম ওঁর

কাছে। জিজ্ঞাসা করলুম,—এখানেই ঘোরাঘুরি করচেন, এখনও চা খেতে রান্নাবাড়ির দিকে কেন যাননি ?

—এখনও বোধ হয় সময় হয়নি। সময় হ'লে এখানেই চা দিয়ে যাবে।

—কেন, আজকাল তো আপনি ঐ দিকে গিয়েই সকলের সঙ্গে চা খান, তবে আবার এখানে কেন ? চলুন আপনাকে আজ আলাদা ক'রেই চা দিচ্ছি। কিন্তু এখানে নয়, ঐ আতা-গাছটার তলায় আমার বোনবার পশমগুলো ফেলে এসেছি, ওখানে গিয়ে খাটিয়ার ওপরে আপনি বসুনগে, আমি চা ক'রে নিয়ে যাচ্ছি।

চা নিয়ে গিয়ে দেখি মুখখানা গম্ভীর ক'রে উনি দাঁড়িয়ে আছেন, খাটিয়ার ওপরে বসবার কোনো অভিরুচি নেই। বসতে বলায় বললেন—না থাক। আমার হাত থেকে পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চা খেতে লাগলেন।

বোঝা গেল, বহ্নি ধূমায়মান হচ্ছে, ওকে এখনই নেবানো উচিত। হাসতে হাসতে তাই বললুম,—আবার আপনি সেই আগের মতো আমাকে সন্দেহ করচেন ?

—না,—কৈ—কেমন ক'রে তুমি জানলে ?

—সব দিকে আমার চোখ থাকে, সবই আমি বুঝতে পারি। কী আপনি দেখেছেন আর কী ভাবছেন সমস্তই খুলে বলুন দেখি, মনে মনে কিছু চেপে রাখবেন না।

—কিছু একটু দেখেছি বৈকি, নইলে কী—

—বলুন না, থামচেন কেন ? সব কথাই আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাবা বলতেন, বুঝিয়ে দিতে পারলে কোনো ভয়ও থাকে না আর সন্দেহও থাকে না। সে বারে আপনি কিছু না বুঝেই চাকরি নিয়ে চলে গেলেন। তা আর কখনো হ'তে দিচ্ছি না।

—আমি দেখলুম তোমরা খুব কাছাকাছি বসে দুজনেই উত্তেজিত হ'য়ে কথা বলাবলি করতে লাগলে, কথা বলতে বলতে একবার অন্যমনস্কে বোনবার

কাঁটাটা তোমার হাতে বিঁধে গেল তাও আমি লক্ষ্য করেছি, তারপরে আবার দু'জনেই ম্রিয়মান হ'য়ে চুপচাপ বসে রইলে। তুমি আর মুখ তুলে চাইলে না, কিন্তু সুরেনের চোখে দেখলুম একটা তীব্র ধরণের জ্বালা। এ সব কেন?

—সবই বলছি। আপনার কথা নিয়েই আমাদের আলোচনা হচ্ছিল। ঠাকুরপো আপনার চরিত্রের সঙ্গে ওর নিজের চরিত্রের তুলনা করছিল আমার কাছে, এত বড়ো ওর স্পর্ধা। আমার তাই রাগ হ'য়ে গেল, আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিয়েছি। আমি বললুম, ও হচ্ছে কাচ, আর আপনি হচ্ছেন হীরে,—হীরের সঙ্গে নাকি কাচের তুলনা? ওর মনে খুব ব্যথা লাগলো জানি, কিন্তু আমি তার কী করতে পারি বলুন?

—এ কথা উঠলো কেন? ও আমাকে হিংসে করে নাকি?

—একটু একটু করে বোধ হয়, খানিকটা বুঝতেও তো পারে। আর আমিও ওকে আগে কিছু কিছু বলেছি, আমার মনে যখন যা হয়েছে। আপনি যখন ছিলেন না তখন আমি মনের কথাগুলো চাপতে পারতুম না, ওর কাছেই সব বলতুম। তাইতেই হয়তো ওর মনে হিংসে হয়েছে। আজকের কথাটা ওই প্রথমে তুললে, তাই খানিকটা ঝগড়া হ'য়ে গেল।

—যাক্‌গে,—আমার মনটাই এমনি হ'য়ে গেছে, একটুতেই অস্থির হ'য়ে পড়ে। একটু কিছু দেখলেই মনে হয় আবার বুঝি কেউ কেড়ে নিতে এলো।

—ওতে কোনো দোষ হয়নি। ওতে বরং বোঝা গেল যে আমার জন্যে আপনার আগ্রহ এখনও তেমনি সমান রয়েছে। কিন্তু ঐ দুর্বলতাটুকু আপনি সারিয়ে ফেলুন, নইলে আপনাকে আমার বড়ো ভয় করে,—আবার কখন কী একটা ক'রে বসবেন। এবার আপনাকে হারিয়ে ফেললে আমি একেবারে ভিখিরির চেয়ে অধম হ'য়ে যাবো।

—তাই কী কখনো হয়?

—কিন্তু আপনি এখনও কেন আমাকে এমন ভুল বোঝেন বলুন তো? কখনো কী এই ভুলবোঝা আপনার ঘুচবে না?

—আজ থেকে সেটা জন্মের মতো ঘুচলো।

এতক্ষণে উনি সেই খাটিয়ার ওপরে বসলেন। মংরুকে ডেকে গরম লুচি ভাজিয়ে এনে ওঁকে খেতে দিলুম। উনি বললেন বটে যে আমার প্রতি অবিশ্বাস ওঁর জন্মের মতো ঘুচলো, কিন্তু আমি জানি যে ও কথা উনি সাময়িক বিশ্বাসের জোরেই বলচেন, আবার যদি কিছু দেখেন তখন আবার অবিশ্বাস করবেন। আমার ওপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'তে এখনো ওঁর দেরী আছে। যে মনের মধ্যে একবার সন্দেহের বিষ ঢুকেছে তাকে সম্পূর্ণ নির্বিষ করে আনতে অনেক সময় লাগে।

ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন, ওঁর কাছে আমার কোনো কথাই লুকোবার নেই, কিন্তু তবু একটি কথা আমি এখানে লুকিয়েছি। আমার প্রতি ঠাকুরপোর যে কেমন ধরণের মনোভাব, সে কথা আমি ওঁর কাছে বলিনি। বললে উনি সহ্য করতে পারতেন না, আবার হয়তো ভুল বুঝতেন। সে যে মাছ ধরার উপমা দিয়ে বিশ্রী কথাগুলো বলেছিল তাও ওঁকে বলা চলে না। যিনি উঁচু ধরণের মানুষ তাঁর কাছে নিচু ধরণের কথাগুলো একটু লুকোতেই হয়। ঐটুকু বাদ দেওয়াতে কোনো ক্ষতি হলো না, আপাতত সহজেই বিশ্বাস করিয়ে ওঁকে ঠাণ্ডা করা গেল। কিন্তু ঠাকুরপো হ'লে এত সহজে বিশ্বাস করানো যেতো না, সে সব কথাই খুঁজে খুঁজে বের করতো। মানুষের মধ্যে দেবতাও আছে, দানবও আছে। গোলাপের গাছে ফুলও আছে, কাঁটাও আছে। যারা দেবতা-প্রকৃতির লোক তারা গোলাপের ফুলটা দেখলেই খুশি হ'য়ে যায়, কাঁটার দিকে তাদের নজর যায় না। যারা দানব-প্রকৃতির লোক তাদের ফুলের চেয়ে কাঁটার দিকেই বেশি নজর। তেমনি তারা কাঁটার ঘাও খায় বিস্তর, আর সেইটেকেই তারা উপাদেয় মনে করে। যার যেমন রুচি তেমনিই তার কপালে জোটে।

এর পরে দুদিন না যেতেই ঠাকুরপো বললে, আর এখানে তার ভালো লাগছে না, রাত্রের ট্রেণেই সে কলকাতায় ফিরবে। আমার শ্বশুর শাশুড়ী অনেক ক'রে তাকে বারণ করলেন, বললেন যে এত শিগ্‌গির চলে যাবি কেন, আরো

কিছুদিন থেকে শরীরটা সারিয়ে নে। সে তাঁদের মুখের ওপরেই বললে,—এখানে একটা সিনেমা নেই, একটা কফি হাউস নেই, কী নিয়ে থাকবো? তোমাদের তো অমন অমর বাবু রয়েছে, আমাকে ধরে রাখবার কী দরকার, ওকে নিয়েই তোমরা থাকো। ঠাকুরপোর দেখাদেখি দাদাও অমনি সুটকেস গোছাতে শুরু করলে। আমি যখন বাধা দিতে গেলুম তখন মহা বিব্রত হ'য়ে বললে,—ওরে তুই আর কিছু বলিসনে, লক্ষীটি আমাকে যেতে দে। মা আর বেলা সেখানে কতদিন একা রয়েছে, কেউ তাদের দেখবার নেই। আমার তো জায়গাটা ভালোই লাগছিল, কিন্তু সুরেন চলে গেলে আমি কেমন ক'রে থাকি বল।

ওরা চলে যাবার পরে টাটানগরে বাজার করতে যাবার উপলক্ষে আবার একদিন রাখা-মাইনস্ গেলুম। ঐটিই ছিল আমাদের সব চেয়ে প্রিয় বেড়াবার স্থান। প্রায় মাসখানেক হলো সেই ক্যান্টিনের দিকে মোটে যাওয়াই হয়নি।

সেখানে গিয়ে যা শুনলুম সে খবরটা বড়ই নিদারুণ। আমাদের সেই আবদুল আর নেই, হঠাৎ সে মারা গেছে। ঐখানে থাকতে থাকতেই তার নিউ-মোনিয়া হয়েছিল। ক্যান্টিনের বাইবে কনট্রাক্টরদের বাসায় একটা অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে পড়ে ছিল, সাতদিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ ক'বে সে মরেছে, ভালো ক'বে তার কোনো চিকিৎসাও হয়নি। সে খাস মিলিটারির লোক ছিল না, কে তার চিকিৎসা করাবে? ক্যান্টিনে যারা তার জাতভাই ছিল তারাই যা একটু দেখাশোনা করেছে, কিন্তু তাদের নিজের নিজের চাকরি ছিল, রোগীর সেবা করবার ফুরসৎ কোথায়? আবদুল নাকি অনেকবার ওদের বলেছিল একজন ভালো ডাক্তার ডেকে আনতে, কিন্তু সেখানে ভালো ডাক্তার তারা কোথায় পাবে? অমর বাবু শুনে অনেক দুঃখ করতে লাগলেন, খবর পেলেই উনি দেখতেন, কিন্তু উনি যে ডাক্তার সে কথা তো আবদুলকে কখনো বলা হয়নি। কোনো পরিচয়ই সে জানতে চায়নি, আমরা যে কোথায় থাকি তাও সে জানতো না, কেমন ক'রে ওরা খবর দেবে? শোনা গেল যে মরবার সময় তার কাছে

কেউ ছিল না, একবিন্দু জলও কেউ মুখে দেয়নি। স্ত্রীপুত্র কোথায় রইল পড়ে, যাদের জন্যে উপার্জন করতে বিদেশে এসে বেচারা জীবনপাত করলে, মরবার সময় তাদের একবার চোখে দেখে যেতে পেলে না। ক্যান্টিনে আর আমাদের বসতে প্রবৃত্তি হলো না, চা খেয়েই অন্যত্র চলে গেলুম। আবদুল নেই, কে আমাদের তেমন যত্ন ক'রে বসাবে?

এর পর থেকে টাটানগরে বাজার করতে যাওয়া ছেড়ে দিলুম। মংরুকে পাঠিয়ে দিতুম বাজার করতে, আমরা গালুডিতেই স্বর্ণরেখা পার হ'য়ে মুসাবনির রাস্তা ধরে বেড়াতে যেতুম। তখনও বনে বনে বসন্তাগমের উন্মাদনা ফুরিয়ে যায়নি। মঞ্জরী-সুগন্ধে শালবনগুলো মাতোয়ারা। কত শতাব্দীর প্রাচীন বনানী সবুজ পত্রপল্লবে আবার একবার নবীন সেজে সারে সারে দাঁড়িয়ে গেছে। কত রংএর কত রকমের বনজ ফুলের বাহার, গাছগুলো যেন সাঁওতালি মেয়েদের মতো থোকা থোকা ফুলের রাশি মাথায় গুঁজে নিয়ে উদ্দাম আনন্দে দিগ্বিদিকে অহেতুক হাসির হিল্লোল ছড়িয়ে দিয়েছে। হলুদ ফুলের আর লাল ফুলের আর বেগুনি ফুলের মেলা দেখে ফিরে এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা নির্জন নদীর ধারটিতে বসতুম। সেখানে শরীরকে আনন্দে শিউরে দেবার মতো বাতাস বইতো, সেই বাতাসে মেতে উঠে স্বর্ণরেখা কলধ্বনির সুরে গান শুরু ক'রে দিত। উনি বলতেন,—সেই গানটা আমাকে শিখিয়ে দাও না, সেই ঝর্ণার ধারে যেটা গেয়েছিলে। আমি বলতুম,—সেটা এখন নয়, অন্য একটা শিখুন। ধীরে ধীরে গাইতুম—'তুমি আমায় যত শুনিয়েছিলে গান,. তার বদলে আমি চাইনে কোনো দান'—উনি আমার সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে যেতেন। তারপরে যখন খেয়াল হতো যে রাত্রি হয়েছে, তখন বাড়ি ফিরতুম। সঙ্গে থাকতো টর্চের আলো, রাত্রি অন্ধকার হলেও বাড়ি ফেরবার কোনো অসুবিধা ছিল না।

কিন্তু এটাও যে অন্যায় হচ্ছে তা আমরা মোটে বুঝতে পারিনি। আর ঠাকুরপো যে তার দাদাকে সাবধান হবার জন্যে আমাদের সম্বন্ধে কিছু বলে গেছে সে খবরও আমরা জানি না। আমরা মনে করতুম যে বেড়াতে যাবার

অনুমতি আমাদের দেওয়াই আছে, আর ঠিক সময়েই আমরা ফিরছি। এদিকে যে আমার স্বামীর মনে মনে দারুণ তাপ জমে উঠছে তা কেমন ক'রে জানবো? অকস্মাৎ সেটা জানা গেল।

সেদিন সকালে যখন অমর বাবু একা বেড়াতে চলে গেছেন, তখন আমার স্বামী বললেন,—বোসো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আমি ওঁর কাছে গিয়ে বসলুম।

—আজকাল তোমাদের বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে না কী?

—কিসের বাড়াবাড়ি?

—এই বেড়াতে যাবার। বিকেল থেকে অন্ধকার রাত্রি পর্যন্ত এই জঙ্গলের দেশে একা একা একজন পরপুরুষের সঙ্গে বেড়াও, তোমার লজ্জা করে না? খুব অন্ধকার না হ'য়ে গেলে কোনো দিনই ফেরা হয় না, এটা বুঝি সতীসাবিত্রীর লক্ষণ?

—অন্ধকার হ'লে আমরা টর্চ জ্বেলে আসি। আর তুমি তো বলেছিলে ওঁর সঙ্গে রোজ বেড়াতে যেতে।

—বেড়াতেই বলেছি, যা খুশি তাই করতে বলিনি। ওটা না হয় আমার মরবার পরেই কোরো, এখন ও-সব চলবে না।

—বেশ তো, যা বারণ করবে তা আর করবো না, মিটে গেল। কিন্তু এ-সব বিশ্রী কথা কেন বলছো?

—আমি একা বলছি না, তোমার নিজের ভাবের বন্ধু স্থরেনও আমাকে এই রকমের একটা কথা বলে গেছে। নিশ্চয় কিছু দেখেছে তবেই সে বলেছে, আর আমিও এখন তোমাদের অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি।

—যাক্ গে, আমি আর তোমার সঙ্গে কোনো তর্ক করতে চাই না। আজ থেকে তাই হবে, সামান্য একটু বেড়িয়ে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবো।

—তা নয়, আজ থেকে ওর সঙ্গে বেড়াতে আর যেতেই পাবে না।

—তা কী হয়, আমাকেই না হয় বারণ করলে, কিন্তু অমর বাবু যখন জিজ্ঞাসা

করবেন তখন তাঁকে কী জবাব দেবে ? তোমার ভালোর জন্যে তিনি নিজের ঘরসংসার ছেড়ে এখানে এসে পড়ে রয়েছেন, তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন যে তাঁকে তুমি এই রকম অবিশ্বাস করছো, তাহ'লে তিনি কী মনে করবেন ?

—মনে করলেন তো আমার বড়ো বয়েই গেল। বলে দিও যে তোমার শরীর খারাপ হয়েছে, বেড়াতে যেতে পারবে না।

—তা হয় না। একদিন দুদিন ঐ কথা বলে কাটানো যেতে পারে, কিন্তু সব দিন কাটানো যায় না।

—তবে আমিই বলে দেবো যে আমার এতে মত নেই।

—না, সে কথা তুমি কিছুতেই বলতে পাবে না। ও রকম ইতরের মতো ব্যবহার যদি করো তাহ'লে আমি এখানে আব থাকবোই না, এখনই কলকাতায় চলে যাবো, কেউ আমাকে ধরে রাখতে পারবে না।

—বেশ বেশ, সেখানেই চলো, আমিও তাই চাই। এখানে তোমাকে আর একদিনও থাকতে দিতে চাই না। সেখানে গেলেই তুমি জব্দ হবে। চল আমবা কালই কলকাতায় ফিরে যাবো।

—ভালোই তো। বাবাকে আর মাকে গিয়ে বলছি যে তোমার এখানে থাকতে আর ভালো লাগছে না, কালই তুমি কলকাতায় ফিরে যেতে চাইছ।

আপাতত হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। বাবা-মার জন্যে আমার একটুও ভাবনা নয়, ভাবনা কেবল অমর বাবুর জন্যে। ওঁকেই আমার সব চেয়ে বেশি ভয়। যদি উনি ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন হঠাৎ কলকাতায় ফিবে যাবার মতলবের প্রকৃত কারণটা কী, তাহ'লে মনে একটা আঘাত পেয়ে কী যে ক'রে বসবেন তার কিছুই ঠিক নেই। হয়তো ঝোঁকের মাথায় আমার হাত ধরে টানতে টানতে বলবেন, এখনই এই সংসার ছেড়ে চলে এসো,—নয়তো নিজেই হন্‌হন্‌ ক'রে বেরিয়ে চলে যাবেন, আর কখনো ফিরেও আসবেন না। অন্য কেউ না চিনলেও আমি ওঁকে বিলক্ষণ চিনি, সেইজন্যেই আমার ভয়। তাই আর কেউ বলবার আগে আমিই

বলে কয়ে ওঁকে প্রস্তুত ক'রে নিতে চাই। বেড়িয়ে ফিরবার মুখে বাড়িতে ঢোকবার আগেই ওঁকে ধরলুম।

—একটা কথা বলছি, শুনবেন? সবাই মিলে এবার কলকাতায় ফিরে যাই চলুন, এখানে থাকতে আর একটুও ভালো লাগছে না।

—কেন কেন, এখানে কী হলো, এমন চমৎকার জায়গা?

—তা হোক, রাখা-মাইনসএর আবদুল মরে যাবার পর থেকেই আমার মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেছে। মনে হচ্ছে এখানে থাকা আর উচিত নয়, থাকলে আমাদের বিপদ হবে। আর আমার সেই খোকাটার জন্যে ক'দিন থেকে বড়ো মন কেমন করচে। যে ঘরে সে থাকতো সেই ঘরে একবার ফিরে যেতে চাই। অনেক দিন দেখিনি।

—বেশ তো চলো, আমার তাতে আপত্তি কী? কিন্তু কথা হচ্ছে—

—কথা হচ্ছে, এখনও আপনার মাস খানেক ছুটি রয়েছে। সেটা কতক কলকাতাতেই কাটাবেন, কতক দেশে গিয়ে কাটাবেন।

—সে যা হয় করা যাবে, কিন্তু যোগেনের যদি মত না হয়?

—সেজন্যে কোনো ভাবনা নেই। ওঁর মত আগেই নেওয়া হয়েছে। কালই চলে যাবার ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে। এখানে এখন গরমও পড়ে গেছে, আর এখানে থেকে কোনো উপকার হবে না।

আবার আমাকে খানিক মিথ্যার আশ্রয় নিতে হলো। এর মধ্যে অবশ্য সবটাই মিথ্যা কথা নয়, অনেকখানি সত্যিও আছে। আবদুলের মৃত্যুতে মন খারাপ হয়েছে এ কথাও ঠিক, খোকার কথা মনে পড়েছে তাও ঠিক, আর প্রকারান্তরে যে আমার স্বামীর কলকাতায় যাবার মত হয়েছে সে কথাও ঠিক। তবু মিথ্যাকে মিথ্যাই বলতে হবে। গোপন প্রেমকে অটুট রাখতে হ'লে এ রকম মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, নইলে কোনো উপায় নেই। মীরাবাঈ তাঁর প্রেমকে বেশিদিন গোপন রাখতে পারেন নি, একদিন প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমাকেও যদি একদিন প্রকাশ করতে বাধ্য হ'তে হয়, তখন তাই করবো।

কিন্তু গোপন প্রেমেরই মাধুর্য বেশি, প্রকাশ হ'লে এর মাধুর্য অনেক কমে যায়। সেই জন্যেই একে যতদিন সম্ভব গোপন রাখবার চেষ্টা।

কলকাতায় ফিরে এসেই ওঁকে একবার দেশে পাঠিয়ে দিলুম। উনি যতবারই দেশে যান ততবারই আমার মনের ভিতরটা খচ্‌খচ্‌ করে, আগের চেয়ে এখন সেটা আরো বেশিবেশি করে। তবু পাঠাতে হলো এইজন্যে যে তাইতেই আমার সব দিক বজায় থেকে যাবে। কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসে আমার স্বামী রীতিমত অত্যাচার শুরু করলেন। জ্বর গায়েই উনি কোথায় বেবিয়ে চলে যান তার ঠিক নেই, ফিরে আসেন অনেক রাত্রে। কোনো কথাই আমার গ্রাহ্য কবেন না, কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন,—এতেই তুমি জব্দ হবে। দেখতে দেখতেই ওঁর জ্বর বেড়ে গেল, বাধ্য হ'য়ে আবার শয্যাগত হলেন। গালুডিতে থেকে যতটুকু উপকার হয়েছিল সমস্তই দুদিনে নষ্ট হ'য়ে গেল। উনি বললেন,—কেমন জব্দ, দিনরাত এবার আমাকে নিয়েই ভেবে মরতে হবে, ফূর্তি করবাব সময় পাবে না।

অমর বাবু যখন দেশ থেকে ফিরলেন তখন এই অবস্থা দেখে তৎক্ষণাৎ এক্‌স্-রে পরীক্ষা করালেন। তাতে জানা গেল যে দুই ফুস্‌ফুসেই এখন রোগেব স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। ডাক্তাররা বললে, ভিতরে ভিতরে এই রোগের প্রক্রিয়া কিছুকাল থেকেই চলেছিল, কেবল স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকাতে তার লক্ষণ বাইরে প্রকাশ পায়নি, কলকাতার আবহাওয়াতে এসেই প্রকাশ পেলে। এখন ওঁকে অবিলম্বে কোনো স্যানাটোরিয়মে পাঠানো উচিত।

অমর বাবু কলকাতায় থেকে নানা স্যানাটোরিয়মে স্থান সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেক দিনের পরে পেণ্ড্রা রোড থেকে টেলিগ্রাম এলো,—একটা ঘর খালি হয়েছে, অবিলম্বে রোগীকে নিয়ে এসো। কিন্তু অমর বাবুর তখন ছুটি ফুরিয়ে এসেছে। অতএব স্থির হলো যে আমি আর ঠাকুরপো যাবো আমার স্বামীর সঙ্গে, ঠাকুরপো আমাদের সেখানে রেখে কলকাতায় ফিরে আসবে। আমায় আপাতত সেখানে তাঁকে নিয়ে একাই থাকতে হবে।

বাড়ি থেকে যাত্রা করবার আগে আমি আমাদের পাশের ঘরটায় দরজা বন্ধ ক'রে কাপড় ছাড়ছিলুম, এমন সময় অমর বাবু দরজায় শব্দ ক'রে বললেন,—শিগ্‌গির একবার দরজাটা খোলো, অমার একটা জিনিস চাই। আমি ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করলুম—কী জিনিস? উনি বললেন,—খোলোনো, বলচি। আমি বললুম,—একটু দাঁড়ান, কাপড় ছাড়চি। উনি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলেন। আমার কিছু দেরী হ'তে লাগলো। একটু পরেই সেখানে ঠাকুরপো এসে আবার সেই দরজায় ধাক্কা দিতে শুরু করলে,—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো, ঐ ঘরে আমার দরকার আছে। এবার তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। উনি তখন সেখানে নেই। আমার কাছে উনি কী জিনিস চাইতে এসেছিলেন জানি না, বেরোবার তাড়ায় সে কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করবার আর সুযোগ হয়নি।

অমর বাবু স্টেশনে গিয়ে আমাদের ট্রেণে তুলে দিলেন। মংরু এবার ওঁর কাছে কলকাতাতেই রইল। সে এখন ওঁর ভারী নেওটা হয়েছে, আমার কাছেও তেমন ঘেঁষতে চায় না। ভেবেছিলুম ওকে আমাদের সঙ্গেই নিয়ে যাবো, কিন্তু আমি যখন থাকবো না তখন ওঁর দেখাশোনা কে করবে? সেই জন্যেই অগত্যা রেখে যেতে হলো।

অমরনাথের ডায়রি

মীরা বলে দিয়েছিল, ফুরসৎ পেলেই এবার যেন একটা ডায়রি লিখি।

ছুটির পরে চাকরিতে জয়েন ক'রেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেই আরাকান রাজ্যের মধ্যে এসে পড়েছি। যে সৈন্যদলের ডাক্তার নিযুক্ত হ'যে এসেছি তার মধ্যে অধিকাংশই পাঞ্জাবী মুসলমান আর গুর্খা। যেখানে আমাদের ছাউনি হয়েছে তার কিছু দূরেই একটা গ্রাম, বৌলিবাজার। রীতিমত বর্ষা পড়ে গেছে, তাই যুদ্ধ এখন এক রকম স্থগিত। বাংলাদেশের বর্ষার সঙ্গে এখানকার বর্ষার কোনো তুলনাই হয না। এখানকার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মাপ দুশো ইঞ্চিরও বেশি, বাংলাদেশের চার গুণ। দিবারাত্র বৃষ্টির বিরাম নেই, মাঠে ঘাটে চলতে গেলে গভীর পাঁকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ডুবে যায়। এখানে মানুষের চলাই কঠিন, যুদ্ধের কামান প্রভৃতি ভারী জিনিস টেনে নিয়ে আসা আরো কঠিন। মোটরগুলো এখানে চলতেই পারে না। অমন যে ডানপিটে মার্কা জীপ গাড়িগুলো, তাও মাঝে মাঝে পাঁকের মধ্যে ডুবে গিযে আর উঠতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য শক্তি ঐ খচ্চরগুলোর,—তারা অনায়াসে ভার নিয়ে সর্বত্রই চলে যেতে পারে। তবে শুধু ওদের সাহায্যে বর্তমান কালের যুদ্ধ রীতিমত ভাবে চলতে পারে না, কোনোমতে টহলদারীর কাজটাই চলে। উভয় পক্ষ থেকে এখন ঐটুকু কাজই চলছে,—মাঝে মাঝে টহলদারী করা, আর ঘাঁটি আগলে বসে থাকা। মাঝে মাঝে এক আধটা বোমার উৎপাত হয়। জাপানী বোমারুগুলো আমাদের ঘাঁটির কাছে দু একটা বোমা ফেলে দিযে পালিয়ে যায, তাতে বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় না। আমাদের পক্ষ থেকেও তাই করা হয়।

প্রচুর বর্ষা। কূলে কূলে ভরা নদী আর মাঠে মাঠে ভরা ধানগাছগুলো দেখলে মনে পড়ে যায় আমাদের বাংলা দেশের কথা। দূর থেকে দেখা যায়

চাষীরা কোথাও কোথাও চাষের কাজ করছে, বহু দূর গ্রামের মধ্যে সন্ধ্যার পরে কোথাও বা মিট্‌মিট্‌ ক'রে প্রদীপ জলছে। যুদ্ধ স্থগিত রয়েছে ব'লে গ্রামের মানুষ কোথাও কোথাও আপাতত দেখা যাচ্ছে, রীতিমত যুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেলেই হয়তো এরা গ্রাম ছেড়ে পালাবে। আমাদের সুমুখেই দাঁড়িয়ে আছে দুর্ভেদ্য মায়ু পর্বতমালা, পাঁচটি বিভিন্ন স্তবে থাকে থাকে সাজানো। এরই মাঝে মাঝে এক একটা পার্বত্য নদী পাহাড়ের সমস্ত জলধারা সঞ্চয় ক'রে নিয়ে সাগরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই সব নদীকে বলে চাওং। এমনি চাওং এখানে অসংখ্য আছে। তার মধ্যে খরস্রোতা কালাদান খ্যাতনামা, দেখতেও অতি চমৎকার। নদীগুলোকে দেখতে চিরকালই আমার ভালো লাগে। ছেলেবেলায় প্রথমেই দেখেছি সেই সোন নদী, তারপরে দেশের পার্বতী নদী, গালুডির সেই সুবর্ণরেখা, আর এখানকার এই কালাদান। অদ্ভুত ওর ছুটে চলার উন্মত্ত ভঙ্গী। রাশি রাশি তারল্য নিয়ে অনবরতই ছুটে চলেছে, একবারও থেমে দাঁড়াবে না, শেষ পর্যন্ত সেই সাগর গিয়ে তবে থামবে।

মায়ু পর্বতশ্রেণীর সব পিছনের পাহাড়টার নাম আরাকান ইওমা। ঐটে সকলের চেয়ে বেশি দুর্গম, উচ্চতা প্রায় তেরো হাজার ফীট। এই দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়ের এপারে রয়েছি আমরা, আর ওপারে রয়েছে আমাদের পরম শত্রু জাপানীরা। এক দল অন্য দলকে মারবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে বসে আছে, পাহাড়ের ব্যবধানটুকু না থাকলে এতক্ষণে একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'য়ে যেতো। মানুষ যখন মানুষকে মারতে শুরু করে তখন কতখানিই সে মারতে পারে!

অথচ মানুষ যখন মানুষকে দিতে শুরু করে তখন কতখানিই সে দিতে পারে। তার সাক্ষী ঐ মীরা। মীরার কথা ভাবলেই আমি আশ্চর্য হ'য়ে যাই। ও যেন কেবল দিতেই এসেছে, নিতে কিছু না। অনবরতই ওর দেওয়া চলেছে, আমি যে দয়া ক'রে নিচ্ছি এইটুকুই যেন যথেষ্ট। একদিন যদি দেওয়া ফুরিয়ে যায় তখন ও কি করবে? সে ভয় ওর নেই, কারণ ও জানে, তা কখনো ফুরোবে না।

বরং আমি যদি কখনো নিতে অপারগ হই, এই ওর সদা সর্বদা ভয়। যদি কখনো দেখে যে আমার নেবার আগ্রহ কিছুমাত্র কমেছে, অমনি দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়। তাই ও আমার কাছে অনেক গোলমেলে ধরণের কথা লুকিয়ে রাখে—পাছে সেগুলো শুনলে আমার কোনো বিতৃষ্ণা কিংবা বিরাগ আসে, পাছে ওর দেবার পথ বন্ধ হ'য়ে যায়। আমি জানি সে কথা। মীরার প্রেম যে কত গভীর তা ওর এই নিত্য হারাই-হারাই ভয়টা দেখলেই আমি বুঝতে পারি। আগে ভাবতাম মেয়েমানুষের মন, কতটুকুই বা ওর সম্বল। কিন্তু এখন অবাক হ'য়ে গেছি। মীরা যেন ঠিক ওর চায়ে ভরা পেয়ালার মতো, বেশি চিনিটা তলায় থিতিয়ে ছিল, গোড়ার চেয়ে শেষের দিকে যত যাচ্ছি ততই দেখি বেশি মিষ্টি।

আমি ভাবি, কেমন ক'রে এটা সম্ভবপর হোলো? কোথাকার এক নগন্য গোবিন্দপুর গ্রাম, আর কত দূরে সেই বিশাল দৈত্যপুরীর মতো কলকাতা শহর। কেমন ক'রে গোবিন্দপুরের এক চৌধুরীপুত্র সেই দৈত্যপুরীর রাজকন্যের সন্ধান পেলে, কেমন ক'রে তাকে এমন অসাধারণ রকমের জাগরণে জাগিয়ে দিলে? শুনলেও এ কি কেউ বিশ্বাস করবে? ছেলেবেলায় গল্প শুনেছি, রাজকন্যে ঘুমিয়েছিল সোনার পালঙ্কে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এক ভয়ঙ্কর দৈত্যপুরীতে,—ঘরছাড়া রাজপুত্র কিন্তু ঠিক সেখানেই গিয়ে পৌঁছলো, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তার আজন্মের ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে, তারপরে অনেক বীরত্ব দেখিয়ে রাজকন্যেকে নিয়ে গেল তার দেশে, তখন সে ফিরে পেলো তার রাজ্য, রাজকন্যে হোলো তার পাটরানী। শুনতে খুবই ভালো লাগতো, কিন্তু শুনে তখনই মনে করতাম, একটা গল্পই শুনলাম। সেই পুরোনো গল্পকেই যদি আজ আমি সত্যি বলি, তা কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে? আজকের এই চরম গাম্ভীর্যের দিনে যখন কাব্য অচল, কাহিনী অচল, বাজে কথা অচল, মানুষের সঙ্গে মানুষের আর জাতির সঙ্গে জাতির এক যুদ্ধসম্পর্ক-ছাড়া অন্য কোনো রকমের সম্পর্কই যখন অচল,—তখন এই মহা বিপর্যয়ের মধ্যে সেই পুরাকালের ছেলে-ভোলানো রূপকথাটি হঠাৎ সত্যি হ'য়ে উঠলো,—কোনো নীতি-নিষেধ না মেনে

আর সম্ভব-অসম্ভবের পরোয়া না রেখে কাঁটাবনের সহজাত ফুলগুলোর মতো বিনা দ্বিধায় ফুটে উঠলো, এ কি কেউ বিশ্বাস করবে? তা জানি না, কিন্তু তবু আজকের দিনেও আমার কাছে এই কথাই সব চেয়ে সত্যি হ'য়ে দাঁড়ালো। আমার মতো হয়তো আরো অনেকের কাছে এটা এমনিই সত্যি হ'য়ে দাঁড়ায়, কিন্তু সে কথা কেউ বলে না, এ সব কেবল গল্পেই শোনা যায়। মানব হৃদয়ের এই যে চিরন্তনের সত্যিকার জিনিস প্রেম, একি চিরকাল কেবল রূপকথা আর নাটক নভেল লেখবার প্রয়োজনেই লাগবে, জগতের আর কোনো বৃহত্তর প্রয়োজনে কখনো লাগবে না?

একটা কথা মনে হ'লে আমার ভারী হাসি পায়। মীরা ভাবে আমি নিতান্ত দুগ্ধপোষ্য নাবালক শিশু। যোগেনকে নিয়ে যখন ট্রেণে উঠেছে তখনও আমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছে। কি কি জিনিস খাওয়া উচিত আর কি কি খাওয়া উচিত নয়, কি কি কাজ আমার করা উচিত আর কি কি করা উচিত নয়, পাছে আমি সে সব ভুলে যাই তাই আগের থেকে একটা খাতায় নিজের হাতে লিখে দিয়েছে। যেন ও চিরকালই আমার অভিভাবক ছিল, ওরই হাতে এত বড়োটা হ'য়ে উঠেছি। অবশ্য ওর বাহাদুরি আছে সন্দেহ নেই। এখানে আসবার আগে ওজন নিয়ে দেখেছি আগেকার চেয়ে দশ পাউণ্ড বেড়ে গেছি। মেয়েদের প্রেমও এক রকমের পরিচর্যা। ওতে আমাদের মতো কোনো উদ্দামতা নেই, সমস্তই নিবেদিত হয়—কিন্তু অতি ধীরে এবং নিঃশব্দে।

মনে পড়ে অনেক কাল আগে এক মহাপুরুষেব কথা পড়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন—আগে খুঁজে দেখ তুমি কে? অনেক খুঁজে এ প্রশ্নের জবাব তখন পাইনি, এখন পেয়েছি। নিজেকে দেখবার জন্যে একটা আয়না চাই, সেই আয়নাটি আমার ছিল না। মীরার কাছে গেলেই এখন আমি নিজের প্রতিবিম্ব অনায়াসে দেখতে পাই। মীরা আমাকে ভালোবাসে, তাই আমি এখন নিজেকে ভালোবাসি, আমার বিধাতাকে ভালোবাসি।...

এখানে আমার প্রচুর অবসর। তেমন যুদ্ধও এখন নেই, তেমন কিছু কাজও

আমার নেই। যেটুকু কাজ থাকে তা শীঘ্রই ফুরিয়ে যায়, বাকি সময়টা কুঁড়েমি ক'রে কাটাই। সৈন্যদলের বুড়ো বুড়ো সুবেদার ভারী চমৎকার গল্প বলতে পারে, তাদেব কাছে বসে আগেকার যুদ্ধের গল্প শুনি। এদেব সঙ্গে মিশতে আমার খুব ভালো লাগে। ছেলেবেলাকার ছটু্ব কাছে কুমার সিংহের বীরত্বের কাহিনী যেমন তন্ময হ'য়ে শুনতাম, এখন এদের কাছে বসে তেমনি তন্ময হ'য়ে এদের গল্প শুনি, আমার নিঃসঙ্গতা দূর হ'যে যায়। এদের মধ্যে এমনও অনেক আছে যারা গত মহাযুদ্ধে লড়েছে, আবাব এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লড়তে এসেছে। ওরা বলে, সেবারকার লড়াইএর সঙ্গে এবারকার লড়াইএর অনেক তফাৎ। তখনকার দিনেও সৈন্যদের গাযেব জোরের একটা দাম ছিল্। যুদ্ধেব হাতিযারগুলো ছিল সকলের দিকেই প্রায সমান সমান, যাদের গায়ে বেশি জোর তাবাই জিততো। এখন হযেছে নিছক যন্ত্রেরই যুদ্ধ, গায়ের জোবের আর তেমন মর্যাদা নেই। কামানগুলো যারা ছোড়ে তাবা যেন মেশিনের মতো কাজ করে। গোলা যে কতদূরে গিয়ে পড়লো, কাব গায়ে লাগলো, সে খবর তাবা কিছুই জানে না। প্রত্যেক কামানের গোলা ছোটবার দূরত্ব কতখানি সেটা জানা থাকে সৈন্যাধ্যক্ষদের, তারা পিছন থেকে অঙ্কের হিসেব অনুযায়ী যেমন হুকুম দেয, এরা শুধু সেই অনুযায়ী হুকুম পালন ক'বে যায়। বন্দুক-বেযোনেটওযালা পদাতিক সৈন্যদের তেমন মর্যাদা আর নেই, যেমন আছে যান্ত্রিক সৈন্যদেব। কিন্তু তবু সেই পদাতিক সৈন্য না হ'লে এখনও যুদ্ধজয়ের মীমাংসা হয় না, যন্ত্রের যুদ্ধ শেষ হবার পরে এবাই অগ্রসর হ'য়ে গিযে আগেকার মতো বেয়োনেট চার্জ ক'রে অবশিষ্ট শত্রুসৈন্যদের মেরে ভূমি দখল করে, তখনই যুদ্ধেব চরম মীমাংসা হয। আগেকার দিনে যেমন হাতাহাতি লড়াই চলতো, এখনও শেষ পর্যন্ত তারই প্রয়োজন হয়।

যখন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়তে থাকে তখন গল্প করবার লোক কাউকে পাই না। তখন কেবল নভেল পড়তে থাকি, কিংবা নিজের ক্যাম্পটির মধ্যে একা একা বসে গুণ্ গুণ্ ক'রে গাইতে থাকি মীরার শেখানো গান,—'তোমার গান যে

কত শুনিয়েছিলে মোরে, সেই কথাটি তুমি ভুলবে কেমন ক'রে, ওগো সেই কথাটি'—। গাইতে গাইতে আমি হেসে উঠি, হঠাৎ ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীর কথা মনে পড়ে যায়। সে যেমন যখনতখন যা-তা গান গাইতো, আজ আমিও তাই করছি। মনে পড়ে যায় ক্যাপ্টেন দাদার কথা, আমার কাকার কথা। তাঁরা বলতেন, পৃথিবীতে সবই সহজ, সবই ভালো।…

মীরা এখন রয়েছে পেণ্ড্রা রোড স্যানাটোরিয়মে যোগেনের তত্ত্বাবধান করতে। সে বেচারা আর বেশিদিন বাঁচবে না। দুটো ফুস্‌ফুস্‌ই ধরেছে, আর তার কোনো রক্ষা নেই। হয়তো অল্পদিনের মধ্যেই—

মীরা এখনও আমার আছে, তখনও আমারই থাকবে। আমার জীবনের সব চেয়ে সত্যিকার কথা মীরা, সকল সময়ের জন্যেই সে আমার সব চেয়ে বেশি আপন। কিন্তু যতক্ষণ যোগেন বেঁচে আছে ততক্ষণ এ কথা আমার প্রকাশ্যে বলবার উপায় নেই, বললেই লোকে বলবে পরস্ত্রী-বিলাস। সে যে আমার কাছে পরস্ত্রী নয়, এ কথা কাউকেই বোঝানো যাবে না। লোকের দোষ দিই কেন, আমাদের সকলের মনই এমনি ভাবে তৈরী। পুরুষ পুরুষানুক্রমে আমাদের মনের মধ্যে জড় নিয়ে রয়েছে যত ভুল-বোঝার বীজ, কোনো স্বাভাবিক ঘটনাকেই আমরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখতে পারি না।

কিন্তু যোগেন যখন থাকবে না? তখন এ কথা প্রকাশ্যে জানাবার কোনো প্রয়োজন আছে কি? ওর শ্বশুর শাশুড়ীর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, শোক পাবার পরে তাঁরাও বেশিদিন বাঁচবেন না। তখন মীরার ব্যবস্থা কি হবে? সুরেন ছোঁড়াটা হবে ওর অভিভাবক? অসম্ভব। মীরা একাই থাকবে স্বাধীনভাবে, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দেবো। ওকে যে বিয়ে ক'রে নিজের কাছে রাখবো, তারও কোনো দরকার নেই। এ সম্বন্ধে মীরার সঙ্গে আমার কথা হ'য়ে গেছে। তারও এতে মত নেই, আমারও না। আমাদের মধ্যে যে আন্তরিক যোগ আছে তাকে একটা সামাজিক ছাপমারা সার্টিফিকেট দিয়ে আইনদুরস্ত ক'রে নিলেই বিশেষ কোনো বাহাদুরি দেখানো হবে না। প্রাপ্তিকে স্থায়িত্বের শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার যে

কতখানি মূল্য আছে তা আমি বেশ বুঝে নিয়েছি। প্রাপ্তিটা কিছু অপূর্ণ অবস্থায় রাখলেই বরং তার একটা আস্বাদ থাকে, সেটা চূড়ান্ত রকমে সম্পূর্ণ ক'রে নিলে তার অপূর্ব আস্বাদটা লুপ্ত হ'য়ে যায়। পরশমণি সহজপ্রাপ্য হ'লেও তাকে আটপৌরের মতো ব্যবহার করা ঠিক নয়। তাতে একটা তাচ্ছিল্য আসতে পারে।

মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, এখন মনে হচ্ছে সে কতই সহজ কথা। বিরাট কিছুই নয়, মহৎ কিছুই নয়, এর জন্যে কোনো অসাধারণ রকমের যোগ্যতার প্রয়োজন নেই, সামান্য লোকের পক্ষেও এবং সকল লোকের পক্ষেই সম্ভব। শুধু সম্ভব নয়, একটু সুযোগ পেলেই থাকে। অথচ আগে এইটুকুর অভাবেই আমি জীবনে কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাইনি, আকাশে বাতাসে কোনো আনন্দ খুঁজে পাইনি। এখন বুঝতে পারছি ওরই অভাবে আমার অন্তরে ছিল বুভুক্ষা, আর তারই জন্যে আমার চোখের দৃষ্টি ছিল আবিল। পেটের ক্ষুধার জন্যে চাই খাদ্য, মনের ক্ষুধার জন্যে চাই প্রেম। এই দুটি আমাদের নিতান্তই চাই,—নইলে কতটুকুই বা আমাদের শক্তি? একদিন মাত্র উপবাস করলে আমরা দুর্বল হ'য়ে পড়ি, একটু মাত্র আঘাত লাগলে আমরা অস্থির হ'য়ে যাই, সামান্য কিছু অসুখ করলেই একেবারে কাতরানি ছাডতে থাকি। এমনিই আমরা মানুষ, নিক্তির ওজনে যতক্ষণ সব ঠিক ঠিক বজায় আছে ততক্ষণই আমরা মস্ত শক্তিমান, একটু ব্যতিক্রম হ'য়ে গেলেই আর কোনো পদার্থ নেই। অনেক মহৎ ব্যক্তিকেও আমি দেখেছি, অনেক মহাপুরুষকেও দেখেছি। সামান্য একটু পেট ব্যথা করলে তখন মহৎ ব্যক্তিরও মহত্ত্ব ঘুচে যায়, খেতে না পেলে মহাপুরুষেরাও ক্ষিপ্তের মতো আচরণ করে, সত্যিকার অভাবে পড়লে অতি উদার চরিত্রের মহাত্মাও অনুদার হ'য়ে ওঠে। এতে কোনো দোষের কথা নেই, এমনিই অসহায় আমরা মানুষজাতি,—কিন্তু আবার মানুষের হাতেই রয়েছে তাদের সকল কষ্টের প্রতিকার। তাই বলছি, মানুষকে যদি সহজ করতে চাও তাহ'লে আগে তার ক্ষুধাগুলো মিটিয়ে দাও, আগে তার অভাবগুলো ঘুচিয়ে দাও। তখন দেখবে সে

আপনিই কত মহৎ, আপনিই কত সুন্দর। বিধাতা এই পৃথিবীকেও যেমন সুন্দর গড়েছে, মানুষকেও তেমনি সুন্দর গড়েছে। বহুকালের পুরোনো হ'য়ে গেছে, তবু এখনো এই ধরিত্রীর বুকে আরো কত ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা, মানুষের বুকে আরো কত আনন্দের সম্ভাবনা। এ কি কখনো নিঃস্ব হ'য়ে যেতে পারে?

বস্তুত সহজ এবং সুন্দর এই পৃথিবী আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে, আর ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। সূর্য তেমনি ভাবেই আলো দিতে থাকবে, ধরিত্রী তেমনি ভাবেই ঋতুতে ঋতুতে শস্য উৎপাদন করবে, ফুলে ফলে পরিব্যাপ্ত বনস্পতি তেমনি ভাবেই মধুক্ষরণ করবে, নদী তেমনি ভাবেই জলদান করবে, বায়ু তেমনি ভাবেই সঞ্জীবনীবাষ্প বিতরণ করবে। এখানে থাকতে আমাদের কোনো ভয় নেই, নিজেদের অভাববোধকে ঘোচাতে পারি না ব'লে মিথ্যাই আমরা সর্বনাশের আশঙ্কা করি। অল্প একটু খাদ্যেই আমাদের ক্ষুধা মিটে যায়, অল্প একটু প্রেমেই অভাব ঘোচে। অথচ যেখানে মাটির বুকে রয়েছে সহজাত খাদ্য, মানুষের বুকে রয়েছে স্বাভাবিক প্রেম, প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে কল্যাণ আর অদৃশ্যলোকে রয়েছে করুণা, সেখানে আমরা জগতের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান প্রাণীরা সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত থেকে ভাবছি পৃথিবীতে বুঝি মহাপ্রলয়ের দিন এসেছে। অভাব মেটাবার অতি সহজ পথটা ছেড়ে দিয়ে অনবরতই বাঁকা পথে ঘুরি, বর্তমানকে ছেড়ে ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্যে নানারকম আয়োজনে আমাদের সঞ্চয়ের ঝুলি ভরে ওঠে, কিন্তু উপস্থিত অভাবটা কিছুতেই আর মেটে না। আমরা বিজ্ঞান জানি, চিকিৎসা জানি, আরাম এবং আরোগ্যের সমস্ত উপায় জানি, কিন্তু কেবল সুখে থাকবার সোজা কথাটাই জানি না।

এখানে কিছুদিন আগে ভারী একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেছে। আমরা তার নাম দিয়েছি—দি নৌলিবাজার ট্রাজেডি। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করতে খচ্চর দিয়ে কামান বহন ক'রে নিয়ে যেতে হয়। যে সব সৈনিকদের ওপরে এই কাজের ভার থাকে তাদের বলা হয় মাউণ্টেন গানার্স। ঐ দলের একজন মুসলমান সিপাহীকে একটা দুরন্ত খচ্চর এমন এক প্রচণ্ড লাথি মেরেছিল যে তার

আঘাতে ওর কয়েকটা দাঁত ভেঙে যায়, আর মুখখানা বেঁকে গিয়ে দেখতে অতি কদাকার হ'য়ে যায়। এ হোলো অনেকদিন আগেকার কথা। লোকটা ছিল অবিবাহিত, দেশে গিয়ে সে অনেকবার বিয়ে করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ঐ বিকৃত মুখের জন্যে কোনো মেয়েই তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। মনের দুঃখে সে চাকরিতে ফিরে আসে, আর কখনো ছুটি নিয়ে দেশে যেতে চায় না।

সম্প্রতি ঐ বৌলিবাজারে তার একটি প্রণয়িনী জুটে গেল। মেয়েটি স্থানীয় চাটগেঁয়ে মুসলমানী, বর্তমানে বিধবা, আগের পক্ষের দুটি ছেলে আছে। ঐ মেয়েটির তার ওপরে কেমন নজর লেগে গেল, সে ওকে বিয়ে করতে রাজি হোলো। সিপাহী বড়ই ব্যগ্র হ'য়ে আমাদের সকলের সুপারিশ ধরে অফিসার-কমাণ্ডিংএর অনুমতি প্রার্থনা করলে, কারণ তাঁর অনুমতি ভিন্ন সে বিয়ে করতে পারে না। তিনি ওকে বিয়ে করতে অনুমতি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বকশিশও দিলেন। তিনি বললেন, সৈনিকদের তিনি পিতৃস্থানীয়, সুতরাং এটা তাঁব কর্তব্যের মধ্যে। সে মহা খুশি হ'যে বিয়ে কবতে গেল, আমাদের কিছু মিষ্টান্ন এনেও খাইয়ে দিলে।

কিছুদিন পরে বিশেষ কোনো কারণে ওখান থেকে ছাউনি তুলে আমাদেব অন্যত্র যাবার প্রয়োজন ঘটলো। তখন ঐ সিপাহীর হোলো মহা বিপদ। সে তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে ছেড়ে কিছুতেই যেতে পারে না, স্ত্রীকে সঙ্গে নেবার জন্যে সে অফিসার-কম্যাণ্ডিংএর বিশেষ অনুমতি প্রার্থনা করলে। তিনি বললেন, —স্ত্রীকে যদি খুব সাবধানে একটু আলাদা রাখতে পারো তাহ'লে তাতেও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ছেলে দুটিকে সঙ্গে নিতে পাবে না, কারণ ওটি একেবারেই আইনবিরুদ্ধ। ছেলে দুটিকে অবশ্য গ্রামে কারো জিম্মায় রেখে যাওয়া চলতো, কিন্তু ওর স্ত্রী তাতে কিছুতেই রাজি নয়। অগত্যা শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে ফেলে রেখেই ওকে চলে আসতে হোলো।

সিপাহী এখন প্রায়ই আমার কাছে ব্যাখ্যা করে যে স্ত্রীলোকের প্রেমের কোনো দাম নেই। প্রিয়জনের চেয়ে ছেলে দুটো তার কাছে বড়ো হোলো, তাদের ছেড়ে

সে চলে আসতে পারলে না! আজ না হয় ছেলেরা ছোটো আছে, কিন্তু পরে যখন তারা বড়ো হ'য়ে আপন আপন পথ দেখবে, তখন ওর কে থাকবে? এ-কথা সে একবারও ভেবে দেখলে না! আমি সেই সিপাহীকে আশ্বাস দিয়ে বলি,—স্ত্রীলোকের কাছে মাতৃস্নেহই সব চেয়ে বড়ো জিনিস, এটাই তো স্বাভাবিক। তুমি যখন আইন অনুসারে তাকে বিয়ে করেছো তখন আর ভাবনা কি? যখন ছুটি পাবে তখন ফিরে গিয়ে আপন স্ত্রীকে আবার গ্রহণ করবে। ও বলে,—নাঃ, যার কাছে আমার চেয়ে ছেলে বড়ো হোলো তার কাছে আর ফিরে যাবো না।

ওর কথা শুনে আমার নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়। ছুটির সময়ের মধ্যে তিনবার দেশে গিয়েছিলাম। একবার প্রথমেই, একবার মাঝে, একবার এখানে আসবার আগে। যে ক'দিন ছিলাম, ছেলেমেয়েদের নিয়েই সারাক্ষণ কাটাতাম। চম্পকী ইতিমধ্যে একজন গুরু পাকড়েছে, দিনরাত সে কি সব জপতপ নিয়েই থাকে। শেষের বারে চলে আসবার সময় সে বললে,—এবারে চলে যাচ্ছো, আবার কতদিন বাদে ফিরবে?

—দু বছরও হ'তে পারে, তিন বছরও হ'তে পারে, বলা যায় না।

—হয়তো নাও ফিরতে পারো, কিন্তু আমাদের কি ব্যবস্থা ক'রে গেলে?

—কেন, মাসে মাসে নিয়মিত খরচের টাকা পেয়ে যাচ্ছো, আবার কি ব্যবস্থা? আজকালকার দিনে কেউ কারো ব্যবস্থা ক'রে দেয় না, সবাই নিজের নিজের ক'রে নেয়।

—আজকাল আর সব টাকা তো দাও না, যতটুকু দরকার তাই দাও। সে যাক্ গে, টাকা ছাড়া কি আর অন্য কোনো বিষয় নেই?

—নিশ্চয় আছে, তোমার কাছে আমি অনেক ঋণী। প্রথম জীবনে অনেক আনন্দ দিয়েছ, তা ছাড়া তোমার দ্বারাই আমার চোখ খুলে গেছে। এ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু এখনও কি আমার ঋণ শোধ হয়নি?

—একটা ঋণ অনেকদিন আগেই শোধ করেছো, সে আমি জানি।

—কোন ঋণের কথা তুমি বলছো ?

—ভুল-বোঝার ঋণ। কিন্তু ও ছাড়াও আরো কিছু নেই কি ?

—ক্রমে ক্রমে সবই শোধ হ'য়ে যাবে, কোনো চিন্তা নেই।

—আমি-নিজের কথা বলছিলাম না, নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই ক'রে নিয়েছি। আমি বলছিলাম ছেলেমেয়েদের কথা।

—তাও আমার মনে আছে।

ছেলেমেয়ে দুটি এখন বড়ো হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে আমার অনেক কর্তব্য রয়েছে। ছেলেটি এবার ফার্ষ্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছে, আসবার আগে তাকে কলকাতার কলেজ হোষ্টেলে ভর্তি ক'রে দিয়ে এসেছি, যেখানে আমিও আগে ছিলাম। মিশনারি কলেজ, সেখানে পড়াশোনা ভালোই হবে। ব্যাঙ্ক থেকে যাতে মাসে মাসে তার খরচের টাকা পায় সে ব্যবস্থাও ক'রে এসেছি। মেয়েটিও একটু বড়ো হয়েছে, এবারে ফিরে গিয়ে তার বিয়ের চেষ্টা করতে হবে। দু তিন বছরের মধ্যেই তার বিয়ে দিয়ে দেবো, তার পরে সে নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নেবে। ছেলেও নিজের ব্যবস্থা নিজেই ক'রে নেবে, সে কথা তাকে জানিয়ে এসেছি। যে বিষয়ে তার যতদিন ইচ্ছা ততদিন পর্যন্ত শিক্ষা করুক, ততদিন পর্যন্ত আমি খরচ চালিয়ে যাবো। উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্যন্তই আমার দায়িত্ব, তারপর আর কোনো দায়িত্ব নেই। ভবিষ্যতে আমিও তার কোনো প্রত্যাশা করি না, সেও যেন আমার প্রত্যাশা না করে। ছেলে চলুক তার নিজের রাস্তায়, আমি চলবো আমার নিজের রাস্তায়। ছেলেকে আগেকার বাপদের মতো কোনো বিষয়ে বাধ্য কিংবা অনুবর্তী করতে আমি চাইনা। সে যে আমার সন্তান এইজন্যেই আমার কাছে ঋণী থাকুক, এমন কথা আমার মনে হয় না। আমার ঔরসে সে জন্মেছে, এ একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। আমার সংকল্প অনুযায়ী বা আমার ইচ্ছা অনুসারে সে জন্মায় নি, সুতরাং যদিও আমার চেহারার সঙ্গে আর ধরণধারণের সঙ্গে তার অনেক মিল আছে, তবুও শুধু সেই কারণে তার ওপরে আমার কোনো

দাবিদাওয়া থাকতে পারে না। মানুষ হবার পরে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হ'য়ে থাক, আমার ওপরে সে নির্ভর করবে না, আমিও তার ওপরে নির্ভর করবো না। যারা নিজে দুর্বল তারাই নিতে চায় ছেলের কাছে তার জন্মগ্রহণের সুযোগ। যারা বর্তমানকে পায়নি তারাই নির্ভর করে ভবিষ্যতের ওপরে। যারা এ জন্মে অসার্থক তারাই পরজন্মের মুখ চেয়ে পরম শান্তির কল্পনা করতে থাকে।...

এখানে আমাদের যিনি অফিসার-কম্যাণ্ডিং আছেন তিনি বড়ো চমৎকার লোক। এমন জ্ঞানী আর উদার চরিত্রের ইউরোপীয় ভদ্রলোক আমি খুব কমই দেখেছি। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, ছ'ফুট লম্বা চেহারাটা এখনও ঋজু আর বলিষ্ঠ। মাথায় টাক আর কানের দুপাশে পাকা চুল, হাসিমুখে বাঁধানো দাঁতগুলি প্রায়ই ঝক্‌ঝক্ করে, সর্বদাই মুখে একটা ধূমায়িত চুরোট লাগানো থাকে। খুব ধীরে ধীরে কথা বলেন, কথা বলবার সময় মোটা সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে বারে বারে রুমাল দিয়ে মোছেন, কণ্ঠস্বরে একটা অনুনাসিক ধ্বনি শোনা যায়। চলবার সময় আস্তিন গোটানো রিষ্টওয়াচ-বাঁধা মোটা মোটা হাত দুখানা পেণ্ডুলামের মতো দুলিয়ে দুলিয়ে চলেন। সকলের সঙ্গেই বেশ ভালো ব্যবহার করেন, কিন্তু কি জানি কেন, আমার ওপরে অনুগ্রহটা আরো কিছু বেশি। খাদ্যের চালানের সঙ্গে টিনে সীল্ করা মাছ-টাছ এলেই তিনি সেটা আমার জন্যে পাঠিয়ে দেন, কারণ তিনি জানেন যে আমি বেকন হ্যাম্ প্রভৃতি জিনিসগুলো খাই না। আমাকে প্রায়ই ডেকে নিয়ে যান গল্প করতে। অবসরের সময় একবার আমার দেখা পেলে আর রক্ষা নেই, কথা বলতে বলতে টেনে নিয়ে যাবেন তাঁর নিজের ক্যাম্পের দরজা পর্যন্ত। তারপরেই বলবেন,—এখন খুব ব্যস্ত নও তো? আশা করি এমন কোনো মারাত্মক রোগী তোমার প্রত্যাশায় বসে নেই, যাকে মেরে নরহত্যার সংখ্যাটা বাড়িয়ে নেবার সম্ভাবনা আছে? আমি যেমন হাসতে হাসতে বলবো—না, অমনি তৎক্ষণাৎ বলবেন,—তবে এসো এসো ডাক্তার, আমার কুঁড়ে ঘরে একটু চা খাবে এসো, বসে বসে খানিকটা আড্ডা দেওয়া যাক। এমনি অমায়িকভাবে আমাকে

ডাকবেন যে না বলবার উপায় থাকবে না। এটা লক্ষ্য ক'রে দেখেছি যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে এমন ভাবে গল্প করতে ডাকেন না, আর কারো সঙ্গে তাঁর জমে না। গল্প ঠিক নয়, গল্প মানে কেবল তর্ক। এক একটা প্রসঙ্গ নিয়ে কথা উঠবে, তখন সে সম্বন্ধে নিজের অভিমত বলবেন, আমার অভিমত জানতে চাইবেন, আমার সঙ্গে মতে না মিললে ধীরভাবে তার প্রতিবাদ করবেন, আবার আমাকে তার জবাব দিতে বলবেন।

উনি বলেন,—তর্ক করাতে যত আনন্দ আছে, পরনিন্দাতেও এত নেই। পরনিন্দা কেবল এক-তরফা জিনিস, কিন্তু তর্ক চিরকালই দু'তরফা। সমানে সমানে লড়াই করাতে যে আমোদ, তর্কেও ঠিক তাই। এমন যদি কেউ তর্কের সঙ্গী পাওয়া যায় যে আমার চেয়ে ভিন্ন জাতের আর ভিন্ন আদর্শের, অথচ নিতান্ত গোঁড়ামি না ক'রে যুক্তি দেখিয়ে আমার কথা কাটাতে জানে, তাহ'লে তার সঙ্গে তর্ক কবার মতো মনের সুখ আর কিছুতে নেই।

আমি যদি বলি,—আপনার সঙ্গে অমুক বিষয় নিয়ে তর্ক করাটা আমার মোটেই উচিত নয়, এতে ভদ্রতার কোনো হানি না হ'লেও মিলিটরি আইন লঙ্ঘন করা হয়। উনি অমনি তৎক্ষণাৎ বলেন,—এখন তো সে সম্পর্ক নয়, এখন আমরা দুজনেই সমান সমান। কাজের সময় তুমি আমার হুকুম মানবে, কিন্তু এখন তোমাকে ছুটি দিয়েছি, প্যারেডের মধ্যে যেমন স্ট্যাণ্ড-অ্যাট-ঈজ্ দেওয়া হয় তেমনি। এখন আর আমি তোমার ও. সি. নই, এখন সমান দরের একজন বন্ধু। সুতরাং নির্ভয়ে কথা বলো, কোনো বিষয়ে কথা বলতেই তোমার বাধা নেই। তোমাদের দেশে অল্পদিন এসেছি, ভারতবর্ষের লোকের মনোভাব কিছুই জানিনা, তোমার কাছেই সেটা জানতে চাই। জগতে আজকাল যে সব ব্যাপার চলেছে সে সম্বন্ধে তোমরা কেমন ভাবছো সেটা আমার জানা দরকার।

আমি বলি,—সকলের মনোভাব কেমন ক'রে বলবো, নিজের কথাই শুধু বলতে পারি। আমি হয়তো আবার সকলের চেয়ে একটু স্বতন্ত্র।

উনি বলেন,—সে আরো ভালো কথা, কিছু স্বাতন্ত্র্য থাকলেই তর্কে আরো আমোদ হয়।

কালই আমাদের এক মহা তর্ক হ'য়ে গেছে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত। দিনের বেলায় যদিও কিছু কিছু কাজ থাকে কিন্তু সন্ধ্যার সময়টা আজকাল একেবারেই অবসর। বিকেল থেকেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নামলো, রাত্রি দশটার মধ্যে একবারও ছাড়লো না, আমরা দুজনে ততক্ষণ কেবল তর্কই করছিলাম। সময়টা বেশ কেটে গেল।

মীরা বলেছিল, আমার জীবনের সব কথাই সে শুনেছে, কিছুই আর বাকি নেই,—কিন্তু এখানকার কথাগুলোও তার জানা চাই, সেইজন্যেই সে বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছিল ডায়রি লিখতে। লেখবার মতো তেমন কোনো ঘটনা আপাতত দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের কালকের তর্কের কথাগুলো যতটা মনে আছে, তাই লিখে রাখি। সব কথাই মীরাকে জানিয়ে দিতে হবে, না জানালে আমারও স্বস্তি হবে না।

ক্যাম্পে বসে অফিসার-কম্যাণ্ডিং সবেমাত্র চাএর কাপটি নামিয়ে রেখে চুরোট ধরাচ্ছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে একটা প্রশ্ন জেগে উঠলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—এই যুদ্ধটা থেমে যাবার পরে পৃথিবীর কতটা উন্নতি হবে বলে তোমার মনে হয়?

—বিশেষ কিছুই হবে না, পৃথিবী যেমন ছিল তেমনি থাকবে।

—কেন, সবাই মিলে যখন এত চেষ্টা করছে তখন কিছু হবে না কেন? যুদ্ধের আগের থেকে সকল দেশেই বলাবলি চলছিল যে মানুষের মধ্যে সাম্যরক্ষার জন্যে একটা আমূল পরিবর্তনের দরকার, তারপর যুদ্ধের মধ্যেই তার প্রয়োজন আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, যুদ্ধের পরে যাতে সেটা সম্ভব হয় এখন থেকেই তার জন্যে বিরাট আয়োজন চলেছে। প্রত্যেক দেশের নেতারা একত্র হ'য়ে এখন থেকেই তার জন্যে ব্যবস্থা করছেন। রাশিয়ার স্ট্যালিন থেকে শুরু ক'রে আমেরিকায় রুজভেল্ট, ইংলণ্ডে চার্চিল, চীনে চিয়াংকাইশেক, তোমাদের দেশে

গান্ধী,—আজকাল সকলের মুখে একই রকমের কথা, দুর্বলকে মেরো না, তাকেও তোমার মতো বাঁচতে দাও। এই ইচ্ছেটা যখন মানুষের মনে জেগেছে, তখন আশা করা যায় যে এই যুদ্ধের পরে সকলের সম্মিলিত বাসনার খানিকটা ফল পাওয়া যাবে। অন্তত তোমরা যে নিশ্চয় পাবে তোমাদের স্বাধীনতা তাতে আর সন্দেহ নেই। তবে কেন বলছো যে কোনো উন্নতি হবে না ?

—আপনারা তখন আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে দেবেন, এই কথা বলছেন তো ? কিন্তু আপনারা দিলেই কি আমাদের পাওয়া সম্ভব হবে ? আমরা হয়তো মুখে বলবো পেয়েছি, কিন্তু কাজে কিছুই হবে না।

—তেমন মৌখিক স্বাধীনতার কথা বলছি না, সত্যিকার জিনিসের কথাই বলছি।

—তবে একটা গল্প বলি শুনুন। এবার কলকাতায় গিয়ে দেখলাম পাড়ার তেল-কলের একজন ধনী মালিক তার কলের মজুরদের জন্যে বিনামূল্যে চাল দেবার ব্যবস্থা করেছিল। চালের দর ক্রমে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, মজুরদের কিনে খেতে কষ্ট হচ্ছে, তারা অসন্তুষ্ট হ'য়ে কাজ করছে দেখে তাদের খুশি করবার জন্যে সে নিজেই চাল কিনে তাদের খেতে দেবার ব্যবস্থা করলে। তার কলে কাজ করতো প্রায় চারশো লোক। কলের একজন দারোয়ানের ওপরে ভার দেওয়া হোলো, সে যেন প্রত্যহ গুদাম থেকে নিজের হাতে ওদের চাল বণ্টন ক'রে দেয়। দারোয়ান লোকটি নিতান্ত খারাপ নয়, কাউকে বঞ্চিত করবার তার অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু সে ভাবলে, ওরা গরিব, ওদের অন্ন দেওয়া—এ হচ্ছে একটা অনুগ্রহ। সেই অনুগ্রহ বিতরণ করবার ভার যখন তারই ওপরে রয়েছে তখন সে নিজের খুশিমতোই তা করতে পারে। অতএব সে যাকে পছন্দ করে তাকে দেয় প্রয়োজনের বেশি, যাকে অপছন্দ করে তাকে দেয় কম, যে খোষামোদ করতে জানে সে পায় আগে, যে তা জানে না তাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। মালিকের কাছে মজুররা এই নিয়ে নালিশ করলে। মালিক তখন দারোয়ানের বদলে মজুরদেরই একজন সর্দারের

ওপরে এই ভার দিলে। কিছুদিন পরে দেখা গেল তাতে আরো গণ্ডগোল হচ্ছে, সর্দার নিজের দলের লোকদেরই বেশি ক'রে চাল দেয়, অপরদের মোটে দিতেই চায় না। মালিকের কাছে মজুররা আবার গিয়ে বললে,—হুজুর আপনি দিচ্ছেন বটে, কিন্তু আমরা তো পাই না। মালিক এক সর্দারকে বদলে অন্য সর্দারের হাতে ভার দিলে, তাতেও ঐ একই অবস্থা। তখন সে বিরক্ত হ'য়ে চাল দেওয়া ছেড়েই দিলে, বললে তোমরা নিজে নিজে কিনে খাও। তাতেও তারা অসন্তুষ্ট, কিনতে গেলে পয়সা লাগবে বেশি, আগে যদিও কোনো রকমে তাই করছিল কিন্তু এখন আর তা করতে মোটেই রাজি নয়। অসন্তুষ্টি তাদের কিছুতেই ঘুচলো না।

—তুমি তোমার এই উদাহরণটা দিয়ে যে কথা বলতে চাইছো জানি, কিন্তু সত্যিকার স্বাধীনতার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না।

—কাকে বলেন সত্যিকার? আপনাদের দেশ থেকে আমদানি করা সেই রাজনৈতিক কিংবা ভৌগোলিক স্বাধীনতা, তাকেই বলছেন সত্যিকার জিনিস? যে রোগী থাইসিসে মরতে বসেছে তাকে গালভরা নামওয়ালা কতকগুলো দামী দামী বিলিতি ওষুধ গিলিয়ে দিলেই কি কোনো লাভ হয়?

—তাহ'লে কি তুমি বলতে চাও যে তোমাদের স্বাধীনতার দরকার নেই?

—নিশ্চয়ই দরকার। সেই স্বাধীনতা আমাদের নিতান্তই দরকার যার সঙ্গে সঙ্গে আসবে আমাদের ভাতকাপড়ের অভাব মেটাবার স্বাধীনতা, রোগে ওষুধ পাবার স্বাধীনতা, নিজের কাজ নিজে করবার স্বাধীনতা, সহজ আনন্দে জীবন কাটাবার স্বাধীনতা, নিজেদের জাতি-চরিত্রকে স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী ফুটিয়ে তোলবার স্বাধীনতা। এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ আমরা অল্পেই সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকি, সামান্য ডালভাতের খোরাকে বেঁচে থাকি, খালিগায়ে দিন কাটিয়ে দিই, প্রাত্যহিক জীবনধারণের মধ্যেও উপরওয়ালা একজন বিধাতার সঙ্গে যোগ রাখবার চেষ্টা করি, মরবার সময়েও ভাবি তাঁরই কাছে ফিরে যাচ্ছি। আপনাদের দেশের মতো কথায় কথায় রিভোলিউশন করা আমাদের ধাতে সয় না, আর করলেও তা

টেঁকে না। আমরা না খেতে পেলেও বিদ্রোহ করতে ভালোবাসি না, ভগবানের দোহাই দিয়ে চুপচাপ মরে যাই। কিন্তু বাস্তবিক মরে যাওয়াটা কেউই পছন্দ করে না, আমরা তাই আগে চাই বাঁচতে। আগে আমরা বাঁচি, তখন বলতে পারবো আমাদের দেশের কি বলবার আছে। আমাদেরও কিছু বলবার আছে নিশ্চয়, কিন্তু পেটে ভাত না পড়লে কিছুই বলা যায় না। আগে আমাদের বাঁচতে দিন, তখন হয়তো দেখবেন, আপনাদের সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্যে আমরাই একটা নতুন রাস্তা দেখিয়ে দেবো।

—তোমাদেরও যে কিছু স্বতন্ত্র কথা বলবার আছে এতে আর সন্দেহ কি? তোমাদের সঙ্গে আমাদের আদর্শই একেবারে স্বতন্ত্র। তোমরা চেয়েছ জীবনকে তোমাদের মনের গড়া আনন্দ দিয়ে উপভোগ করতে, আমরা চেয়েছি জীবনকে আমাদের হাতের গড়া সম্পদ দিয়ে উপভোগ করতে। তোমাদের দেশে মহাপুরুষ জন্মালেন বুদ্ধ, চৈতন্য, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী,—এঁদের সকলের এক কথা। আমাদের দেশে জন্মালেন আলেকজান্দার, নেপোলিয়ন, গ্ল্যাডস্টোন, লেনিন, স্ট্যালিন,—এঁদের একেবারে অন্য কথা। যীসাস্ ক্রাইষ্টও ঠিক আমাদের দেশের নয়, বলতে গেলে তিনিও তোমাদেরই দেশের, জন্মেছিলেন তোমাদের কাছাকাছি আরবের এক প্রান্তে। আজকাল অবশ্য আমাদের পাশ্চাত্ত্য আদর্শেই পৃথিবী চলছে, অর্থসম্পদকেই সবাই বড়ো মনে করছে, তাই এই জগৎজোড়া মহাযুদ্ধ বেধে উঠেছে,—আর তোমরাও এতে যোগ দিয়েছ। এখনকার দিনে আমরাই তোমাদের গুরু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কে কার গুরু হবে এখনো তা বলা যায় না, কোন আদর্শকে যে সব মানুষ একান্তভাবে গ্রহণ করবে এখনো তার মীমাংসার সময় হয়নি। এই যুদ্ধের পরে হয়তো আরো মারাত্মক রকমের মহাযুদ্ধ ঘটতে পারে, তারপরে এ কথার মীমাংসা হ'তে পারে, এখনো হয়তো অনেক দেরী আছে। তবে একদিন এর মীমাংসা হবে নিশ্চয়, তখন জানা যাবে কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক।

—কিন্তু যে আদর্শই ঠিক বলে ধরা হোক, তখনও হয়তো সেটা কেবল মুখে

মানবো, কাজে মানবো না। বৈজ্ঞানিক থিওরিতে বলে আমরা জানোয়ার থেকে মানুষ হয়েছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখনও আমবা সম্পূর্ণ মানুষ হইনি, অর্ধেকটা আছি পশু, অর্ধেকটা মানুষ। যদিও মানুষ হবার চেষ্টা চলছে সেই আদিযুগ থেকে, কিন্তু এখনও তা সফল হয়নি। তখনকার জ্ঞানী লোকেরা বললেন মানুষকে দেবতার আদর্শ দেখাতে পারলে মানুষের পশুত্ব ঘুচে যাবে। তাই নিয়ে অনেক ধর্মের সৃষ্টি হোলো, অনেক দেবতার সৃষ্টি হোলো। মানুষ ধর্ম মানলে, দেবতা মানলে, মনেরও অনেক উন্নতি ক'রে ফেললে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দেবত্ব আর পশুত্বকে তারা দু'ভাগে ভাগ ক'রে নিলে, মনের মধ্যে দুইএরই স্থান রইল। তারপরে কত কবি এলো, মহাপুরুষ এলো, নতুন নতুন ধর্মেরও সৃষ্টি হোলো, কিন্তু ঐ দু'ভাগ আর ঘুচলো না। ফলে আমরা হৃদয় দিয়ে একরকম অনুভব করি চতুর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে আর একরকম বুঝি, এই নিয়ে চলেছে আমাদের মনে দু তরফা বোঝাবুঝি। আদর্শ পেলেই বা আমাদের কি হবে? তার আগে এই ভুল বোঝাটাই ঘোচানো দরকার। মনের পরিবর্তন না ঘটলে আদর্শের পরিবর্তনে কোনো ফল নেই।

—বারে বারে কাকে তুমি বলছো ভুলবোঝা সেইটে আগে বুঝিয়ে দাও। সন্দেহ হ'লেই মানুষ তখন তার বিচার ক'রে দেখবে, সে আবার ভুলবোঝা কিসে?

—যেখানে উদ্দেশ্যের সঙ্গে কাজের কোনো মিল থাকে না, সেখানে ভুলবোঝা ছাড়া কি নাম দেওয়া যেতে পারে? আজকাল বোঝবার ভার আছে দেশের নেতাদের ওপরে, সেইজন্যে তারা যা বলে সাধারণে তাই করে। গত যুদ্ধটা হ'য়ে যাবার পরে ইউরোপের নেতারা বললেন, আর না, এবার মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ করতে হবে, বিজ্ঞানের উন্নতি করতে হবে, সমস্ত কষ্ট অভাবকে দূর করতে হবে। সব দিক থেকে কত উন্নতি হ'তে লাগলো, মহা মহা আবিষ্কার হ'তে লাগলো। অন্যান্য বিষয়ের কথা আমি বিশেষ কিছু জানি না, তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির কথাটা কিছু বলতে পারি। এক একটা রোগের আশ্চর্য ওষুধ বেরোতে থাকে

আর সেই মারাত্মক রোগগুলো দেখতে দেখতে আমাদের কাছে কত সহজ হ'য়ে যায়। ম্যালেরিয়ার নতুন ওষুধ বেরোলো চমৎকার, নিউমোনিয়া মেনিঞ্জাইটিস প্রভৃতি ভয়ানক রোগের ওষুধ পাওয়া গেল অতি আশ্চর্য, ইরিসিপেলাস প্রভৃতি সেপ্‌টিক রোগ মাত্রেরই এমন ধন্বন্তরি ওষুধ মিলে গেল যে তাতে মরবার আর কোনো ভয়ই থাকলো না, ঐ মারাত্মক রোগগুলোকে মনে হোলো যেন ছেলে-খেলা। তারপরে আরও একে একে কতই আবিষ্কার হ'তে লাগলো। মনে হোলো শিগ্‌গির এবার টাইফয়েডের মহাস্ত্র মিলে যাবে, কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো বেরিয়ে পড়বে থাইসিস আর ক্যান্‌সারের অব্যর্থ ওষুধ, তখন সমস্ত রকমের রোগ সম্বন্ধেই মানুষ একেবারে নিশ্চিন্ত হ'যে যাবে,—যে কোনো রোগই হোক না কেন, ভিন্ন ভিন্ন রকমের কয়েকটা ট্যাবলেট দিলেই তৎক্ষণাৎ সেরে উঠবে। আমরা ভাবলাম পৃথিবীতে নির্ভয়ে বেঁচে থাকবার যুগ এবার এলো বুঝি। এমন সময় নেতারা দেখলেন, এতে কেবল পরের ভালো হচ্ছে, নিজেদের আশা মিটছে না। অসন্তোষের সৃষ্টি হলো, তার থেকে যুদ্ধ উঠলো বেধে। ওষুধ প্রভৃতি আবিষ্কার করা ঘুচে গেল, কিসে যুদ্ধ জেতা যায় তাই হোলো একমাত্র লক্ষ্য। যে চেষ্টায় আর যে অর্থব্যয়ে সারা জগতের মানুষকে রোগশূন্য ক'রে বাঁচানো যেতো, তার চেয়ে সহস্রগুণ চেষ্টা আর কোটিগুণ অর্থ লেগে গেল মানুষকে মেরে ফেলবার জন্যে। এ ভুলবোঝা নয়তো কি? এখন আপনাদের প্রত্যেক দেশটি কেবল নিজেদের স্বার্থই সংকীর্ণ ক'রে দেখছে, কিন্তু বলবার সময় প্রত্যেক দেশের নেতাই বলছে, মানুষের কষ্ট আর অভাব আগে দূর করা চাই, এই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই তো গেল আপনাদের দেশের কথা। আমাদের দেশের ব্যাপার আবার পুরো স্বতন্ত্র রকমের। আমাদের চলে রাজায় প্রজায়, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে, দলে দলে, ঘরে ঘরে আর মানুষে মানুষে যত ছোটো খাটো রকমের ভুলবোঝা। হিন্দু মুসলমানকে ভুল বুঝছে, মুসলমান ভুল বুঝছে হিন্দুকে, পরস্পরে লাঠালাঠি বেধে যাচ্ছে। তারপরে ঘরে ঘরে দেখুন আমরা স্ত্রীকে ভুল বুঝি, স্ত্রী কাছে ঘেঁষতে পারে না; ছেলেকে ভুল বুঝি, ছেলে

চোখের আড়াল দিয়ে চলে ; ভাইকে ভুল বুঝি, ভাই তফাতে সরে যায় ; বন্ধুকে ভুল বুঝি, বন্ধু বিগড়ে যায়। কত আর বলি বলুন, ভুলবোঝাতে এখন একাকার হ'য়ে গেছে, কচুরিপানার মতো চারিদিক ছেয়ে ফেলেছে।

—তাহ'লে কি তুমি বলতে চাও যে মানুষগুলো সব তোমাদের মহাত্মা গান্ধীর মতো হ'য়ে যাক ? নইলে আর কোনো উপায় নেই ?

—অতটা কিছুই দরকার নেই। ইচ্ছে করলে খুব সহজে এর মীমাংসা হ'তে পারে।

—তা হয় না। মানুষের মন জটিল ভাবেই তৈরী। তাকে সরলরেখার মতো চলতে বলা নিতান্ত অর্বাচীনের কথা, প্র্যাক্টিক্যাল কথা মোটেই নয়।

—যদি কিছু মনে না করেন তাহ'লে আপনাকে একটা অত্যন্ত ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞাসা করি।

—ও সৌজন্যটুকু করবার কোনো দরকার ছিল না, কেউ কিছু মনে করবো না এটা ধরে নিয়েই আমরা তর্ক করতে বসেছি। যা জানতে চাও স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন কবতে পাবো।

—আপনি কখনো কাউকে ভালোবেসেছেন কি ?

অফিসার-কম্যাণ্ডিং এবার হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে উঠে গিয়ে পাশের ব্যাগ থেকে একটা চুরোট এনে ধরিয়ে বললেন,—নিশ্চয়। সে সুযোগ বোধ হয় যৌবনকালে সকলেই এক আধবার পেয়ে থাকে। ঐ বয়সের ও একটা রোম্যান্টিক অভিজ্ঞতা, যতদিন চলতে থাকে ততদিন যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে কেটে যায়। এক সময় একটি মেয়েকে আমি খুবই ভালোবাসতাম, সেও আমাকে ভালোবাসতো। তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথাও ঠিক হয়েছিল। যদি তাই হোতো তাহ'লে এতদিনে ঘরসংসার আর ছেলেপুলে ইত্যাদি নিয়ে অন্য এক রকমের মানুষ হতাম। কিন্তু তা হয়নি, মেয়েটির বাপমাএর পাকেচক্রে তার বিয়ে হোলো এক মস্ত বড়লোকের ছেলের সঙ্গে। তখন মনে খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছি বিয়ে না ক'রে আমি খারাপ কিছু নেই।

—আর কাউকে বিয়ে করলেন না কেন ?

—তেমন উপযুক্ত আর কাউকে দেখলাম না ব'লে।

—কেন, তার মতন স্থন্দরী কি আর কেউ ছিল না ?

—ও কথা ঠিক নয়। সেও খুব স্থন্দরী ছিল বটে, কিন্তু সৌন্দর্যের কথা এখানে হচ্ছে না। আমি বলছি মনের মিলের কথা, মনের মিল না থাকলে কি ভালোবাসা যায় ? সেই মেয়েটিকে দেখলেই আমার মনে হোতো যেন তাকে আমার অদেয় কিছুই নেই, তাকে অনায়াসে আমার সমস্ত কথা বলতে পারি, সামান্য কথাটিও তার কাছে ঢেকে রাখবার দরকার নেই। সেও আমার সম্বন্ধে ঠিক এইরকমই ভাবতো। এ-রকম আশ্চর্য একটা মনের মিল কেমন দৈবাৎ হ'য়ে গিয়েছিল। তার পরে আরো অনেক মেয়েকে দেখেছি, চেহারা দেখে হয়তো ভালো লেগেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছে,—এর কাছে আমার সব জিনিস দেখানো যায় না, সমস্ত কথা খুলে বলা যায় না। এবাব বোধ হয় বুঝেছ কেন বিয়ে কবিনি। কিন্তু এ সব কথার সঙ্গে আমাদের আগেকাব আলোচনার কি যোগ আছে ?

—সেই কথাই এবার বলছি। ঐ মেয়েটির সঙ্গে আপনার মনের মিল হয়েছিল, তার মানে আর কিছুই নয়,—ওর মনটিকে আপনার মন দিয়ে ঠিক চিনতে পেরেছিলেন, আর এই চেনবার জন্যে দুজনেই দুজনকে সাহায্য করেছিলেন, তাই আপনাদের মধ্যে সেই ভুলবোঝাটা ঘটতে পারেনি, যেটা সকলের মধ্যেই সচরাচর ঘটে থাকে। নইলে আপনি বিচার ক'রে দেখুন, মানুষ অল্পবিস্তর সকলেই সমান। প্রত্যেক মানুষের রুদ্র-মুখ ছাড়াও একটা দক্ষিণ-মুখ আছে, ভালোবাসলে সেই দক্ষিণ-মুখটি দেখা যায়। এই কারণেই কেবল যাকে আমি ভালোবাসি তাকে যেন ঠিক বুঝি, তাই বলি সে সকলেব চেয়ে ভালো। যাকে ভালোবাসিনা, তাকে ভুল বুঝি, তাই বলি সে মোটেই ভালো নয়। প্রেম এমন জিনিস যার দ্বারা অনায়াসে ঐ মনের মিল হয়। প্রেম না থাকলেই যত সন্দেহ আসে, তার থেকে ভুলবোঝা আসে। আমাদের ভুলবোঝা ঘোচাতে হ'লে, পরস্পরের প্রতি প্রেমই হবে তার একমাত্র উপায়।

—দেখ, তুমি যা বলছো একদিক দিয়ে সে কথাটা মিথ্যা নয়, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে একটা ভুল হচ্ছে। একজন ব্যক্তির পক্ষে যা সম্ভব, সমষ্টির পক্ষে তা সম্ভব নয়।

—কেন নয়? ব্যক্তিদের নিয়েই হয় সমষ্টি, অনেক লোকে যা চায় তাই হয় সমষ্টির চাওয়া। ভালোবাসার একটা চাহিদা তো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অল্প বয়স থেকে আপনাআপনি জন্মায়, সুতরাং অবশ্যই আপনি স্বীকার করবেন যে প্রত্যেকেরই ওতে প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির যাতে প্রয়োজন, সমাজের তাতে প্রয়োজন নয় কেন? একজন লোক যদি তার পাশের বাড়ির মেয়েটিকে ভালোবাসতে পারে, তাহ'লে এক দেশের লোক কেন পাশের দেশের লোককে ভালোবাসতে পারবে না? কখনো পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে কি, এতে সকলের ক্ষতি হয় না লাভ হয়? আপনারা তো কত রকম বিষয়ে কত এক্সপেরিমেণ্ট করেন, কিন্তু এইটে কখনো নিরপেক্ষ ভাবে খাঁটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে কি, যে প্রেমের মধ্যে এমন কি পদার্থ আছে—যাতে গোটা মানুষটাকেই বদলে দিতে পারে, যাতে বোকা সেয়ানা হ'য়ে যায়, ভোঁতা ধারালো হ'য়ে যায়, শত্রু বন্ধু হ'যে যায়? তেমন প্রকাশ্যভাবে পরীক্ষা করলে নিশ্চয়ই দেখা যেতো যে প্রেম মাত্রই মানুষের পক্ষে উপকারী, এর রীতিমত কাল্‌চার হওয়া উচিত। এই দামী জিনিসটাকে আমাদের ব্যক্তিগত আর মনোগত সুখদুঃখের গণ্ডীর ভেতর থেকে মুক্তি দিযে সাধারণের কাজে লাগানো উচিত। আপনাদের চরিত্র আর আদর্শ আপনাদের থাক, আমাদের চরিত্র আর আদর্শ আমাদের থাক, তাতে ভালোবাসার কোনো অন্তরায় হবে না। কিন্তু আমি যা বলছি সে কথাটা আপনার নিতান্ত অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে কি?

—তুমি যা বলছো তা অসম্ভব কিছুই নয়, বৈজ্ঞানিক আর ব্যবসায়ীর যুগ কেটে গিয়ে যদি কখনো কবির যুগ আসে, তখন অনায়াসেই এটা সম্ভব হ'তে পারে। এখন হওয়া কিন্তু বড়ো শক্ত। আমি ঠিক জানি না, তোমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ এবং আরো কে কে যেন ঐ রকম ধরণের কথাই বলতেন শুনেছি।

—শুধু আমাদের রবীন্দ্রনাথ কেন, আপনাদের যীসাস্ ক্রাইষ্টও এইরকম ধরণের কথাই বলেছিলেন,—লাভ্ দাই নেবার, তোমার প্রতিবেশীকে ভালো-বাসো। তাঁর আরো অনেক আগে বুদ্ধ বলেছিলেন এই কথা,—সব্বে সত্তা সুখীতা হোন্তু,—যারা বিদ্যমান তাদের সকলকে সুখী হ'তে দাও। এগুলো কি কেবলই কথার কথা? সকল প্রাণীকে সুখী করবার একান্ত সাধনা প্রথমে তিনিই করেছিলেন, আর সেই সাধনার ফলে ঐ একটি মাত্র বোধি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বলতেন,—তোমরা সবাই অহিংস হও, হিংসা জিনিসটাকে জীবন থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দাও, এমন কি খুব নিম্নজাতীয় প্রাণীদের সম্বন্ধেও অহিংস হ'তে প্র্যাক্টিস করো। তিনি বলতেন,—যদি ধর্ম চাও তো দেবদেবীর পূজো নয়, এই হচ্ছে আমাদের পরম ধর্ম,—সকল দিক দিয়ে এরই উৎকর্ষ সাধন করো। তাহ'লে জীবনে আনন্দ পাবে, মৃত্যুতেও কোনো ক্ষোভ থাকবে না। তাঁর এই কথা লোকে বিশ্বাস করেছিল, জগতে চিরস্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা তাই তখন একবার হয়েছিল। অহিংসা মানেই ভালোবাসা,—এশিয়ার প্রায় সমস্ত দেশকে তিনি তারই মন্ত্র দিয়ে জয় করেছিলেন। মেরে জয় করার চেয়ে ভালোবেসে জয় করা যে কত বড়ো, রাজ্যলাভের চেয়ে হৃদয়লাভ যে কত দামী,—তা তিনি জগতের লোককে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। কত রাজ্যের উত্থান আর পতন হ'য়ে বিস্মৃতির গর্ভে চলে গেল, কিন্তু তাঁর সেই জয়চিহ্ন এখনো পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়নি। তখনকার দিনে এখনকার মতো দূরগামী ট্রেণ ছিল না, সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল না, আকাশগামী এরোপ্লেন ছিল না। তা যদি তখন থাকতো তাহ'লে হয়তো সারা পৃথিবীকেই তিনি অহিংস ক'রে তুলতেন। পৃথিবীর চেহারা আজ তাহ'লে অন্যরকম হ'য়ে যেতো।

—আচ্ছা মনে করো, এই সময়ে যদি বুদ্ধের মতো আবার একজন জন্মগ্রহণ করেন, তাহ'লে কি আর তিনি অতটা সাফল্য লাভ করতে পারবেন, লোকে নিতান্ত ভালোমানুষের মতো তাঁর কথাগুলো মেনে চলবে?

—আপনি কি তা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে করেন? ভালোবাসার

যে কতখানি শক্তি, ভালোবাসলে যে কতখানি মেনে নেওয়া যায়, তার পরিচয় আপনি যথেষ্টই পেয়েছেন। এমন যদি কেউ পৃথিবীতে আসেন যাঁকে সকলেই সহজে মেনে নিতে পারে, তাহ'লেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হ'য়ে যাবে। নইলে কে না জানে যে মানুষকে যদি মানুষ ভালোবাসে আর সবাইকে যদি সবাই সমান শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাহ'লে যুদ্ধেরও দরকার হয় না, আর গেষ্টাপো লেলিয়ে ভয় দেখিয়ে লোককে আইন মানাবারও দরকার হয় না। কিন্তু উপযুক্ত প্রেরণা-দাতার অভাবে আমরা এই সহজ সত্যটা জেনেও এতকাল কাজে লাগাতে পারিনি। মানুষ-চরিত্রের মধ্যে এই আশ্চর্য সত্য যে প্রেম, তারই মাহাত্ম্য যখন প্রচারিত হবে তখন সকলে অন্যান্য বিষয় ফেলে এরই উৎকর্ষ সাধনে লেগে যাবে। আপনি শুধু এই কথাটাই একবার ভেবে দেখুন না, অসহায় শিশুকে রক্ষা করে কে ? রক্ষা করে তার মায়ের প্রেম,—এ-ছাড়া অন্য রাস্তা নেই। তেমনি এই অসহায় সংসারকে, সমাজকে, দেশকে, মহাদেশকে, সমগ্র মানব-জাতিকে রক্ষা করবে কে ? রক্ষা করবে সেই প্রেম,—এ ছাড়া অন্য রাস্তা নেই।

—তোমার কথাগুলো শুনে খুব খুশি হলাম। তোমরা খুব ইমোশন্যাল, তাই হয়তো এমন বড়ো বড়ো কথা অনায়াসে বলতে পারো।

—আর আপনারা খুব প্র্যাকটিক্যাল, তাই বড়ো বড়ো কাজ করতে পারেন। কিন্তু সে কথা যাক. বোধ হয় আমার কথাগুলো শুনতে আপনার তেমন ভালো লাগেনি ?

—না না ক্যাপ্টেন, তা নয়। তর্কের বেলা হয়তো আরো তর্কই করবো, কিন্তু তোমার কথাগুলো আমার খুব ভালোই লাগলো। মনে হচ্ছিল যেন মানব সভ্যতার সেই গোড়ার কথা কিংবা শেষকালের কথা শুনছি। তুমি কেমন ক'রে বলতে পারলে তা জানি না, কিন্তু আমার বলতে ইচ্ছে করলেও মুখে বেধে যাবে, বিদ্রূপের মতো শোনাবে। এখনকার মানুষের কথা ও নয়, এখনকার সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে চালাকি, চতুরতা (ক্লেভারনেস্)। এখনকার আসল

যুদ্ধটাই হচ্ছে চালাকির সঙ্গে চালাকির যুদ্ধ। প্রতিযোগিতা চলেছে, যে যতটা কম চালাক হবে তারই ততখানি পরাজয়। কিন্তু চারিদিক থেকেই অনবরত চালাকির কথাগুলো শুনে মাঝে মাঝে কান দুটো ক্লান্ত হ'য়ে যায়,—তখন এই রকম কথাই শুনতে ইচ্ছে করে। তাই তোমাকে ধরে ধরে আনি। যাক্, এখন বৃষ্টিটা ছেড়ে গেছে, এইবার নিজের ক্যাম্পে গিয়ে শুয়ে পড়োগে, ভোরেই আবার উঠতে হবে।···

তর্কটা আমাদের জমেছিল ভালো। শেষের দিকে একটু বিদ্রূপ করতে গিয়ে অফিসার-কম্যাণ্ডিং কথাটা হয়তো ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু যাই হোক তিনি ঠিকই বলেছেন। চালাকিতে আর চলবে না। অনুভূতি-সম্পন্ন মানুষের রাজত্বে চালাকির যুগ চিরকাল চলতে পারে না। অনবরত ওর চাপে পড়ে মানুষ একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। সবাই জেনেছে যে এক চালাকির দোষ অন্য চালাকি দিয়ে সংশোধন হয় না। সভ্যতার ইতিহাসে নব বিবর্তনের দিন এবার আসবে। সম্পূর্ণ নতুন ভাবে নতুন পথে চলে আরো খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে যাবার দিন এবার আসবে। আসবেন এবার সেই নতুন দিনের যুগোত্তর মহাপুরুষ,—হয়তো আমাদেরই দেশে, হয়তো বা অন্য কোনো দেশে—যিনি বৃহতের সঙ্গে ক্ষুদ্রের, বিজ্ঞানের সঙ্গে কল্যাণের, গায়ের জোরের সঙ্গে প্রেমের জোরের অপূর্ব সমন্বয় ঘটাবেন,—যিনি মানুষের দীর্ঘকালের সকল ক্ষোভকে ঘুচিয়ে দিয়ে, অর্থবিহীন যত ফাঁকির জটিলতা নির্মূল করে

(অসমাপ্ত)

মীরার কথা

শেষের অধ্যায়টি আমাকেই লিখতে হবে। আমি ছাড়া আর কে লিখবে ?

সকালবেলা ওপরের বারান্দায় চুপ ক'রে বসে ছিলুম, এমন সময় ঠাকুরপো হাতে ক'রে নিয়ে এলো একখানা চিঠি। তার মুখে যেন কেমন কেমন একটা ভাব। আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—কিসের চিঠি ঠাকুরপো ?

একটু ইতস্তত ক'রে সে বললে,—কিসের চিঠি বুঝতে পারছি না, এসেছে যুদ্ধের বড়ো আফিস থেকে। তোমার নামে ঠিকানা লেখা, খামের চারিদিকে কালো বর্ডার দেওয়া রয়েছে। চিঠিখানা খুলে পড়বো ?

—না না, আমার চিঠি তুমি খুলবে কেন ? আমাকে দাও দেখি।

চিঠিখানা খুলে দুবার তিনবার পড়লুম, পরিষ্কার টাইপকরা চিঠি, কিন্তু তার অর্থটা কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না। অমর বাবুর নামটা লেখা আছে, এইটুকুই মাত্র দেখলুম। ঠাকুরপোকে চিঠিখানা দিয়ে বললুম,—পড়ে দেখতো ঠাকুরপো, কী বলছে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঠাকুরপো চিঠিখানা পড়ে চুপ ক'রে রইল।

—বলো না কী লিখেছে ? চুপ ক'রে রইলে কেন ?

ঠাকুরপো বললে,—ওরা লিখেছে, গৌরবজনক সম্মান তালিকাতে অমর বাবুর নাম উঠেছে। রাজার রাজ্য এবং মান্য রক্ষার জন্যে তিনি প্রাণ দিয়েছেন। আকস্মিক বোমার আঘাতে আরো অনেকের সঙ্গে কোনো এক যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে, সুতরাং যারা তাঁর উপার্জনের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছিল তারা যথোপযুক্ত পেন্‌শন পাবে। রাজার তরফ থেকে মিলিটারি কর্তৃপক্ষ তাঁর শোকগ্রস্ত পরিবারকে সান্ত্বনা দান করছেন। তাঁর যা কিছু জিনিসপত্র ছিল শীঘ্রই পাঠানো হচ্ছে।

—ঠাকুরপো, আমাকে একবার নিয়ে যেতে হবে। আজই চলো।

—কোথায় যাবে বৌদি ?

—যেখানে—যেখান থেকে—

—একি আজকের কথা ? প্রায় এক মাস পার হ'য়ে গেছে, তারপরে এই খবর এলো, এখন আর তার কোনো চিহ্নই নেই। কোথায় মারা গেছেন তাও জানা নেই, ওরা লিখেছে কোনো এক যুদ্ধক্ষেত্রে। বুঝে কথা বলো বৌদি। মাথা খারাপ ক'রে আর লাভ কী হবে বলো, যুদ্ধে গেলে যে মরতেও হয়, এ তো জানা কথা।

ঠিক বলেছে ঠাকুরপো। আমারই ভুল হয়েছিল। অপ্রস্তুত হ'য়ে একটু হেসে চুপ ক'রে রইলুম। বাবা গেছেন, দিদিমা গেছেন, রবীন্দ্রনাথ গেছেন, খোকা গেছে,—অনেক প্রিয়জনের মৃত্যুতে আমি কেঁদেছি, কিন্তু এখানে আমার কাঁদা চলে না। ঠাকুরপোর সামনে তাঁর জন্যে সামান্য লোকের মতো কাঁদা, এ যেন তাঁর অপমান। অনেকদিন পর্যন্তই আমি কাঁদিনি। ওঁর মৃত্যুও যে হতে পারে, সে যে এতই অকস্মাৎ ঘটতে পারে, আর সত্যিই যে তা ঘটেছে, এইটুকু বুঝতে আমার অনেক সময় লাগলো। আমার যে এখনও কোনো সাধই মেটেনি, এর মধ্যেই—

ওঁর নাম অমরনাথ। আজ সার্থক ওঁর নাম। দেবলোক থেকে নেমে এসেছিলেন মরলোকে, কেবল আমারই জন্যে। চেয়েছিলুম আমি হাতের স্পর্শ, তাও দিলেন,—চেয়েছিলুম দেহের স্পর্শ, তাও দিলেন,—চেয়েছিলুম মনের স্পর্শ, তাও দিলেন,—তারপরে আবার চলে গেলেন, তাঁর দেবলোকে। এর জন্যে আমি কাঁদবো কেন ? এখনও রয়ে গেছে আমার সেই স্পর্শসুখের অনুভূতি, এখনও মনে করলেই পেয়ে যাই তাঁর গায়ের সেই অপরূপ সুগন্ধ। চোখ বুজলেই ভেসে ওঠে সিনেমার দৃশ্যের মতো পর পর ছবি,—ওঁর সঙ্গে উদয়শঙ্করের নাচ দেখতে গেছি,—রাত্রি বারোটা পর্যন্ত ওঁকে ধরে রাখবার জন্যে পাশে বসে কত গল্প করছি,—গভীর রাত্রে আলুথালু বেশে উঠে এসে উনি আমার শ্বশুরকে ইন্‌জেকশন দিচ্ছেন,—খোকাকে কোলে নিয়ে আদর করচেন,—ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুলটা ছিঁড়তে

ছিঁড়তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন,—অপারেশনের সময় ওঁর হাত চেপে ধরে চোখ বুজে আছি,—গভীর অন্ধকারে ওঁর ঠোঁটে লাগানো সিগারেটের আগুনটা দপ্‌দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠচে,—উনি হেসে হেসে বলচেন 'আর কখনো গঙ্গাস্নান করতে যাবে?'—আরো কত কী, কত কী। সর্বদা আমি এই সব দৃশ্যের মধ্যেই ডুবে থাকি। এখন বুঝতে পেরেছি সেবারে সেই ট্রেণে তুলে দিতে যাবার আগে উনি আমার কাছে কী চাইতে গিয়েছিলেন। তখন কী জানতুম, শেষ বিদায়ের দক্ষিণা নিতে এসে উনি আমার দরজা থেকে বিমুখ হ'য়ে ফিরে গেলেন?

চারিদিকেই রয়েছে ওঁর স্মৃতিচিহ্ন। ওঁর নিজের ব্যবহারের অনেক জিনিস-পত্র উনি এখানেই রেখে গেছেন, আমার ঘরের অনেক জিনিসেই ওঁর ব্যবহারের দাগ টাট্‌কা লেগে রয়েছে। সেই যে ঘাসের গুচ্ছ দুজনে মিলে তুলেছিলুম রানীঝর্ণার ধারে, সেটা এখনও পর্যন্ত তেমনি অম্লান হ'য়ে রয়েছে। আরো হয়তো বহুকাল থাকবে। ওটা আমারই জন্যে রয়ে গেল।

লোকে বলে মৃত্যু বড়োই নিদারুণ। ভুল কথা। উনি বলতেন,—সব চেয়ে সেরা আর্টিষ্ট হচ্ছে সেই, যে শেষের কথাটা একটু আগেও জানতে দেয় না। সব চেয়ে সেরা আর্টিষ্ট আমাদের সৃষ্টিকর্তা, জীবনের মধ্যে তাই অকস্মাৎ মৃত্যু এনে দেখিয়ে দেন তাঁর শিল্পচাতুর্যের চরম রূপটি। প্রত্যেক মৃত্যুটাই তাই অপূর্ব, প্রত্যেকটা নিয়েই ছবি আঁকা যায়।

মৃত্যুও জীবন্ত। যার প্রতি তার ভালোবাসা নেই তার কাছে সে আসে অতি ধীরে, দূর থেকেই দেখতে পাওয়া যায় সে আসছে, কালো কালো অন্ধকার-মাখানো হাত বাড়িয়ে সে অগ্রসর হ'য়ে আসছে। আর যাকে সে ভালোবাসে তাকে ঐ কথাটি কিছুতেই জানতে দেয়না, হঠাৎ পিছন থেকে কখন চুপিচুপি এসে তার চোখ টিপে ধরে নিঃসাড়ে তাকে সকলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়, কাউকে চোখের জলটুকু পর্যন্ত ফেলবার অবসর দেয় না। কিন্তু এতেও সে আমাদের বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে পারলে না। পারে না, পারে না,

সে কিছুই করতে পারে না, সরিয়ে নিয়ে শূন্য ক'রে দিতে সে কখনই পারে না। মৃত্যুর সে সাধ্য কী ?···

এবার কলকাতা শহরে এত মানুষ কেন ? প্রত্যেক অলিতে গলিতে মানুষ গিজ্‌গিজ্‌ করছে, ক্রিমি কীটের মতো কিল্‌বিল্‌ করছে, মাছির মতো ভন্‌ভন্‌ করছে। কোথা থেকে শহরের রাস্তায় রাস্তায় এত লোক এসে জুটলো তা জানিনা, শুনতে পাই আশপাশের কয়েকটা জেলার পল্লীগ্রাম থেকে এরা এসেছে, ট্রেণে ঝুলতে ঝুলতে কিংবা পথে হাঁটতে হাঁটতে। গ্রামে কোনো খাদ্য নেই, এরা তাই শহরে এসেছিল খাদ্যের আশায়। বুভুক্ষু হ'য়ে এরা একমাস দুমাস পর্যন্ত কোনো রকমে পথে পথে ঘুরেই বেড়ালো, তারপরেই চলতে লাগলো জীবনে আর মৃত্যুতে কাড়াকাড়ির নিত্যলীলা।

মৃত্যুর কথা বলছিলুম না ? এই দুর্ভিক্ষে দেখলুম এক নতুন ধরণের মৃত্যু। ফুটপাথের ওপরে কাতারে কাতারে পড়ে থাকে বুভুক্ষুর দল, পাশবিক ক্ষুধায় তারা দোরে দোরে গিয়ে পাশবিক চীৎকার করে। সে চীৎকার কেউ শুনতে চায় না, শুনতে পেলে দরজায় খিল দেয়, কানে আঙুল দেয়। পথের ঐ সব লোকের সঙ্গে ঘরের লোকের কোনো সম্পর্ক নেই। পথের কাঙালীর জনস্রোত নিত্য আবর্তিত হচ্ছে, ক্ষুধায় রোগে চীৎকারে ধিক্কারে ব্যভিচারে নক্কারজনক হ'য়ে উঠছে, কিন্তু সে স্রোত চৌকাঠ পেরিয়ে কোনো বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ওদিকে ঘরে ঘরে চলেছে উৎসবের নানা আয়োজন, সিনেমা থিয়েটার নিয়ে আলস্যজড়িত আলোচনা, শিথিল ধরণের যত শৌখিনতা। ওদিকে শহরবাসীরা প্রতিমার বিসর্জন নিয়ে উন্মত্ত হ'য়ে উঠলো, আর এদিকে বাইরে চলতে থাকলো ঐ সব গৃহহারা মানুষের দলে দলে বিসর্জন। সকলের চোখের সামনে সজ্ঞানে তারা মরতে লাগলো। পশুমৃত্যুর চেয়েও হীন,—এর কোনো চিকিৎসা নেই, প্রতিকার নেই, প্রতিবাদ নেই, প্রত্যাঘাত করবার কোনো শত্রু নেই। এ মৃত্যুতে কোনো বিত্তশালী মরে না, বেছে বেছে মরে কেবল যারা দরিদ্র, যাঁরা ক্ষুদ্র। এ মৃত্যু কখনই কোনো রসজ্ঞ আর্টিষ্টের সৃষ্টি

হ'তে পারে না। এর চেয়ে বোমায় মৃত্যু অনেক সুন্দর। সে এমন কুৎসিত রকমের তিলে তিলে মরা নয়, জীবনের জ্যোতি থাকতে থাকতে সগৌরবে মরা।

ঐ গলির ওপারে একটি কঙ্কালসার নারী এক সদ্যোজাত শিশুকে কোলে নিয়ে বসে ছিল। শিশুকে সে স্তন দিতে চেষ্টা করলে, কিন্তু স্তনে তার এক ফোঁটা দুধ নেই, একেবারে শুকনো। শিশু বারে বারে টানতে লাগলো আর দুধ না পেয়ে স্তন ছেড়ে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগলো। একটু দুধের জন্যে ওর মা দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়িয়েছিল, কেউ দুধ দেয়নি, ঘরে দুধ নেই ব'লে আমিও দিতে পারিনি। ঘণ্টা খানেক পরেই দেখি শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মায়ের জঠরে জন্মেছে, জন্মাবধি দুধ পায়নি, কতক্ষণ যুঝবে? কিন্তু ওর মা এখনো রইলো বেঁচে। দলে দলে এমনি কত ছেলে মরছে, কত পুরুষরাও মরছে, কিন্তু মেয়েদের মরতে দেখি না। মেয়েদের কি না কৈমাছের প্রাণ, সহজে মরণ হয় না। এখন বুঝতে পারছি, আমাদের দেশে সহমরণ প্রথার কেন প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু সে প্রথা এখন অচল। আশ্চর্য, এখন আর একটা বোমাও পড়ে না।

উনি সেবারে যখন চলে গিয়েছিলেন তখন পড়েছিল বোমা, এবারে যখন চলে গেছেন তখন এলো দুর্ভিক্ষ। এ সময় যদি উনি থাকতেন তাহ'লে কী করতেন? কিছুই করতে পারতেন না, মনের কষ্টে কেবল ছট্‌ফট্ করতেন। মূর্খ গরিব পল্লীগ্রামের লোকেরা চিরদিনই ওঁর বড়ো প্রিয় ছিল, ওদের উনি বলতেন গোলা লোক। প্রায়ই দুঃখ করতেন, যুদ্ধের মধ্যে ঐ বেচারারাই বিনাযুদ্ধে মারা যাবে। আমি দেখেছি, ওদের সঙ্গে উনি মিশে যেতে পারতেন ওদেরই মতো হ'য়ে।

হঠাৎ আমার আবদুলকে মনে পড়ে যায়। সে বেচারা বিদেশে এসে রোগে ভুগতে ভুগতে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল, মরবার সময় রুগ্না স্ত্রীটিকে একবার চোখেও দেখে যেতে পেলে না।······রোগে ভুগে মরার অনেক কষ্ট। নিজের

চোখেই তো কত দেখলুম, সেই বারে বারে ডাক্তার ডাকা, ওষুধ খাওয়ানো, গা ফুঁড়ে ফুঁড়ে ইনজেক্‌শন দেওয়া, দিনরাত জেগে শুশ্রূষা করা, তারপরে সকলের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে মরা। বিধাতাও ওঁকে সে রকমের কষ্টকর মৃত্যু দিতে দ্বিধা বোধ করলেন। ওঁর সর্বাঙ্গসুন্দর হাস্যময় সুস্থ মূর্তির ওপরে পড়লো যবনিকা, সে মূর্তি রইল চির অম্লান, চিরনবীন।

আমার আগেই উনি চলে গেলেন, ভালোই হয়েছে। আমার মৃত্যু আর ওঁকে দেখতে হবে না। সে দেখলে উনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। আমরা যাও বা সহ্য করতে পারি, পুরুষেরা তাও পারে না। রেখে-যাওয়ার কষ্টের চেয়ে থেকে-যাওয়ার কষ্ট অনেক বেশি।......

মরে যাওয়া মানে কী নিশ্চিহ্ন নির্বিশেষ বিলুপ্তি? কখনই নয়। মানুষ দূরে চলে গেলেও দেখেছি তার খানিকটা কাছে থেকে যায়, যদিও তার কোনো খবর না পাই কিংবা চিঠিপত্র না পাই তবুও দেখেছি সে আমার কাছেই থাকে, কখনো বা আমাকে বেদনা দেয়, কখনো আনন্দ দেয়। এখনও তাই। এবারে উনি কতদূরে চলে গেছেন তা আমি জানিনা, কিন্তু তবুও উনি কাছে থাকার মতোই আমাকে বেদনা দিচ্ছেন, আনন্দ দিচ্ছেন। উনি একেবারেই নেই, সে কথা বলি কেমন ক'রে? সেবারে উনি অনেক দূরে সরে গিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে কতখানি কাছে রয়েছেন,—এবারে উনি আরো দূরে সরে গিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে আরো কতখানি কাছেই রইলেন।......

এ বাড়িতে আমার মন টিঁকছিল না, দিনকতকের জন্যে চলে গেলুম বাপের বাড়ি। মা বারেবারে অশ্রুপাত করতেন, দেখতে আমার একটুও ভালো লাগতো না, আমি সেখান থেকে অন্যত্র সরে যেতুম। বেলা এখন আর সেই ভালোমানুষটি নেই, ইতিমধ্যে অনেক ন্যাকামি শিখে ফেলেছে। ওরই দ্বারা ও আমার দাদাকে প্রলুব্ধ করে, আর সে অষ্টপ্রহর তাই নিয়েই বিভোর হ'য়ে থাকে। কেবল প্রলোভন আর মত্ততা, নারী-পুরুষের সম্পর্কে এ ছাড়া আর কী

কিছুই নেই ? প্রেমের কোনো চিহ্নও যেখানে দেখা যায় না সেখানে তার নাম নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখানো আমার মোটে সহ্য হয় না। দাদার সঙ্গে আমার এই নিয়ে মনোমালিন্য ঘটলো, আমি দুদিন পরেই সেখান থেকে ফিরে এলুম।

ও বাড়ির চেয়ে এ বাড়ি আমার পক্ষে অনেক ভালো। এরা বরং আমাকে কতক চেনে, বেশি কিছু বিরক্ত করে না। শ্বশুরশাশুড়ী একেবারে চুপচাপ থাকেন, সে বরং সহ্য হয়। ঠাকুরপো থাকে ভয়ে ভয়ে, দেখা হ'লেও বিশেষ কিছু কথা বলতে সাহস করে না। একদিন ওর ঘরে বসে সিগারেট খাচ্ছিল, গন্ধটা আমার নাকে লাগলো। তখনি গিয়ে বললুম,—এখানে তুমি সিগারেট খাবে না, ও গন্ধ আমার সহ্য হয় না। তার পর থেকেই সে বাড়িতে সিগারেট খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। মংরু বেচারা সর্বদা মুখ শুকিয়ে থাকে, একটিও কথা বলে না। ভাবী গলায় কারো ডাক শুনলেই সে চম্‌কে ওঠে, তার চোখ দিয়ে জল পড়ে। বুড়ো ছট্টু তাকে চিঠি লিখেছে, বাবু কেমন আছে জানতে চায়। চিঠির কোনো জবাবই সে দিলে না।

যে চিঠিখানা সেদিন এসেছিল সেটা ওঁর দেশের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানে বেঁচে আছে ওঁর বিবাহিতা স্ত্রী, ওঁর মা, বুড়ী ঠাকুমা। তারা চিরকালই যেমন রিক্ত ছিল আজও তেমনি রিক্ত। জীবনে তারা কখনই ওঁকে পায়নি, এখন একেবারেই পাবে না। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন উনি রইলেন একমাত্র আমারই। যদি আমি বৃদ্ধা স্থবিরা হ'যে যাই, তখনও উনি থাকবেন তেমনি নবীন। মনের যেমন বার্ধক্য নেই, প্রেমেরও তেমনি বার্ধক্য নেই।

উনি বলতেন—জীবনের একটা কৈফিয়ৎ আছে। ওঁর জীবন অসম্পূর্ণ হ'লেও তার কৈফিয়ৎ রইল আমার কাছে, বর্তমান-আমিই ওঁর জীবনের কৈফিয়ৎ। আমি যখন চলে যাবো তখনই কী ওঁর কৈফিয়ৎ বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে আমরা দুজনে মিলে যে প্রেমকে গড়ে তুলেছিলুম তার কোনো চিহ্নই অবশি থাকবে না ? সে কথা মনে হয় না। মানুষের মধ্যে এই প্রেমের সৃষ্টি হ বারেবারে, আর বারেবারেই তা এমনি ক'রে মুছে যায়। অসম্পূর্ণের ভিতর

দিয়ে সম্পূর্ণকে গড়ে তোলবার জন্যে এই ভাবেই প্রকৃতির পুনঃপুনঃ প্রয়া একদিন যে প্রেম সম্পূর্ণরূপে সকল মানুষের মধ্যে দেখা দেবে, আমরাই হ তার নামবিহীন উল্লেখবিহীন অদৃশ্য ভিত্তি। এই প্রবঞ্চনা আর প্রতারণার মু এত রকমের অবিশ্বাস আর এত রকমের বাধা কাটিয়ে আমাদের জীবনে ফুল ফুটলো সে কখনো বৃথা হবার নয়।

"সব চেয়ে সত্য ক'রে পেয়েছিনু যারে
সব চেয়ে মিথ্যা ছিল তারি মাঝে ছদ্মবেশ ধরি,
অস্তিত্বের এ-কলঙ্ক কভু
সহিত না বিশ্বের বিধান
এ-কথা নিশ্চিত মনে জানি।"

কারো কাছে কোনো সান্ত্বনায় আমার প্রয়োজন নেই। আমার মন আ আত্মসমাহিত, প্রশান্ত। যে সত্যব্রত আমি নিয়েছিলুম তার মর্যাদা শেষ পর্য রাখতে পারবো। কোনোদিন আমি কাঁদবো না, কোনো কাজেই আমার ত্র হবে না, অন্যান্য সকলের মতো আমিও জীবনধারণ ক'রে যাবো। মনে কর উনি যদি হঠাৎ আবার কোনো দিন ভোরের বেলায় এসে তেমনি ক দরজার কড়া নাড়তে থাকেন, তখন কেমন মুখ নিয়ে আমি ওঁর সুমুখে গি দাঁড়াবো?

কিন্তু গল্পটা আমার এইখানেই শেষ, এর পরে আর গল্প নেই।

একটা খবর এখনও পর্যন্ত বলা হয় নি। আমার স্বামী সে স্যানাটোরিয়মেই মারা গেছেন। সেখান থেকে মাত্র কুড়ি দিন হলো আ কলকাতায় ফিরেছি। তারপরেই ঐ চিঠি পেলুম।